ভলিউম ৮

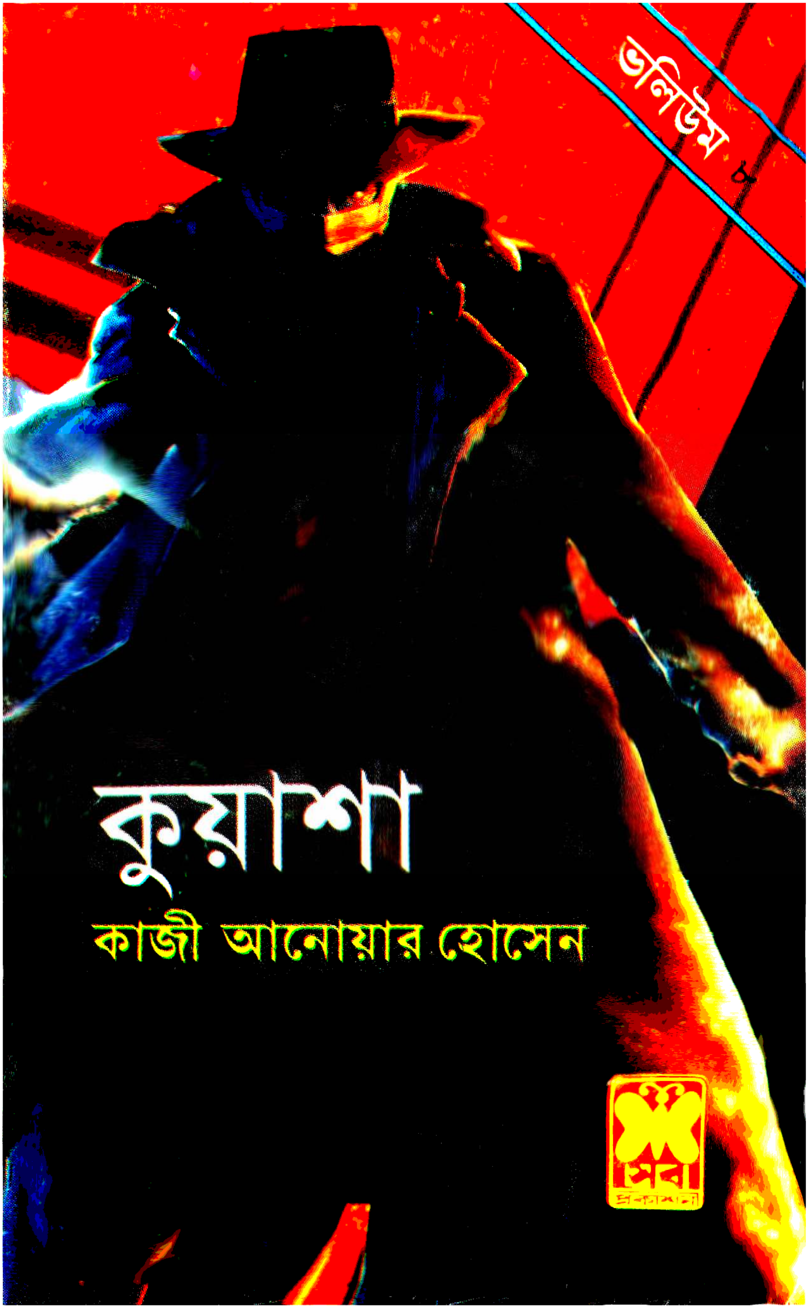

কুয়াশা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

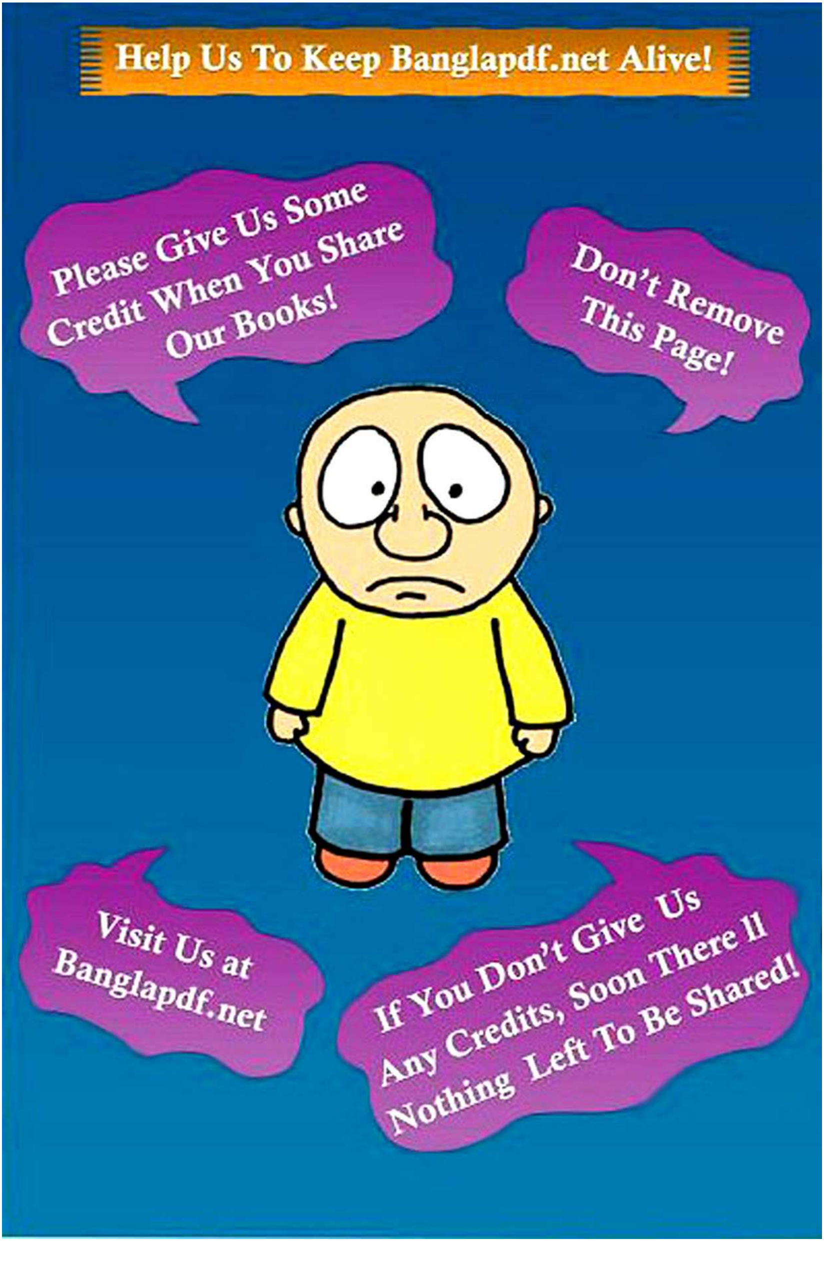
Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ভলিউম ৮

কুয়াশা

২২, ২৩, ২৪

কাজী আনোয়ার হোসেন

Scanned & Edited By : Shamiul Islam Anik
Facebook : www.facebook.com/friend.anik
Website : www.banglapdf.net

Group : Boi Lover's Polapan
Link : https://www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16 - 1098 - 1

প্রকাশকঃ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর, ১৯৯২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আলীম আজিজ

মুদ্রাকরঃ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

২৪/৪ সেগুন বাগিচা ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুন বাগিচা ঢাকা ১০০০

জি. পি. ও বক্স নং ৮৫০

দূরালাপনঃ ৪০৫৩৩২

শো-রুমঃ

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume-8

KUASHA SERIES: 22, 23, 24

By Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

আটাশ টাকা

সূচী

কুয়াশা ২২ —— ৫

কুয়াশা ২৩ —— ৬৭

কুয়াশা ২৪ —— ১৪২

সেবা'র
আরও কটি সিরিজ

মাসুদ রানা

ওয়েস্টার্ন

সেবা রোমান্টিক

কিশোর থ্রিলার

কিশোর ক্লাসিক

কুয়াশা ২২

প্রথম প্রকাশঃ মার্চ, ১৯৭০

এক

ভোর।

প্রদোষলগ্নের আলো-আঁধারীতে পৃথিবীটা এখন ধূসর। এখুনি আঁধার কেটে যাবে। সূর্য উঠবে। আলোয় ঝলমল করবে চারদিক। গুলশান আবাসিক এলাকাটা এখনও নিশ্চুপ।

স্পন্দনহীন।

পথ জনবিরল। শুধু দু'একজন টুপি পরা লোককে হেঁটে আসতে দেখা যাচ্ছে। নামাজ আদায় করে ফিরছে তারা। বায়ু-সেবীর দল এখনও বেরোয়নি। এখুনি অবশ্য তাদের বেরোবার সময় হবে।

সবুজ রংয়ের একটা নতুন ট্রায়াম্ফ গাড়ি এসে থামল প্রায় অচেতন গুলশানে শহীদ খানের বাড়ির দোরগোড়ায়। গাড়ির আরোহী একজনই। সুন্দরী এক তরুণী। দরজা খুলে গাড়ি থেকে নামল সে। সুন্দর মুখটা নিদ্রাহীনতায় পাণ্ডুর এবং কোন এক অজ্ঞাত কারণে চোখে-মুখে গভীর উদ্বেগের চিহ্ন আঁটা। কান্নার দরুনই হোক আর ঘুমের অভাবেই হোক চোখ দু'টো লাল। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুলগুলো অবিন্যস্ত। কপালের উপরও ছড়িয়ে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ কুন্তল। দামি শাড়িটার পাট নষ্ট হয়ে গেছে। নিজের প্রসাধনহীন অবিন্যস্ত বেশভূষার দিকে কোন লক্ষ্য নেই তার।

তরুণী গাড়ি থেকে নেমে শহীদ খানের বাড়ির ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল। গেট খোলাই ছিল। শহীদের আব্বা ইসলাম খান সাহেব নামাজ পড়তে গেছেন গেট খোলা রেখে।

তরুণী গেট পেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে উঠল। দরজায় সজোরে ঘা দিল।

একটু পরেই বেরিয়ে এল গফুর। এই সাত-সকালে সে বিস্রস্ত-বসনা অপরিচিত রমণী-মূর্তি বোধহয় আশা করেনি। বিস্মিত দৃষ্টি মেলে সে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু সে মাত্র কিছুক্ষণের জন্যেই। সংবিৎ ফিরে পেতেই গফুর বলল, 'আসুন, কাকে চাইছেন? দাদামণিকে? কিন্তু উনি তো নেই। বিলেত গেছেন।'

'উনি নেই?' আশাভঙ্গের আভাস পাওয়া গেল তরুণীর কণ্ঠে। 'লীনা, লীনা আছে?' কি যেন ভেবে নিয়ে বলল সে।

'জ্বী। আপা আছেন। ঘুমাচ্ছেন বোধহয় এখনও। আমি ডেকে আনছি। আপনি ড্রইংরুমে বসবেন, আসুন।'

'চল।'

তরুণীকে ড্রইংরুমে বসিয়ে গফুর লীনাকে খবর দিতে চলল।

তরুণী বলল, 'শোন, লীনাকে বল গিয়ে, রোজিনা এসেছে দেখা করতে। বিশেষ দরকার।'

'কি যে দরকার তা তো বুঝতেই পারছি। নইলে এমন সাত-সকালে কষ্ট করে আসবেন কেন?' সহানুভূতি ভরা গলায় বলল গফুর। কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হল তরুণী রোজিনা। বিষণ্নতা ভেদ করে ওর চেহারায় ফুটে উঠল বিরক্তির ছাপ। গফুর তা লক্ষ্য করল না।

বেশভূষাটা গুছিয়ে নিয়ে রোজিনা একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বসল। চোখ দুটো বন্ধ করে বসে রইল সে লীনার প্রতীক্ষায়।

পাতলা ছিপছিপে মেয়েটি। মাঝারি উচ্চতা। শ্যামবর্ণ। চেহারাটা খাড়া তলোয়ারের মত ধারাল। চাপা ঠোঁটে দৃঢ়তার আভাস। চোখ দু'টোতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং কিছুটা সতর্কতার ছাপ।

মিনিট দশেক পরে লীনা এল। বাইরে স্যাণ্ডেলের শব্দ শুনে সোজা হয়ে বসল রোজিনা। লীনার দৃষ্টিতে বিস্ময়। ড্রইংরুমে ঢুকে রোজিনাকে দেখেই বলল, 'ওমা, তুই! এ যে অবিশ্বাস্য! তা হয়েছে কি? এই কাকডাকা ভোরে কি মনে করে?'

'হয়েছে একটা কিছু। সুসংবাদ নয়। বোস তুই।'

লীনা নীরবে জরিপ করল রোজিনাকে। তারপর রোজিনার পাশে বসে বলল, 'তোকে এমন বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে কেন? দাঁড়া, আগে চা খেয়ে নিই। তারপর শুনব, উঠে দাঁড়াল সে।

'চা পরে হবে। এদিকে বড় বিপদ। আগে শোন। চা খাওয়ার সময় পাওয়া যাবে।'

'বিপদ?' আবার বসে পড়ল লীনা। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রোজিনার দিকে।

'শায়লাকে মনে আছে তোর? আমাদের সাথে পড়ত। মীর্জা কবীর হোসেনের মেয়ে। বড় একটা গাড়ি করে স্কুলে আসত।'

'কোন্ এক শিল্পপতির সাথে বিয়ে হয়েছিল তো?'

'হ্যাঁ, সাদেক আহমদের সাথে। আহমদ টেক্সটাইল মিলসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর।'

'খুব মনে আছে।'

'হ্যাঁ, সে-ই। বেচারি বড় বিপদে পড়েছে। তাই তোর কাছে ছুটে আসা। জানিস না বোধহয় যে, বছর দুয়েক আগে সাদেক সাহেব অর্থাৎ শায়লার স্বামী মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ। যাই হোক। শোন্। শায়লার একটি মাত্র সন্তান। এক ছেলে। পাঁচ বছর বয়স,' থামল রোজিনা।

'হুঁ। তারপর?'

'খোকন মানে, শায়লার ছেলেটা গতরাতে চুরি হয়ে গেছে।'

'চুরি হয়ে গেছে!' আর্তনাদ করে উঠল লীনা।

চুপ করে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রোজিনা। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'হ্যাঁ। বুঝতেই পারছিস, কি ভয়ানক বিপদে পড়েছে শায়লা! বেচারি সেই কাল রাত থেকে কাঁদছে। এখন কেমন যেন বোধশক্তিহীন স্থবির হয়ে গেছে। যেমন করে হোক ছেলেটাকে খুঁজে পেতেই হবে। তাই তো তোর কাছে ছুটে এসেছি।'

'কিন্তু দাদা তো নেই! এমন কি কামাল ভাইয়াও নেই,' চিন্তাজড়িত কণ্ঠে বলল লীনা। 'পুলিসে খবর দেয়া হয়েছে?'

'না। সেটা সম্ভব নয়।'

'কেন?' একটু অবাক হল লীনা।

'যারা শায়লার বাচ্চাকে নিয়ে গেছে তারা একটা ছোট চিরকুটও রেখে গেছে। তাতে লেখা আছে—পুলিসের কাছে গেলে ছেলেটাকে জীবিত পাওয়া যাবে না। মেরে ফেলা হবে।'

'ওমা! কি ভয়ঙ্কর,' আঁতকে উঠল লীনা। 'তাহলে ছেলেধরাদের উদ্দেশ্যটা কি? চায় কি তারা?'

'তা তো এখন পর্যন্ত বুঝতে পারছি না। তবে যদ্দূর মনে হয়, টাকার লোভেই ওরা খোকনকে চুরি করেছে।'

লীনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তাহলে এখন কি করতে চাস? দাদা থাকলে তো কোন কথাই ছিল না। এক কাজ করি, দাদাকে ফোন করে দিই। কাল-পরশু এসে যাবে।'

মাথা নাড়ল রোজিনা। 'না না। অতক্ষণ অপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বুঝতেই পারছিস, শায়লা পাগল হয়ে যাবে ছেলেটাকে তাড়াতাড়ি ফিরে না পেলে।'

'কিন্তু— ।'

'কিন্তু নয়। আমার কথা শোন্। শায়লাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতেই হবে। আর এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে এখন একজন লোকই। বুঝতেই পারছিস।'

'তুই নিশ্চয়ই কুয়াশার কথা বলছিস? রাইট। আমার মনেই আসেনি কথাটা। কিন্তু তাতে আবার ছেলেধরারা চটবে না তো? আর চটে গিয়ে—'

'সে আশঙ্কার কথা যে আমাদের মনে হয়নি তা নয়। কিন্তু তবু ভেবে

দেখলাম, সেটাই একমাত্র পথ। শায়লারও তাই মত। ওদের ম্যানেজার অবশ্য রাজি নয়। কিন্তু এছাড়া আর কি করার আছে? উনি তো তোদের আত্মীয়। তোর বৌদির ভাই। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'লক্ষ্মী বোনটি, যেমন করে হোক তার সাথে কন্ট্যাক্ট করে এই বিপদের কথাটা বল। শুনেছি, মানুষের বিপদে উনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। নিশ্চয় শায়লাকে সাহায্য করতেও রাজি হবেন। উনি বোধহয় ঢাকাতেই আছেন।'

'গতকাল পর্যন্ত ছিলেন জানি। আজকের কথা বলতে পারব না।'

'চল। দরকার হলে আমিও তোর সাথে কুয়াশার কাছে যাব।'

'যাবার দরকার হবে না। আমি এখুনি ফোন করে ওঁকে ডেকে আনছি। তুই বরং ওঠ। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়টা বদলে নে। সারারাত তোর উপর দিয়েও নিশ্চয়ই ধকল কম যায়নি। বোধহয় রাতে তোর খাওয়াটাও হয়নি।'

'তা অবশ্য হয়েছে। আর খেতে গিয়েই তো এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা ঘটল,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রোজিনা।

'আচ্ছা, সে পরে শোনা যাবে। ওঠ এখন,' লীনা টেনে তুলল রোজিনাকে।

নাস্তা শেষ হবার পরপরই কুয়াশা এসে পৌঁছুল। তখনও লীনা ও রোজিনা ডাইনিং টেবিলে বসে।

ইতিমধ্যে হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় পাল্টেছে রোজিনা। বিষাদ সত্ত্বেও অনেক সতেজ দেখাচ্ছে তাকে।

খবর দিল গফুরই। জানাল, 'কুয়াশা দাদামণি এসেছেন।'

'এসেছেন? যা, ওঁকে এখানেই নিয়ে আয়। আর জলদি চায়ের পানি নিয়ে আসবি।'

'সে কথা কি আবার আমাকে বলতে হবে?' বেরিয়ে গেল গফুর। কুয়াশা এসে ঢুকল একটু পরেই।

'কি, লীনু দিদিমণি, হঠাৎ এমন সকাল বেলায় তলব! ব্যাপার কি? মহুয়াদের কোন খবর এসেছে নাকি?'

কথা বলতে বলতেই কুয়াশার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল রোজিনার দিকে। রোজিনাও কুয়াশাকে দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

'একটা বিপদে পড়ে গেছি, ভাইয়া। আমার এক বান্ধবীর সর্বনাশ হয়ে গেছে। তার পাঁচ বছরের একমাত্র সন্তান গতরাতে চুরি হয়ে গেছে। বুঝতেই পারছেন…।'

'ছেলে চুরি হয়েছে, কার?' দৃষ্টি ঘুরিয়ে রোজিনার দিকে তাকাল কুয়াশা।

'ইনি আমার বান্ধবী রোজিনা। রোজিনা হক্। আর উনিই হচ্ছেন কুয়াশা।'

অভিবাদনের ভঙ্গিতে দু'জনই মাথা নাড়ল।

'ওঁরই?' কুয়াশা বলল।

'না। ওর নয়। ছেলেটা ওর খালাতো বোনের। তার পক্ষ থেকে ও এসেছে আপনার সাহায্য চাইতে। আপনাকে সাহায্য করতেই হবে। "না" বললে আমি শুনছি না। আরে, আপনাকে বসতেই বলা হয়নি!'

একটা চেয়ার টেনে বসল কুয়াশা। সিগারেট ধরাল একটা। নীরবে কিছুক্ষণ সিগারেট টানল। তারপর রোজিনার উদ্দেশ্যে বলল, 'মিস হক, ব্যাপারটা খুলে বলুন।'

গফুর চায়ের সরঞ্জাম রেখে চলে গেল। লীনা টেনে নিল ট্রে-টা।

রোজিনা মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'সাদেক আহমদ সাহেবের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। আহমদ টেক্সটাইল মিলসের মালিক ছিলেন ভদ্রলোক। বছর দু'য়েক আগে দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।'

মাথা নাড়ল কুয়াশা।

'তাঁর একটাই ছেলে। ভদ্রলোক বিয়ে করেছিলেন আমার খালাতো বোনকে। অবশ্য সম্পর্কটা কাছের নয়। তবে ঘনিষ্ঠতা আছে। তাছাড়া মিসেস আহমদ অর্থাৎ শায়লা আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড ছিল ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত। লীনাও। বছর সাতেক আগে শায়লার বিয়ে হয়। ওদের পাঁচ বছরের একটি ছেলে আছে। একমাত্র সন্তান। সাদেক দুলাভাই মারা যাবার পর শায়লা গতকালের আগ পর্যন্ত একটা দিনের জন্যেও বাড়ি থেকে বেরোয়নি। কোনদিন কোন অনুষ্ঠানেও যোগ দেয়নি। গতকাল কি মনে করে বলল চল, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। প্রিন্সেস আমিনার নাচ দেখে আসি।'

একটু থেমে রোজিনা বলল, 'নাচ দেখে লাউঞ্জে বসে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করলাম। অনেক পরিচিত লোকের সাথে দেখা হল। কথায় কথায় দেরি হয়ে গেল। ফিরতে ফিরতে রাত এগারটা।'

'মিসেস আহমদ থাকেন কোথায়?'

'টঙ্গীতে।'

'আপনিও কি সেখানেই থাকেন?'

'না। আমার বাসা পুরানা পল্টনে। প্রতি শনিবার আমি টঙ্গীতে যাই। রোববারটা সেখানে কাটিয়ে সোমবার সকালে ফিরি। কালও গিয়েছিলাম সেখানে।'

'যদি কিছু মনে না করেন...?' কুয়াশা আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করল।

'আমি একটা ব্যাংকে চাকরি করি। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, আনম্যারেড।'

'তারপর?'

'রাত এগারটার দিকে শায়লার বাড়িতে ফিরলাম। শায়লা সোজা চলে গেল ছেলের খোঁজ করতে। গিয়ে দেখে, বিছানা শূন্য। ছেলে নেই। আয়াটা ঘুমোচ্ছে। এঘরে-ওঘরে খোঁজাখুঁজি করা হল। কিন্তু খোকন নেই। অনেক ধাক্কাধাক্কি করার

পর আয়ার ঘুম ভাঙল। আশ্চর্য! এতদিন জানতাম আয়াটার ঘুম পাতলা। অথচ গতরাতে অনেক কষ্টে তার ঘুম ভাঙাতে পারলাম। কিন্তু আয়া কিছুই বলতে পারল না। বরং উল্টো বমি করে ঘর ভাসাল। ওকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখাচ্ছিল। মনে হল, ওকে কোন ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছিল।'

'তাই হবে হয়ত।'

'শায়লা তো কাঁদতে লাগল। অগত্যা হাল ধরতে হল আমাকেই। মিলের ম্যানেজার মহীউদ্দিন সাহেবকে ফোন করলাম। ইতিমধ্যে খোকনের বিছানায় একটা চিরকুট পাওয়া গেল। ইংরেজিতে টাইপ করা। বাংলা করলে দাঁড়ায়ঃ

> "তোমার ছেলেকে নিয়ে গেলাম। আপাতত নিরাপদেই থাকবে। পুলিসে খবর দিলে আর ছেলের মুখ দেখতে পাবে না। পরবর্তী নির্দেশের জন্যে আগামীকাল দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা কর।"

প্রেরকের নাম-ঠিকানা নেই।

'চিঠিটা কে পেয়েছিল?' কুয়াশা প্রশ্ন করল।

'আমিই পেয়েছিলাম চিঠি। বালিশের পাশে ছিল। নিয়ে এসেছি চিঠিটা,' ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা চিঠি বের করে কুয়াশার হাতে দিল রোজিনা।

কুয়াশা পড়ল চিঠিটা। তারপর প্রশ্ন করল, 'ম্যানেজার সাহেব এসে কি বললেন?'

'তেমন কোন ডিসিশন দিতে পারলেন না। উনিও হতভম্ব হয়ে গেছেন। তবে ওঁর ইচ্ছে ছিল পুলিসকে জানাবার। কিন্তু আমি রাজি হইনি। শায়লাও না। অতটা ঝুঁকি নেয়া আমি সঙ্গত মনে করি না। কারণ, ছেলেধরাদের আসল উদ্দেশ্যটা এখনও জানা যায়নি। আর অন্তত পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত খোকন নিরাপদে থাকবে বলেই আমার ধারণা। কিন্তু একেবারে হাত গুটিয়ে বসে থাকাও যায় না। যদি...যদি একটা সর্বনাশ হয়েই যায়,' ঢোক গিলল রোজিনা। মিনতিভরা দৃষ্টিতে সে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাই আমি এসেছি আপনার সাহায্য চাইতে। আপনি ছাড়া কেউ এই বিপদ থেকে শায়লাকে উদ্ধার করতে পারবে না।'

লীনা কুয়াশার দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। চায়ে চুমুক দিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাল কুয়াশা। নীরবে লম্বা টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছাড়ল।

রোজিনা কুয়াশার দিকে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টিতে সকরুণ আবেদন। কে জানে কুয়াশা রাজি হবে কিনা।

রোজিনা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, 'আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না। বুঝতেই পারছেন, শায়লা কেমন কষ্ট পাচ্ছে। ওর মুখের দিকে তাকালে আমারই বুক ফেটে যায়।'

এতক্ষণে মুখ খুলল কুয়াশা। সে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না, কি ধরনের সাহায্য আপনারা আমার কাছে চাইছেন। ছেলেধরা দলটা যদি খোকনের জন্যে

বিরাট অঙ্কের মুক্তিপণ দাবি করে তাহলে মিসেস আহমদ কি তা দিতে রাজি আছেন? তার পক্ষে কি বিপুল পরিমাণ অর্থ দেয়া সম্ভব?'

'নিশ্চয়ই সম্ভব। ওরা বিরাট বড়লোক। কয়েক কোটি টাকার মালিক। টাকা দিতে শায়লার কোন আপত্তি নেই। শুধু সে তার ছেলেটাকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে পেতে চায়। আমাদের ধারণা, আপনি যদি এগিয়ে আসেন তাহলে খোকনকে আমরা খুব তাড়াতাড়িই ফিরে পাব। আর এ কাজটা শুধুমাত্র আপনার দ্বারাই সম্ভব। আমরা ছেলেধরাদের কাছ থেকে পরবর্তী নির্দেশ প্রত্যাশা করছি আজকে। যদি এখুনি আমার সাথে আসেন তাহলে হয়ত নির্দেশটা আপনিও দেখতে পাবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারবেন। লীনু, তুইও চল না আমাদের সাথে?'

'আমি…' দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলল লীনা।

'চল না তুমিও, লীনা?' কুয়াশাও অনুরোধ করল।

'বেশ চলুন, আমিও যাব,' লীনা রাজি হয়ে গেল।

'ছেলেটাকে কিভাবে চুরি করেছে তার হদিস পাওয়া গেছে কিছু?' কুয়াশা জানতে চাইল।

রোজিনা বলল, 'খোকন দোতলার উত্তর দিকের কামরায় ছিল। মই লাগিয়ে দোতলায় উঠেছিল ওরা। একটা জানালার নিচে মাটির উপর মই রাখার চিহ্নও দেখতে পাওয়া গেছে। আর পিছনের দেয়ালের বাইরে একটা মই পড়ে থাকতে দেখা গেছে। বাগানের মধ্যে দেয়াল পর্যন্ত পায়ের দাগও দেখা গেছে। মনে হয়, ছেলেধরা দু'জন এসেছিল। অন্ততঃ দু'জন ঢুকেছিল বাগানের মধ্যে।'

কুয়াশা জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস আহমদ বা আপনি এ ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করেন নাকি?'

'সন্দেহ—না, কাউকে তো সন্দেহ করার মত দেখছি না।'

'চাকর-বাকর? আয়া?'

'না, তারা সবাই বিশ্বস্ত। আর তাছাড়া ওরা সবাই খোকনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। চাকর-বাকরগুলো অধিকাংশই পুরানো। কেউ কেউ তো গত বিশ বছর ধরে আছে ও বাড়িতে।'

'চাকর-বাকর সবাই এই দুর্ঘটনার কথা শুনেছে তো?'

'হ্যাঁ, শুনেছে সবাই।'

'বাইরে এ ব্যাপারে ওদের আলাপ করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে?'

'মহীউদ্দিন সাহেব এ সম্পর্কে সবাইকে সাবধান করে দিয়েছেন।'

সিগারেটের শেষাংশ ছাইদানিতে ফেলে কুয়াশা বলল, 'আপনি বলছেন, চাকর-বাকররা সবাই বিশ্বস্ত। তাহলে, তাহলে…।'

'তাহলে কি?'

'তাহলে মিসেস আহমদ যে কাল রাতে বাসায় থাকবেন না তা ছেলেধরারা জানল কি করে?'

রোজিনা বোকার মত কুয়াশার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

লীনা বলল, 'আপনি বলছেন, মিসেস আহমদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েছে ছেলেধরাগুলো। কিন্তু মিসেস আহমদের উপস্থিতিতেও তো খোকন চুরি হতে পারত?'

'উহুঁ,' কুয়াশা বলল। 'মিস হক তো নিজেই বলেছেন, গত দু'বছর মিসেস আহমদ বাড়ির বাইরে বেরোননি মোটেও। আর প্রথম যেদিন বেরোলেন সেদিনই দুর্ঘটনাটা ঘটল। উনি বাসার বাইরে যাচ্ছেন, এটা বাইরের লোকদের জানবার কথা নয়। নিশ্চয়ই বাড়ির ভিতরে ছেলেধরাদের লিয়াজোঁ আছে।'

'কিন্তু সে তো অসম্ভব,' জোর দিয়ে বলল রোজিনা।

অবিশ্বাসের হাসি হাসল কুয়াশা।

'আমি খোকনকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টার ত্রুটি করব না। আপনি আর লীনা আগে চলে যান। আমি ঘন্টাখানেক পরে রওয়ানা দিচ্ছি। ভাল কথা, কাউকে আমার আসল পরিচয়টা জানাবেন না। পারিবারিক বন্ধু বলে পরিচয় দেবেন দরকার হলে। যতদূর মনে হচ্ছে, আমাকে মিসেস আহমদের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে দু'-এক দিনের জন্যে। সে ধরনের ব্যবস্থা করবেন। আর এই চিরকুটটা আপাতত আমার কাছেই রইল।'

রোজিনার মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হল। সে বলল, 'আমাদেরও ইচ্ছে, আপনি শায়লার বাড়িতেই গিয়ে কয়েকদিনের জন্যে উঠুন। বেচারি মনে সাহস ফিরে পাবে।'

দুই

রোজিনা আর লীনা যখন টঙ্গীতে মিসেস আহমদের বাসায় পৌঁছুল তখন দশটা বেজে গিয়েছে। প্রায় দুই একর জায়গা জুড়ে বিরাট দোতলা হাল ফ্যাশানের বাড়ি। নামটা সুন্দর। নীলাভ নিলয়। শায়লা নিজেই নাম দিয়েছে।

কেয়ারি করা বাগানের পাশ দিয়ে গাড়ি-বারান্দাতে গিয়ে থামল গাড়ি। ওদের দেখে এগিয়ে এলেন বছর তিরিশেক বয়সের এক ভদ্রলোক।

রোজিনা গাড়ি থেকে নেমে পরিচয় করিয়ে দিল। অভিবাদন বিনিময়ের পর রোজিনা প্রশ্ন করল, 'শায়লা কোথায়? দেখা হয়েছে ওর সাথে?'

সেকথার জবাব দিলেন না মহীউদ্দিন সাহেব। বরং বিরক্তিভরে বললেন, 'শুনলাম, আপনি নাকি তবু সেই ডাক্তার কাছে গিয়েছিলেন—কুয়াশা না কি নাম?'

ঈষৎ তপ্ত হল রোজিনা। সে একটু উত্তেজিত গলায় বলল, 'এছাড়া এমুহূর্তে আর কি করতে পারতাম। হাত-পা গুটিয়ে ভাগ্যের উপর সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চয় বসে থাকা যায় না, ম্যানেজার সাহেব?'

'না না, আমি তা বলছি না,' সুর নরম করলেন মহীউদ্দিন সাহেব। 'অন্তত পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত ছিল। এসব ব্যাপারে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হয়। তাছাড়া এই কাজের দায়িত্ব চাপালেন এমন একজন লোকের ওপর যার নামে পুলিসের ফাইলে হাজারটা অভিযোগ লেখা আছে।'

লীনা এতক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মহীউদ্দিন সাহেবকে দেখছিল। বেশ চালাক চালাক চেহারা ভদ্রলোকের। চোখে-মুখে অহঙ্কারের ঝিলিক। এই বয়সেই মাথায় চুল বেশি নেই। কিন্তু জুলপি নেমে এসেছে গালের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

রোজিনা বলল, 'বিষ ক্ষয় করার জন্যে বিষেরই দরকার। অন্তত আপনাকে তা বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই।'

গাড়ির হর্ন শুনে পথের দিকে তাকাল তিনজনই। একটা নতুন মার্সিডিস ঢুকল গেটের ভেতর। গাড়িটা ওদের কাছে এসে থামল। আরোহী আর কেউ নয়, কুয়াশা স্বয়ং।

রোজিনা কুয়াশার সাথে মহীউদ্দিনের পরিচয় করিয়ে দিল। বেজার মুখে অভিবাদন জানালেন তিনি মালেকানের বিশিষ্ট অতিথিকে।

কুয়াশা ও মহীউদ্দিন সাহেবকে ড্রইংরুমে বসিয়ে রেখে রোজিনা লীনাকে নিয়ে দোতলায় শায়লার কামরার দিকে এগোল। কুয়াশাকে যে মহীউদ্দিন সাহেব পছন্দ করেনি, বুঝতে দেরি হয়নি তার। কুয়াশা মনে মনে হাসল।

বিছানায় উপুড় হয়ে শায়লা তখনও ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। দু'জন তাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে অতিকষ্টে নাস্তা করতে রাজি করাল। পুরানো চাকর রুস্তম আলী শায়লার কামরাতেই নাস্তা নিয়ে এল। এক টুকরো রুটি আর চায়ের বেশি মুখে রুচল না শায়লার। কোনরকমে চায়ের কাপ শেষ করে সে নেমে এল ড্রইংরুমে। রোজিনা ও লীনাও এল তার সাথে।

মহীউদ্দিন সাহেব ইতিমধ্যে কাজের ছুতো দেখিয়ে মিলে চলে গেছেন। কুয়াশা সেই ফাঁকে বাড়ির চারদিকটা এক পাক ঘুরে চাকর-বাকরদের সাথে আলাপ-আলোচনার পালাটা সেরে ফেলেছে।

শায়লা ড্রইংরুমে ঢুকেই আবার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

কুয়াশা দরদভরা গলায় বলল, 'আপনি কাঁদবেন না, বোন। আপনার আদরের ধনকে আমি যেমন করে পারি ফিরিয়ে এনে দেব। শান্ত হোন আপনি। আপনার কোন ভয় নেই। লীনু, ওঁকে বসিয়ে দাও।

লীনা শায়লাকে একটা সোফায় বসিয়ে দিল। নিজেও পাশে বসল।

তবু কাঁদতে লাগল শায়লা। অনেকক্ষণ কান্নার পর কিছুটা শান্ত হল সে।

রুস্তম আলী কয়েকটা চিঠি নিয়ে ঢুকল। সামনের টেবিলটার ওপরে রাখল চিঠিগুলো।

রোজিনা সামনের দিকে মাথা নুইয়ে চিঠিগুলো তুলে নিচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই কুয়াশা সেগুলো হাতে নিয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না। আমি দেখছি।'

দ্রুত চোখ বুলাল কুয়াশা খামগুলোর উপর। অধিকাংশই অফিশিয়াল চিঠি। সম্ভবত মিল সম্পর্কিত। একটা লাইফ ইনশিওরেন্স কোম্পানির নোটিস। দু'টো ব্যক্তিগত চিঠি। মেয়েলি হস্তাক্ষর। শেষের চিঠিটার ঠিকানা টাইপ করা। ঠিকানাটা পরীক্ষা করে কুয়াশার চোখ দু'টো স্থির হয়ে গেল।

সে রোজিনার উদ্দেশে বলল, 'ভয়ানক ধূর্ত ঐ লোকগুলো। ওরা আগে থেকেই সব ঠিক করে রেখেছিল। তাই কাল খোকনকে চুরি করে নিয়ে যাবার আগেই এই চিঠিটা জি. পি. ও.-র ডাক-বাক্সে ফেলেছে। ওরা একরকম নিশ্চিতই ছিল নিজেদের সাফল্য সম্পর্কে।'

'সে কি! চিঠিটা, মানে, এই চিঠিটা ওরাই পাঠিয়েছে?'

'হ্যাঁ, এবং গতকালই পোস্ট করেছে। বিকেলে, জি.পি.ও.-তে। মিসেস আহমদ খুলুন চিঠিটা,' এগিয়ে দিল সে চিঠিটা শায়লার দিকে।

কম্পমান হাতে চিঠিটা নিল শায়লা।

'আপনি কি মনে করেন চিঠিটা ওদের লেখা?'

'মনে করি মানে, ওটা যে ওরাই পাঠিয়েছে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

চিঠিটা আঙুলের ফাঁকে ধরে বসে রইল শায়লা। তার চোখ-মুখ মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চিঠিটা খুলতে সে ভয় পাচ্ছে। তারপর মুহূর্তে সে যেন মনোবল ফিরে পেল। কাঁপা কাঁপা হাতে খামটা খুলে ছোট একটা কাগজ বের করল। ভাঁজ খুলে চোখ বুলাল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আপনি, আপনিই পড়ুন,' এগিয়ে দিতে গিয়ে হাত থেকে চিঠিটা মেঝেতে কার্পেটের উপর পড়ে গেল।

চিঠিটা তুলল কুয়াশা।

"আপনার সন্তান সুস্থ আছে। এই চিঠির নির্দেশমত চললে আজ মধ্যরাতে আপনার সন্তানকে সুস্থ ও অক্ষত অবস্থায় ফিরে পাবেন।

একটা সুটকেসে পাঁচ লাখ টাকা (পুরানো নোট) দিয়ে একজন বিশ্বস্ত লোককে রাত দশটার দিকে জয়দেবপুর জঙ্গলের মধ্যে কেশব বাবুর বাংলোতে পাঠিয়ে দিতে হবে। জায়গাটার মাইল দুয়েক এলাকার মধ্যে ছোটখাট ঝোপঝাড়। বড় গাছপালা নেই। সুতরাং চালাকি করার কোন অবকাশ নেই। আমার লোকেরা চারদিক থেকে সারাদিন নির্দিষ্ট জায়গাটার দিকে লক্ষ্য রাখবে। কোনরকম চালাকি করে ফল হবে না। পুলিসকে জানালে পরিণাম হবে ভয়াবহ। কোনদিনই আপনার ছেলেকে

ফিরে পাবেন না আর। (শায়লা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।)

আপনার লোককে একা এবং তাকে অবশ্যই মোটর গাড়িতে যেতে হবে। ঠিক রাত দশটায় তাকে বাংলোতে পৌঁছুতে হবে। আমার সাথে আপনার ছেলে থাকবে না। তবে আমাদের আন্তরিকতার প্রমাণস্বরূপ তার কাপড়চোপড় দেখিয়ে দেব। নির্দেশ যথাযথভাবে মেনে চললে মাঝরাতে ছেলে ফিরে পাবেন। আপনার লোককে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেব আমি। বাংলোর চারদিকে পুলিস বা অন্য কোনরকম চর পাঠালে আমি জানতে পারবই। ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হবে আপনার দূতকে। সে আমার সাক্ষাৎ পাবে না। মনে রাখবেন, আপনার ছেলের জীবন চরম বিপদের সম্মুখীন।"

'এখানেই শেষ। চমৎকার!'

অপরিচিত কণ্ঠ ভেসে এল দরজার দিক থেকে। সবাই মুখ তুলল। মহীউদ্দিন সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন দরজার কাছে। তিনি যে কখন এসে দাঁড়িয়েছেন কেউ তা লক্ষ্য করেনি।

কুয়াশা অত্যন্ত ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে মহীউদ্দিন সাহেবকে জরিপ করল। মহীউদ্দিন সাহেব একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের ফন্দি! আমি বলি, এসব ভয় দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয়। পুলিসে খবর দিলেই টের পাবে বাছাধনরা।'

রোজিনা বিরক্তিভরে মহীউদ্দিন সাহেবের দিকে তাকাল। সে বলল, 'আপনি কি চরম সর্বনাশটা ডেকে আনতে চান?'

'নিশ্চয়ই না। কিন্তু এসব ভাঁওতাবাজি। তাছাড়া টাকা দিলেই যে ওরা খোকনকে ফিরিয়ে দেবে এমন নিশ্চয়তা কোথায়? উপরন্তু নাগরিক হিসেবে পুলিসে এজাহার দেওয়াটাও আমাদের কর্তব্য।'

এসব বাক্‌বিতণ্ডা বোধহয় শায়লার কানে ঢুকছিল না। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কুয়াশাকে প্রশ্ন করল, 'আপনি কি বলেন?'

'আমার মনে হয়, টাকাটা দিয়ে দেয়াই ভাল। এই অবস্থায় কোনরকম ঝুঁকিই নেওয়া সমীচীন নয়।'

মহীউদ্দিন সাহেব, সরবে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শায়লা তাঁকে বলল, 'তাহলে মহীউদ্দিন সাহেব, আপনি পাঁচ লাখ টাকার ব্যবস্থা করুন। আজ বিকেলের মধ্যেই চাই।'

'কিন্তু এ তো অসম্ভব! এই কয়েক ঘন্টার মধ্যে নগদ এতগুলো টাকা কোথায় পাওয়া যাবে?'

'পেতেই হবে। যেভাবেই হোক,' মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় বলল শায়লা। 'আপনি এখুনি চলে যান। ব্যাংকে আমি ফোন করে দিচ্ছি।'

মহীউদ্দিন সাহেব প্রতিবাদ করতে গিয়েও কি মনে করে চেপে গেলেন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'বেশ, আপনি যা বলবেন তাই হবে। কিন্তু কেশব বাবুর বাংলোতে টাকাটা কি আমাকেই দিতে যেতে হবে?'

কুয়াশা দ্রুত বলল, 'না, ম্যানেজার সাহেব, ওই কষ্টটুকু আমিই করব। জায়গাটা আমার খুব ভাল করে চেনাও আছে।'

'ওহো, টাকাটা তাহলে আপনিই নিয়ে যাচ্ছেন বাংলোতে! উত্তম ব্যবস্থা!' রহস্যজনক হাসি হেসে মহীউদ্দিন সাহেব বললেন, 'তবু আমি বলছি, লোকগুলো ভাঁওতা দিচ্ছে। আপনার ছেলেকে ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছে ওদের নেই, মিসেস আহমদ। মাঝখান থেকে পাঁচ লাখ টাকাও যাবে। তাছাড়া টাকাটা যে যথাস্থানে যাবে, তারই বা ভরসা কি?'

'চিঠির নির্দেশ আমাকে মানতেই হবে। কথা বাড়াবেন না। আপনি এখুনি ব্যাংকে চলে যান!' শায়লা মৃদু ধমক দিল।

চুপসে গেলেন মহীউদ্দিন সাহেব। মুখখানা হাঁড়ির মত কালো করে চলে গেলেন তিনি।

রাতের জন্যে প্রতীক্ষা করা ছাড়া এখন আর কারও কোন কাজ নেই। দোতলার একটা রুমে থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কুয়াশার। সে সেখানে চলে গেল। তার সুটকেসটা রুমে পৌঁছে দিল চাকর।

চাকর-বাকরদের জানিয়ে দেওয়া হল যে, ছেলেধরাদের কাছ থেকে চিঠি এসেছে। খোকনকে ফিরে পাবারও আশা আছে পুরোমাত্রায়। তারা পুরো ব্যাপারটা গোপন রাখার শপথ পুনরায় উচ্চারণ করল। খোকনের আয়া পাঁচপীরের দরগায় শিরনি মানত করল।

সময় যেন আজ স্থির হয়ে আছে। ঘড়ির কাঁটা যেন ঘুরছে ধীরে, অতি ধীরে। দুপুরে নিঃশব্দে ওরা খেয়ে নিল। শায়লা তো বলতে গেলে খাবার নেড়েচেড়ে রেখে দিল। লীনা ও রোজিনারও তেমন রুচি হল না। চারটের দিকে ফিরে এলেন মহীউদ্দিন সাহেব। গাড়ির আওয়াজ শুনে শায়লা নিজেই ছুটে বেরিয়ে গেল। মহীউদ্দিন সাহেবকে প্রশ্ন করল, 'টাকা পেয়েছেন?' তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

'পেয়েছি। তবে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করতে হয়েছে,' ক্লান্ত স্বরে জবাব দিলেন মহীউদ্দিন সাহেব। 'কত রকম কৈফিয়ৎ দিতে হল ব্যাংককে! আমি তো সত্য কথাটা বলতেই পারলাম না,' ভারি সুটকেসটা নামালেন তিনি গাড়ি থেকে।

'তাতে কি? খোকন ফিরে এলেই আমি ওদের জানিয়ে দেব সব। ওরা বুঝতে পারবে তখন,' শায়লা প্রবোধ দিল মহীউদ্দিন সাহেবকে।

মহীউদ্দিন সাহেব নিজেই সুটকেসটা ড্রইংরুমে নিয়ে এলেন। পরমুহূর্তে কুয়াশাও ঢুকল সেখানে। শায়লাকে বলল, 'টাকা এসে গেছে। এই সুটকেসে আছে। এখন বাকিটা আপনার উপর নির্ভর করছে। আমি নির্দেশ পালন করেছি।

তারা যেন তাদের কথা রাখে, সেটাই শুধু দেখতে হবে আপনাকে।'

'কুয়াশা কোন জবাব দিল না।

একটু পরেই মহীউদ্দিন সাহেব চলে গেলেন। এবং যাবার সময় কুয়াশার প্রতি তীর্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে ভুললেন না।

শায়লাকে উপরে তার শয়নকক্ষে পাঠিয়ে দেয়া হল। রোজিনা তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিল। নিজেও খেল। লীনা কেমন যেন অস্থির এবং অসহায় বোধ করতে লাগল।

ড্রইংরূমে বসে সিগারেট খাচ্ছিল কুয়াশা। লীনা এসে বলল, 'একটা কথা বলব, ভাইয়া?'

'বল।'

'আপনার সাথে আমাকে নিয়ে যাবেন?'

'হঠাৎ তোমার এই দুর্মতি কেন?' অবাক হল কুয়াশা।

'নেবেন কিনা তাই বলুন আগে। কৈফিয়ৎ চাইবেন না।'

হাসল কুয়াশা, 'তা হয় না, লীনা, ওরা বড্ড ভয়ঙ্কর লোক। কথার এতটুকু খেলাপ হলে সর্বনাশ রোধ করা যাবে না। যেতে হবে আমাকে একাই।'

হতাশ হল লীনা। কুয়াশা আর কোন কথা বলল না। সে সিগারেট টানতে টানতে বোধহয় কর্মপন্থা চিন্তা করতে লাগল।

রাত ন'টার সময় নেমে এল শায়লা। একটু ঘুমিয়ে নেবার ফলেই হয়ত তাকে অপেক্ষাকৃত শান্ত দেখাচ্ছে।

কুয়াশা অভিযানের জন্যে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এল। বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে ছিল শায়লা। কুয়াশা তাকে বলল, 'আমি তাহলে চলি, বোন। দশটার সময় পৌঁছুতে হবে। আর দেরি করা সমীচীন নয়। এগারোটার মধ্যেই ফিরে আসব আশা করি।'

রোজিনা বলল, 'খুব সাবধান।' শায়লার সবকিছু আপনার সাফল্য-ব্যর্থতার উপর নির্ভর করছে। টাকা ভর্তি সুটকেসটা তুলে দেওয়া হয়েছে আপনার গাড়িতে।'

কুয়াশা মৃদু হেসে বলল, 'লীনা কোথায়? ওকে দেখছিনে যে?'

রোজিনা বলল, 'সম্ভবত উপরে আছে। ডেকে দেব?'

'না, দরকার নেই।'

'বিদায় নিয়ে মার্সিডিসে চাপল কুয়াশা।

কুয়াশা নিজে বা অন্য কেউ যে কথাটা জানতে পারল না, তা হল এই যে, লীনা মাত্র কয়েক মিনিট আগেই মার্সিডিসের বুটে স্থান করে নিয়েছে।

তিন

মার্সিডিসের লাগেজ-বুটটা এমন প্রশস্ত যে অর্ধশায়িত অবস্থায় লীনা তেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল না। কয়েক মিনিট পার হয়ে যেতেই উত্তেজনা দূর হল। তখন সে অনুভব করতে লাগল যে, সে একটা বিশ্রী হঠকারিতা করে ফেলেছে। বুটে তার উপস্থিতি যদি কোনরকমে ধরা পড়ে তাহলে খোকনকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। বিবেকের দংশনে লীনা মরে যেতে লাগল। তবুও সে বারবার নিজেকে এই বলে ক্ষীণ আশ্বাস দিতে লাগল যে, বুটে তার অবস্থান কেউ টের পাবে না। কুয়াশাও না, শত্রুপক্ষও না।

কিন্তু একটা কাজ করলে হয় না? বুটের গায়ে কোন একটা শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করলেই তো শব্দ পেয়ে কুয়াশা কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাকে খুঁজে পাবে। সে কি ধরা দেবে এইভাবে? নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করবে? কিন্তু সে সাহস তার হল না। কুয়াশা যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হবে, তা চিন্তা করে সে তার উপস্থিতি ঘোষণা করতে সাহস পেল না। অসহায়ের মত, নিয়তির নিষ্ঠুর খেলার পুতুলের মত সে নীরবে নিঃশব্দে বসে রইল বুটের মধ্যে। একবার ভাবল, দেখাই যাক না। সে তো আর নির্বোধ নয়? উপস্থিত বুদ্ধিও তার আছে। বিপদে আত্মরক্ষার, শুধু আত্মরক্ষাই নয় অন্যকে রক্ষা করার শক্তিও আছে তার।

কুয়াশা জয়দেবপুরের বড় সড়ক ছাড়িয়ে ডানদিকে সরু একটা কাঁচা রাস্তায় নেমে গেল। কেশব বাবুর বাংলোটা তার চেনা আছে। বড় সড়ক থেকে মাইল দুয়েক দূরে। নির্জন পথটা কাঁচা। এবড়োখেবড়ো। মাঝেমধ্যে গর্ত। সাবধানে এগোতে হয়।

শুক্লপক্ষের রাত। চারদিকে আলোর বন্যা। মায়াময় পরিবেশ রচনা করেছে। সেই আলোয় দৃষ্টি বহুদূর যায়।

মিনিট পনের পরে লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পৌছুল কুয়াশা। চাঁদনী রাতে নির্জন জীর্ণ বাংলোটা কেমন যেন ভূতুড়ে বলে মনে হচ্ছে। বাংলোর চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত একেবারে ফাঁকা। ছোট ছোট ঝোপঝাড় আছে, কিন্তু বড় গাছ নেই। দূরে, অনেক দূর দিয়েও যদি কেউ হেঁটে যায় তাহলেও তাকে দেখা যাবে। আশেপাশে লুকোবার কোন জায়গা আছে বলে মনে হল না এক বাংলোর ভিতরটা ছাড়া।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে ছেলেধরাদের বুদ্ধির তারিফ না করে পারল না কুয়াশা। ভাল জায়গাই বেছে নিয়েছে বটে। কারও পক্ষেই কাছেপিঠে লুকিয়ে থেকে ছেলেধরাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা সম্ভব নয়। ছেলেধরারা যদি তাকে লক্ষ্য করার জন্যে কোন পাহারাদার বসিয়ে থাকে কোথাও, তাহলে সে যে একা এসেছে তা বুঝতে তাদের বেগ পাবার কথা নয়।

নির্জন বাড়িটার চারদিক তাকিয়ে দেখল একবার। না, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি থেকে সুটকেসটা নামিয়ে মাটিতে রাখল।

চারদিকে অন্তহীন নৈঃশব্দ। কিছুক্ষণ পরে শুধুমাত্র একটি শব্দই তার কানে এল। একটা বিমান চলে গেল তেজগাঁ বিমানবন্দর থেকে। ঘড়িতে দেখল, রাত দশটা। ঠিক সময়েই এসে পৌঁছেছে। কিন্তু ওরা কোথায়? বাড়িটার ভিতরে? না, তা সম্ভব নয়। প্রায় এক গজ উঁচু কাঠের পাটাতনের উপর বাড়িটা। পাটাতনের নিচের দিকে তাকাল কুয়াশা। নিচে তরল অন্ধকার। ভাল করে দেখল। না, কেউ নেই। সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে পড়ল কুয়াশা। বিরাট একটা তালা ঝুলছে। সম্ভবত তালাটা দিয়েছে বন বিভাগের লোক। বাংলোটা এখন তাদেরই সম্পত্তি।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল কুয়াশা। গাড়ির দিক থেকে ক্ষীণ একটা ধাতব শব্দ ভেসে এল। কিন্তু কুয়াশা কিছু সন্দেহ করল না। নতুন গাড়ি থামিয়ে রাখলে অনেক সময় নানারকম ধাতব শব্দ হয়। কিন্তু শব্দটা হয়েছিল লীনার অসাবধানতায়। সে উৎকণ্ঠায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল।

বাংলোর সামনের প্রাঙ্গণে পায়চারি করতে লাগল কুয়াশা। মিনিট পনের পার হয়ে গেছে। ঘড়ি দেখল সে। দশটা পনের।

বিরক্ত হল কুয়াশা। এভাবে উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে তার সবসময়েই বিরক্তি লাগে। কে জানে, সমস্ত ব্যাপারটাই প্রতারণা কিনা। হয়ত অন্য কোন মতলব আছে ছেলেধরাগুলোর।...সময় আরও পার হয়ে গেল বিলম্বিত লয়ে।

এখন দশটা তিরিশ মিনিট। নিশ্চত হল কুয়াশা, তাহলে ওরা আসছে না। নিঃসন্দেহে ওরা প্রতারণা করেছে। অধৈর্য হয়ে ঘড়ি দেখতে লাগল কুয়াশা বারবার। না, কারও আসবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এবার তাহলে ফিরে যাওয়াই ভাল। আর দেরি করার কোন অর্থ হয় না।

অকস্মাৎ অনেক দূরে অন্ধকারে ক্ষীণ দুটো আলো দেখা দিল। উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে আলো দুটো। এদিকেই আসছে। মোটর গাড়ির ক্ষীণ একটা শব্দও শোনা গেল। ক্রমশ উচ্চতর হচ্ছে শব্দটা। এগিয়ে আসছে গাড়িটা। একটু পরেই একটা কর্টিনা কুয়াশার খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছুল। কিন্তু সেটা থামল না। তার খুব কাছ দিয়ে ঘন্টায় পনের মাইল গতিতে চলে গেল। গাড়ির মধ্যে চালককে দেখতে পেল কুয়াশা। চালক ছাড়া গাড়িতে দ্বিতীয় কেউ আছে বলে মনে হল না তার।

কাঁচা পথ বেয়ে গাড়িটা চলে গেল অনেক দূরে। তাকিয়ে রইল কুয়াশা সেদিকে। কে জানে অন্য লোকও তো হতে পারে? ছেলেধরা দলটির লোক হলে তো এখানেই থামত। অথবা এটা সাবধানতার লক্ষণও হতে পারে।

কিন্তু ঘুরে এল গাড়িটা ইউ-টার্ন নিয়ে। আপন মনে হাসল কুয়াশা। সাবধানী লোক, সন্দেহ নেই! শায়লা বেগম কথা রেখেছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়াই ছিল কর্টিনা আরোহীর লক্ষ্য।

গাড়িটা কুয়াশার মার্সিডিসের কাছেই থামল। ইঞ্জিন থামিয়ে আলো নিভিয়ে গাড়ি থেকে একটা দীর্ঘকায় লোক বেরিয়ে এল। মিশমিশে কালো স্বাস্থ্যবান লোকটা। গায়ে মোটা একটা রঙিন গেঞ্জি। পরনে খাকি প্যান্ট।

কুয়াশা এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। কিন্তু কথা বলল প্রথমে লোকটাই। মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে খসখসে গলায় বলল, 'কোই গলতি হুয়া, ভাইসাহাব?' উচ্চারণে বোঝা গেল লোকটা বাঙালী।

'এখন পর্যন্ত না,' জবাব দিল কুয়াশা।

লোকটা বলল, 'এই নির্জন জায়গায় গাড়ি দেখে ভাবলাম, কোন বিপদে পড়েছেন বোধহয়। হয়ত পেট্রল ফুরিয়ে গেছে। অথবা অন্য কোন ট্রাবল। হয়ত আপনার কোন সাহায্য দরকার হতে পারে।'

'অবশ্যই। এসব খেজুরে আলাপ বাদ দিয়ে কাজের কথা শুরু করলেই পারেন,' রুক্ষ গলায় বলল কুয়াশা। 'আমি জানি, আপনি কে আর কেন এসেছেন।'

লোকটা বোধহয় একটু ধাক্কা খেল। ঠিক এই ধরনের কাটা কাটা কথা সে যেন শায়লা বেগমের দূতের কাছে আশা করেনি। সে হয়ত ভেবেছিল, শায়লা বেগম নিজেই আসবে টাকাটা নিয়ে। কি ভেবে সে বলল, 'সেই ভাল। বাজে কথায় লাভ নেই। একাই এসেছেন তো?'

'সন্দেহ থাকলে গাড়িটা দেখতে পারেন তল্লাশ করে।'

লোকটা প্যান্টের পকেট থেকে একটা টর্চলাইট বের করে গাড়ির জানালা দিয়ে ভেতরটা দেখল। কেউ নেই ভিতরে।

'সন্দেহ ঘুচল? গ্লোভ-বক্স আর বুট দেখবেন না?'

বুটের মধ্যে লীনার বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। মেরুদণ্ডের ভিতরটা শিরশির করতে লাগল তার। ধরা পড়ে যেতে আর বাকি নেই—তারপর সব শেষ। চরম সর্বনাশের মুহূর্তটা এসে গেছে।

বুটের দিকে লোকটা এগোতে গিয়ে কি মনে করে থমকে দাঁড়াল। কুয়াশার কণ্ঠস্বরে কি যেন একটা আছে যা তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। তার হাতে একটা রিভলভার দেখা দিল মুহূর্তের মধ্যে।

'থামুন আপনি,' লোকটা বলল। 'ঐ খানেই দাঁড়িয়ে থাকুন। আর এক পা-ও এগোবেন না। আপনাকে আমি বিশ্বাস করতে পারছিনে,' কুয়াশার বুকের দিকে রিভলভারটা উদ্যত করল লোকটা। দু'তিন পা পিছিয়ে মার্সিডিসের বুটের হ্যাণ্ডেলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

লোকটা হ্যাণ্ডেলটা প্রায় ধরতে যাচ্ছিল। কুয়াশা বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলল, 'খুলেই দ্যাখ, ওর মধ্যে তোমার মৃত্যু-পরোয়ানা আছে। বিশজন পুলিস হাতকড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। শায়লা বেগম পাঠিয়েছেন ওদের,' দু'পা এগিয়ে এল কুয়াশা কথা বলতে বলতে।

'খবরদার! মিথ্যা ভ্যাচর ভ্যাচর কোরো না,' লোকটার মনে একটা নিশ্চিত সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছে। 'আমি বুটটা যাতে না দেখি তাই তুমি চাও? খবরদার! আর এক পা-ও এগিয়ো না যদি জীবন বাঁচাতে চাও,' কুয়াশার দিকে তখনও তার রিভলভারটা উদ্যত।

খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে দুজন। লোকটা বলল, 'পিছিয়ে যাও বলছি। তিন সেকেণ্ড সময় দিলাম। এক, দুই, তি—।'

সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে গেল ঘটনাটা। কুয়াশা কাত হয়ে ডান পা দিয়ে লোকটার ঠ্যাঙের দিকে একটা গুঁতো দিল। লোকটা তার বাঁ দিকে পড়ে যেতে লাগল। কিন্তু পুরোপুরি পড়ে যাবার আগেই তার ডান হাতে লাথি লাগল। রিভলভারটা হাত থেকে ছিটকে পড়ল। উঠে দাঁড়াবার আগেই কুয়াশা তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। বাঁ হাতটা পিছন দিকে মুচড়ে দিল। আর্তনাদ করে উঠল লোকটা।

'তুমি একটা আস্ত গাধা। ইচ্ছে করলে আমি তোমাকে এইখানে খতম করতে পারি,' কুয়াশা ধীরেসুস্থে বলল। 'সুতরাং রিভলভার দেখিও না। আপাতত ওটা যেখানে আছে সেখানেই পড়ে থাক। পরে তুলে নিয়ো।'

একটু কষ্ট করেই উঠতে হল লোকটাকে। রাগত গলায় বলল, 'বেশ, এর পরিণাম হাড়ে হাড়ে টের পাবে! চীফকে বলে দেব আমি। এর জন্যে শায়লা বেগমকে দুর্ভোগ পোহাতে হবে।'

কুয়াশা বাধা দিয়ে বলল, 'নির্দেশ ছিল, তোমার হাতে পাঁচ লাখ টাকা তুলে দিতে হবে। সে নির্দেশ শায়লা বেগম পালন করেছেন। এখন যা ঘটল তার জন্যে দায়ী তুমি একা। তোমার কৃতকর্মের জন্যে শায়লা বেগমকে ভাবতে হবে কেন?'

লোকটা তার হাত ডলতে ডলতে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তুমি লোকটা কে হে?'

'আমি যেই হই, কি এসে যায় তাতে? নিশ্চয়ই আমি গোলমাল করতে আসিনি। পুলিসও নই, ডিটেকটিভও নই। মিসেস আহমদের পরিবারের বন্ধু। তিনি আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন এবং ইচ্ছা না থাকলেও আমি এসেছি। ওখানে সুটকেসটায় টাকা আছে। কিন্তু সেটা নেবার আগে খোকনকে যে তোমরাই চুরি করেছ তার প্রমাণ দিতে হবে। তাছাড়া খোকনকে যে ফিরিয়ে দেয়া হবে সে নিশ্চয়তাও দিতে হবে।'

'সব হবে। কিন্তু তার আগে তোমার মার্সিডিসের বুটটা আমাকে দেখতেই হবে,' কুয়াশার গাড়ির বুটের হ্যাণ্ডেল ধরতে ধরতে বলল লোকটা। হ্যাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে বুটের ঢাকনা খুলে ফেলল সে। পকেট থেকে টর্চলাইট বের করে জ্বালল। একটু বিস্মিত হল লোকটা। আশাভঙ্গের বেদনাও অনুভব করল একটু। না, কোন জনপ্রাণী নেই বুটের ভিতরে। বুটটা শূন্য। কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলল সঙ্গে সঙ্গে।

'সন্দেহ ঘুচল?' তিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল কুয়াশা।

'সন্দেহ ঘোচানো আমার দরকার ছিল নিশ্চয়ই,' জবাব দিল লোকটা।

স্বস্তি বোধ করল লীনাও। নিতান্তই উপস্থিত বুদ্ধির বদৌলতে সে লোকটাকে বোকা বানাতে পেরেছে।

কুয়াশা যখন লোকটাকে ধরাশায়ী করেছিল সেই মুহূর্তটাকে সে কাজে লাগিয়েছিল। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সাথে ওদের দু'জনের অলক্ষ্যে বুট থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে ঢাকনা নামিয়ে গাড়ির তলায় আশ্রয় নিয়েছিল। সমস্তটা কাজে তার লেগেছিল মাত্র দশ সেকেণ্ড।

নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে সেখানে পড়ে রইল সে।

অন্তত এই মুহূর্তের জন্যে সে নিশ্চিত। তার উপস্থিতি ওরা টের পায়নি। কুয়াশাও না, শত্রুপক্ষের ঐ লোকটাও না। উত্তেজনা ধীরে ধীরে প্রশমিত হতেই সে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগল।

লোকটা বলল, 'সন্দেহ নেই, শায়লা বেগম নির্দেশ নির্ভুলভাবে পালন করেছেন,' প্যান্টের পকেট থেকে একটা কাপড় বের করে বলল, 'এটা তোমাদের বাচ্চার স্লীপিং সুট। দেখে নাও ভাল করে। বুক পকেটে ছেলেটার নামের আদ্যাক্ষর এমব্রয়ডারী করা আছে।'

উৎসাহ দেখাল না কুয়াশা। এসব ব্যাপারে যে প্রতারণা কেউ করতে চায় না, তা সে জানে। তবু একনজর দেখে সুটটা সে পকেটে ঢোকাল।

'কিন্তু পরবর্তী নির্দেশ?'

'বলছি। অপেক্ষা কর, টাকাটা কোথায়?'

'ওই তো সুটকেসে। তোমার নাকের ডগাতেই রয়েছে।'

'দেখতে চাই আমি।'

'বেশ তো, দেখে নাও। খোলাই আছে। তালা দেওয়া হয়নি। দরকার হলে গুনে নাও,' রাগে কুয়াশার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। তার ইচ্ছা করছিল, লোকটাকে প্রচণ্ড একটা লাথি মেরে খোকনের হদিস জানাতে বাধ্য করে। কিন্তু পরিণাম চিন্তা করে নিজেকে সংযত করল সে।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সুটকেস খুলল লোকটা। টর্চ জ্বেলে দেখে নিল, টাকাটা ঠিক আছে কিনা।

কুয়াশা তখন অন্য কথা ভাবছিল। গোড়াতেই তার ধারণা জন্মেছিল, এই লোকটা নিশ্চয় ছেলেধরা দলের দলপতি নয়। তার আচরণে সে-ধারণা বদ্ধমূল হল কুয়াশার। লোকটার কথা থেকেই তার ধারণার সমর্থন মিলেছে। এই লোকটাকে বাগে পেতে কুয়াশার কোন অসুবিধে হবে না। কিন্তু তাতে তার কার্যসিদ্ধিও হবে না। এই ধরনের অপরাধ যারা করে তারা অত্যন্ত হুঁশিয়ার। এমনও হতে পারে যে, তাদের আসল গুরুকে লোকটা নিজেই চেনে না।

টাকার বাণ্ডিলগুলো পরীক্ষা করে দেখল লোকটা। কোন গোলমাল আছে বলে তার মনে হল না। সুটকেসের ডালাটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে, সব কিছু ঠিকই আছে।'

'এবার তাহলে তোমাদের প্রতিশ্রুতি পালন কর,' কুয়াশা আবেদনের ভঙ্গিতে বলল।

'তোমাকে এখানে আরও আধঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। এখন রাত এগারটা। সাড়ে এগারটা পর্যন্ত এখান থেকে তুমি নড়বে না। যদি তার আগে এখান থেকে রওয়ানা দাও, আমরা জানতে পারবই। সুতরাং ঐ চেষ্টাটা কোরো না। আসলে আমি ইতিমধ্যেই টর্চলাইট দিয়ে সিগন্যাল দিয়েছি।'

'বেশ। তাই হবে। তারপর?' অধৈর্য গলায় বলল কুয়াশা।

'নীলাভ নিলয়ে ফিরে যাবে সোজা। শায়লা বেগমকে বলবে আমাদের পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করতে।'

'কিন্তু মাঝরাতের মধ্যেই তোমরা ছেলেটাকে ফিরিয়ে দেবে বলে ওয়াদা করেছ,' হতাশ হয়ে বলল কুয়াশা। 'তোমাদের কায়দাকানুন আমার আদতেই পছন্দ হচ্ছে না।'

'তা না হলে আমাদের কিছুই এসে যায় না। মিসেস আহমদ তাঁর ছেলে ফিরে পাবেন। কিন্তু তা তাঁর যখন খুশি হবে তখন নয়, আমাদের নির্ধারিত সময় অনুযায়ী। অবশ্য মাঝরাতের কাছাকাছি সময়েই ফিরে পাবেন বোধহয়, বেশি দেরি হবে না।'

'কিন্তু কিভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছ?'

'ধীরে রজনী, ধীরে। অস্থির হচ্ছ কেন? শোন, রাত বারটার দিকে টেলিফোন করে জানানো হবে, কখন কিভাবে ছেলেকে পাবে তোমরা,' লোকটার কণ্ঠে এতক্ষণে আত্মপ্রত্যয়ের আভাস। প্রথম দিকে কুয়াশার ব্যক্তিত্বের সামনে অস্বস্তি বোধ করলেও টাকা ভর্তি সুটকেসটা হাতে এসে যাওয়ার পর তার আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে। সে ভাল করেই জানে, মিসেস আহমদের দূতের পক্ষে তাদের নির্দেশ অবহেলা করার সাধ্য নেই।

সুটকেসটা নিয়ে ধীরেসুস্থে গাড়িতে উঠল লোকটা। সিটের পিছনে সুটকেসটা নামিয়ে রেখে এঞ্জিন স্টার্ট দিল। মনের আনন্দে শিস দিয়ে উঠল। গাড়িতে সঞ্চারিত হল প্রাণ। কুয়াশার উদ্দেশে হাত নেড়ে 'টা টা' বলতেও ভুলল না। কিন্তু লোকটা জানতে পারল না যে, আসার সময় সে একা এলেও ফেরার পথে গাড়িতে সে অন্য একজনকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

লীনা পুনরায় সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। লোকটা যখন টাকা গুনছিল কুয়াশা তখন তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। এই অবসরে লীনা মার্সিডিসের তলা থেকে বেরিয়ে লোকটার গাড়ির বুটের ভিতরে স্থান করে নিয়েছে। ভয়ঙ্কর একটা

ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে, তা সে জানে। কিন্তু অদ্ভুত একটা জেদ তখন তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। স্বভাবতই সে ধারণা করল, খোকনকে যেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে গাড়িটা এখন সেখানেই যাচ্ছে। তার একবারও মনে হল না যে, সে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই নিজের বুদ্ধির উপর গভীর বিশ্বাস জন্মেছে তার। যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারবে, এই বিশ্বাসই তাকে এই বিপজ্জনক পথে দ্বিতীয়বার পা বাড়াতে প্রেরণা জুগিয়েছে। হাজার হলেও সে শহীদ খানের বোন। দরকার হলে ভাইয়ের স্থান পূরণ করতে পারবে, এমন বিশ্বাস তার আছে।

বারটার কয়েক মিনিট আগে কুয়াশা নীলাভ নিলয়ে পৌঁছুল। বারান্দায় বসে ছিল শায়লা বেগম। সে ছুটে এল গাড়ির কাছে। 'দেখা হয়েছে, দেখা হয়েছে ওদের সাথে?' উৎকণ্ঠিত মা প্রশ্ন করল।

শান্ত গলায় কুয়াশা বলল, 'ওদের একজন এসেছিল, তাকে টাকা দিয়ে দিয়েছি। আপনার ছেলে যে তাদের কাছেই আছে, তার প্রমাণ হিসেবে খোকনের স্লীপিং সুটটা ফেরত দিয়েছে। বারটার সময় তারা টেলিফোনে শেষ নির্দেশ দেবে।'

'আর কিছু বলেনি? আর কিছুই না?' শায়লা বেগম উদ্বেগ আর নিরাশায় ভেঙে পড়ল। 'কোথায় আছে আমার বাবু, তা—তা বলেনি কিছু…?'

'ঐ ধরনের কিছু ওরা কখনও বলে না,' বাধা দিয়ে বলল কুয়াশা। 'টেলিফোনেই বাকিটা বলবে। এখন তো প্রায় বারটা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা ফোন করবে, আশা করছি। আপনি আপনার কথা রেখেছেন, ওরাও নিশ্চয়ই ওদের কথা রাখবে,' আশ্বাসের সুরে বলল কুয়াশা। কিন্তু মায়ের মন এতে আশ্বস্ত হবার নয়। তার চোখ বেয়ে আবার ঝরঝর করে পানি ঝরতে লাগল। প্রচণ্ড শক্তিতে কান্না রোধ করে শায়লা ধীরে ধীরে বারান্দার দিকে এগোল।

পিছনে পিছনে এগোল কুয়াশা। সে বলল, 'ব্যাপার কি! ওরা সব কোথায়? লীনা, মিস্ হক, মহীউদ্দিন সাহেব? আপনি একা কেন?'

'সে কি! লীনার কথা আপনি জানেন না?' বিস্মিত হল শায়লা। 'আপনি যাবার পর থেকেই তো ওকে দেখছিনে! ভাবলাম, সে বোধহয় আমাদেরকে না বলেই চলে গেছে। আপনাকেও কিছু বলেনি?'

'না তো! আমি কিছুই জানি না। এ তো আরেক ভাবনার কারণ হল দেখছি! মিস্ হককেও তো দেখছিনে। ঘুমোচ্ছেন বোধহয়?'

'না। লীনার জন্যে ওরও ভাবনা হচ্ছিল। হয়ত লীনা বাসায় ফিরে গেছে। নিশ্চিত হবার জন্যে রোজিনা ঢাকায় লীনার বাসার দিকে গেছে। আর মহীউদ্দিন সাহেব জরুরী কাজে গেছেন।'

'মিস হকের সাথে কে গেছেন?'

'একাই গেছে সে। রোজিনা অত্যন্ত সাহসী মেয়ে। কোন কিছুতেই ভয় পায় না ও।'

ভিতরে ভিতরে লীনার জন্যে উদ্বিগ্ন হল কুয়াশা। কে জানে, লীনা আবার কোন বিপদে পড়ল কিনা। এমনও হতে পারে, লীনা একা একাই কেশব বাবুর পরিত্যক্ত বাংলোতে গিয়েছিল। সেটা বড় বিপদের কথা।

ড্রইংরুমে গিয়ে বসল কুয়াশা। একটা সিগারেট ধরাল। চুপচাপ সিগারেট টানতে টানতে সে পরবর্তী কর্মপন্থা চিন্তা করতে লাগল।

চার

পরিণাম সম্পর্কে এতটুকু চিন্তা না করেই লীনা কার্টিনার বুটে ঢুকে পড়েছিল। এতে যে চরম বিপদ নিহিত আছে মুহূর্তের উত্তেজনায় তা বিস্মৃত হয়েছিল। তাছাড়া তার এই অ্যাডভেঞ্চারিজমের আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কিনা তাও ভেবে দেখবার প্রয়োজন অনুভব করেনি।

কিছুক্ষণ উঁচু-নিচু পথে চলার পর একটা মসৃণ পথের উপর গিয়ে উঠল গাড়িটা। বেশ দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে গাড়ি। প্রায় চল্লিশ মিনিট চলার পর গাড়ির গতিবেগ আবার কমে গেল। আবার সেই উঁচু-নিচু পথের অনুভূতি। কিছুক্ষণ চলার পর এক সময় থেমে গেল গাড়িটা। এঞ্জিনটা থেমে গেল। লোকটা গাড়ি থেকে নেমে খটাশ করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল লীনা।

কে যেন দ্রুত গতিতে হেঁটে আসছে গাড়ির দিকে। কান পেতে রইল লীনা। পদশব্দটা এসে থামল গাড়ির দরজার কাছেই।

'সব ঠিক আছে তো আইয়ুব আলী?' একটা ব্যগ্র কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

জবাব এল, 'সব ঠিক আছে। শায়লা বেগম কোন ফাঁদ পাতবার সাহস পায়নি। পরিণতি চিন্তা করে নিশ্চয়ই।'

'টাকা পেয়েছ?'

'নিশ্চয়ই।'

'সাবাস! আমি ভেবেছিলাম, সব ভেস্তে যাবে,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল লোকটা। 'তাহলে কেল্লাফতে কর্ দিয়া।'

'অতো খুশি ভাল নয়, নওসের,' চিন্তাজড়িত কণ্ঠস্বর শোনা গেল আইয়ুব আলীর। 'যে লোকটা টাকা নিয়ে এসেছিল সে খুব সুবিধের লোক বলে মনে হল না। বেশ কঠিন ঠাঁই। বড় শক্ত লোক। যে-কোনরকম বিপদে ফেলতে পারত। বলতে গেলে, আমি কোনরকমে বেঁচে এসেছি।'

'তার মানে! পুলিস-টুলিস নয় তো?'

'পুলিস নয় তাতে সন্দেহ নেই। ওদের পরিবারের বন্ধু। মিসেস আহমদ এই কাজের জন্যেই ওকে এনেছে। যাকগে, বাদ দাও ওসব কথা। আর তো কোনদিন তার সাথে দেখা হচ্ছে না। টাকা তো হাতে এসেই গেছে। বাচ্চাটা কেমন আছে?'

'চমৎকার।'

'কোন ঝামেলা পাকায়নি তো?'

'মোটেও না। খাবার যা দিয়েছিলাম, সুন্দর করে খেল। আর হাজারবার মায়ের কথা জিজ্ঞেস করল। জানি, আইয়ুব, বাচ্চাটা বড় ভাল। বড় আদর করতে ইচ্ছে করে। কত রকম কথা বলে! আর কি মিষ্টি করে বলে!'

'ঘুমোবার আগে সেই - সেই দুধটা দিয়েছিলে তো?'

'হ্যাঁ।'

'খেয়েছে?'

'চেটেপুটে খেয়েছে।'

'ভাল। তাহলে আর দুশ্চিন্তার কিছু নেই। রাতে আর ওকে নিয়ে ঝামেলা করতে হবে না। আর কাল থেকে তো এই পাটই চুকে যাবে। রাতে আমরা চলে যাওয়ার পর কান্নাকাটি না করলেই হল।'

প্রত্যেকটা কথা স্পষ্ট শুনতে পেল লীনা। তাহলে ওরা খোকনকে মাদকদ্রব্য খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছে? ক্রুদ্ধ হল সে। তবে সুখের বিষয়, ওর কোন ক্ষতি ওরা করেনি। অনেক কথাই জানতে পেরেছে সে। তার দুঃসাহসিক অভিযান একেবারে ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু ছেলেটাকে ওরা রেখেছে কোথায়? নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও হবে। সম্ভবত এখানেই ওদের আস্তানা। তার মানে, ওদের দলপতিরও এখানে আসবার সম্ভাবনা আছে।

বাইরে কণ্ঠস্বর শোনা গেল আবার, 'সুটকেসটা নামিয়ে ফেল নওসের। এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না। যত তাড়াতাড়ি সরে পড়া যায় ততই ভাল।'

'ঠিক ঠিক।'

লীনা গাড়ির দরজা খোলার ও বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেল।

'সুটকেসটা বেজায় ভারি,' বলল নওসের।

'এত কথা বল কেন? চল এখন,' আইয়ুব আলীর বিরক্তভরা কণ্ঠ শোনা গেল।

ধীরে ধীরে পদশব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই নীরব হয়ে গেল জায়গাটা। লোক দুটো কিছুটা দূরে চলে গেছে। এখন তার নেমে পড়ার সময় এসেছে। এসেই যখন পড়েছে তখন ওদের কার্যকলাপ দেখতে হবে। চোখের আড়াল হতে দেয়া যাবে না। অতি সাবধানে সে ভিতর থেকে বুটের ঢাকনার হ্যাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে ঢাকনাটা তুলে ফেলল। নিঃশব্দে মাটিতে নামল। তারপর চারদিকে তাকাতে লাগল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

আকাশে সাদা মেঘ জমেছে। চাঁদটা ঢেকে গেছে। কেমন যেন ঘোলাটে আধো-অন্ধকার। অনেকক্ষণ পর বুটের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এই অনুজ্জ্বল আলোতেও স্পষ্ট দেখতে পারছে চারদিকে লীনা। একটা জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সে। তার চারদিকে বেশ উঁচু-নিচু গাছপালা। মাঝখান দিয়ে সাত-আট ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা। অনেকটা টানেলের মত দেখাচ্ছে। অদূরে একটা বাড়ির মত দেখা যাচ্ছে। ঠিক তার সামনে গিয়ে পৌঁছেছে লোক দুটো। লীনা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওদেরকে। সম্ভবত বাড়িটা জনহীন। বেশ উপযুক্ত জায়গাই ওরা খুঁজে বের করেছে। এটাই বোধহয় তাদের সদর দফতর। কিন্তু জায়গাটা কোথায়? সে কোথায় এসে পড়েছে?

গাছের ছায়ায় ছায়ায় দ্রুত নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল লীনা। সামনে একটা খাল কিংবা নদী। যেটাকে বাড়ি বলে মনে হয়েছিল সেটা আসলে জীর্ণ একটা পাকা দালান। নদীর তীরেই। লোক দুটো ততক্ষণে একটা নৌকোয় চেপে বসেছে। একজন বৈঠা চালাচ্ছে। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে নৌকোটার দিকে তাকিয়ে রইল লীনা। প্রায় হাত তিরিশেক দূরেই একটা লঞ্চের মত দাঁড়িয়ে। ঠিক লঞ্চ নয়, ক্রুজার জাতীয়, উঁচু নয় বেঁটে। জীর্ণ মলিন চেহারাটা দূর থেকেও দেখা যায়।

'চমৎকার!' ছেলেধরা দলটির প্রশংসা না করে পারল না লীনা। জঙ্গলের মধ্যে জীর্ণ বাড়ি, নদীর মধ্যে ভাঙা ক্রুজার। দূরে নদীর ওপারে, বহুদূরে দু'একটা আলোর শিখা দেখা যাচ্ছে। কাছেপিঠে নিশ্চয়ই জনবসতি নেই। থাকলেও ঐ জীর্ণ ক্রুজার সম্পর্কে নিশ্চয়ই কারও উৎসাহ নেই। তাই ছেলেধরা দলটি ওটাকেই তাদের সদর দফতর হিসেবে ব্যবহার করতে পারছে নিশ্চিন্তে।

খোকনকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা জানতে পেরে শিহরণ অনুভব করল লীনা। সে দেখল ডিঙিটা ক্রুজারের গায়ে গিয়ে ভিড়ল। সেদিকে চেয়ে রইল লীনা। কিন্তু একটু পরেই আবার লোক দুটো ডিঙিতে চাপল। লীনা ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। নিজেকে মিশিয়ে দিল অন্ধকারের মধ্যে। একটু পরেই ওদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল লীনা।

নওসের বলল, 'ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই বুঝতে পারলাম না।'

'কোন্ ব্যাপারটা?'

'এইভাবে ক্রুজারের কেবিনে এতগুলো টাকা রেখে দেওয়ার কি মানে আছে?'

'কি করে বলব? চীফের যেমন হুকুম। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।'

লীনার খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছিল ওরা। ওর কানে এল, 'কিন্তু এই চীফটা কে বল তো এবারে? তুমি তো আজ পর্যন্ত বললে না?'

'বলবও না। শুনতে চেয়ো না। দরকারও নেই। তোমার তো টাকা পাওয়া দিয়ে কথা? সেটা পাবে কালকেই। এখন আমাদের একমাত্র কাজ হল, ঘরে ফি

ঘুমিয়ে পড়া। চীফ কি করল না করল, তা দিয়ে আমাদের দরকার কি? তাছাড়া…।'

পরের কথাগুলো শুনতে পেল না লীনা। ওরা তার শ্রবণ শক্তির সীমা পেরিয়ে গেছে। একটু পরেই গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ কানে এল।

তারও একটু পরে চলে গেল গাড়িটা

লীনা এখন একা। একটু স্বস্তি বোধ করতে লাগল সে অনেকক্ষণ পরে। একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলল সে। কিন্তু এখন সে কি করবে? কাছেপিঠে টেলিফোন পেলে কিছু একটা করা যেত। কিন্তু এখানে এই জঙ্গলের মধ্যে টেলিফোন আসবে কি করে?

তারচেয়ে বরং সেই রহস্যজনক চীফের জন্যে অপেক্ষা করা যাক। যদি তাকে চেনা যায়। অন্তত ভবিষ্যতে চিনবার মত কোন হদিস যদি সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু তা কি যাবে? এসব দলের সর্দাররা যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি সাবধানী হয়। তবু দেখা যাক। সে তো অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। এমন কি দলের দুজনের নামও জানতে পেরেছে। দলটাকে ধরবার জন্যে সেটাই কি যথেষ্ট নয়? তাছাড়া সে পথ-ঘাট চেনে না। এই গভীর রাতে যাবেই বা কোথায়? আর কুয়াশা নিশ্চয়ই খোকনকে নিতে আসবে ঘন্টাখানেকের মধ্যে। অবশ্য ওরা যদি কথার বরখেলাপ না করে। আর করলেও লীনা নিজেই বাকিটুকু করতে পারবে।

সুতরাং অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার।

প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলো সহজে পার হতে চায় না। বারবার ঘড়ি দেখল লীনা। সময় এগোতেই চায় না। এক একটি মিনিটকে এক একটা ঘন্টা বলে মনে হয়। আর কি সাংঘাতিক মশা। বড় জ্বালাতন করছে। একটা নয়, দুটো নয়, যেন হাজার হাজার মশা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর দুর্গত এলাকায় রিলিফ সামগ্রী এলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা যেমন লোভীর মত সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মশাগুলোও তেমনি যেন তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। একটা মুহূর্তের জন্যেও তিষ্ঠাতে পারছে না লীনা। সারা শরীরে হুল ফোটাচ্ছে। অথচ শব্দ করে জুৎসই একটা থাপ্পড়ও দিতে পারছে না লীনা। হাত-পা নেড়েও খুব সুবিধা করতে পারছে না। জোরে হাত-পা নাড়াচাড়া করলে গাছের পাতায় লেগে খসখস শব্দ হবে। যদি কোন পাহারাদার থাকে তাহলে শব্দটা তার কানে গেলে ফল ভাল হবে না। কিন্তু মশাগুলো শুধু তার রক্ত শোষণ করেই খুশি নয়, কানের কাছে রেডিও পাকিস্তানের কমার্শিয়াল সার্ভিসের হাজার বার শোনা বস্তাপচা গানের মত জ্বালাতন করছে। শেষ পর্যন্ত কি তাকে মশার উপদ্রবেই রণে ভঙ্গ দিতে হবে?

দূর থেকে একটা মোটর গাড়ির শব্দ আসছে না? কান পাতল লীনা। মনে হচ্ছে, একটা গাড়ি ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে। এই দিকেই আসছে গাড়িটা। আওয়াজটা ক্রমেই বাড়ছে। একটু পরেই আলো দেখা গেল। হেডলাইট নয়।

পার্কিং-লাইট জ্বালিয়ে আসছে গাড়িটা। ধীরে ধীরে সরু পথ বেয়ে এগোচ্ছে। লতা-পাতার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল লীনা গাড়িটা। তার সামনে দিয়ে ভাঙা বাড়িটার কাছে গিয়ে থামল। একজন মাত্র লোক গাড়িতে। শিউরে উঠল লীনা। যদি তাকে দেখে ফেলে!

গাড়ি থেকে নেমে এল একটা ছায়ামূর্তি। লীনার কাছে থামল সে। ডাইনে বাঁয়ে তাকাল একবার। গায়ে ঢিলে সাদা আলখেল্লা। মাথায় হ্যাট। মুখে মুখোশ। মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো বেরিয়ে পড়ল এই সময়। স্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে লীনা দেখল, ছায়ামূর্তি উঁচু পাড় বেয়ে নেমে গেল।

ইনিই তাহলে চীফ! ছেলেধরা দলের সর্দার! টাকা নিতে আসছে নিশ্চয়ই। হয়ত খোকনকেও নিয়ে যাবে ফিরিয়ে দেবার জন্যে। অথবা শুধু টাকাটাই নিয়ে যাবে। মিলিয়ে যাবে একেবারে। বাতাসে মিশে যাবে। কিন্তু এমন যদি হয়, খোকনকে যদি লোকটা নিয়ে যায়? যদি আবার টাকা দাবি করে? অথবা, অথবা···ভয়ঙ্কর একটা কিছু করে বসে? লীনার মেরুদণ্ডের মধ্যে শিরশির করে উঠল।

লোকটার হাঁটবার ভঙ্গিটা তার খুব পরিচিত বলে মনে হচ্ছে? খুবই পরিচিত। কে লোকটা? ছায়ামূর্তি ততক্ষণে নৌকোয় গিয়ে উঠেছে। লগি ঠেলে ডিঙিটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

লীনা ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে গাড়িটার কাছে এসে দাঁড়াল। একটা মরিস মাইনর। অন্ধকারে রং বোঝার উপায় নেই। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে দ্রুত ছোট একটা টর্চলাইট বের করে পিছনের নাম্বার-প্লেট খোঁজ করল।

আনরেজিস্টার্ড গাড়ি, কোন রকম নম্বর নেই। একেবারে নতুন। হার্ডবোর্ডে লেখা 'অন টেস্ট'। একটু নিরাশ হল লীনা। ধীরে ধীরে সে নদীর তীরে নেমে গেল। কোথা থেকে যেন খুব আস্তে আস্তে খটখট শব্দ আসছিল। কান পেতে শুনল লীনা, কিন্তু শব্দের উৎস আবিষ্কার করতে পারল না সে। মনে হল, শব্দটা বোধহয় ভাঙা ক্রুজার থেকেই আসছে। কে জানে, ওখানে কি হচ্ছে এখন। উদ্বেগে গলাটা শুকিয়ে আসতে লাগল তার। এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা যায় না। চাঁদ মেঘের আড়ালে লুকিয়েছে, আবার বেরিয়ে আসবে এখুনি। হয়ত 'চীফ' তাকে দেখে ফেলতে পারে। দ্রুত আবার সে পাড় বেয়ে উঠে ঝোপের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

কাজটা যে সে ভাল করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল একটু পরেই। ডিঙিট ফিরে এসে তীরে ভিড়ল। লীনা দেখল, বড় একটা সুটকেস হাতে নেমে এল সেই ছায়ামূর্তি। বেঁটেখাটো লোকটা। কোমরটা একদিকে সামান্য বাঁকিয়ে হাঁটছে সুটকেসটা নিয়ে হাঁটতে বোধহয় সামান্য অসুবিধা হচ্ছে ওর। তাই কোমরট বাঁকিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করছে। হাঁটবার ভঙ্গিটা সত্যি পরিচিত—তবু স্মরণ করতে পারল না লীনা। স্মৃতি-মন্থন করল দ্রুত। হ্যাঁ. একজনের সাথে ছায়ামূর্তির চলার

ভঙ্গির মিল আছে হুবহু। কিন্তু না, সে তো অসম্ভব! অসম্ভব! তাহলে এ অন্য লোক। অপরিচিত লোক। তাছাড়া একজনের সাথে অন্যজনের চলার ভঙ্গিতে সাদৃশ্য থাকা বিচিত্র নয়।

ছেলেধরা দলটির কার্যপদ্ধতি বুঝতে পারছে লীনা। টাকা নিয়ে নিরাপদে সরে যাবার পর খোকনকে ঐ ক্রুজার থেকে নিয়ে যাবার চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হবে। তার মানে, আরও ঘন্টাখানেকের ব্যাপার। এখন রাত দেড়টা। আড়াইটার আগে নিশ্চয়ই কুয়াশা আসছে না, অবশ্য ছেলেধরা দলটি যদি তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। অন্যথায়…।

ছায়ামূর্তি চলে যাবার পর লীনা আবার এসে নদীর তীরে দাঁড়াল। মেঘটা সরে গেছে। চাঁদের আলোয় সুপ্তিমগ্ন আকাশ-পৃথিবী ভরে গেছে। চিকচিক করছে নদীর বুক। আশ্চর্য সুন্দর লাগছে এই পরিবেশ। মনোহর, পরম মনোহর এই পৃথিবী। প্রকৃতির রূপশোভা আকণ্ঠ পান করতে লাগল লীনা।

পাঁচ

টেলিফোন বেজে উঠল রাত দুটোর সময়, দু'ঘন্টা অপেক্ষা করার পর। শায়লা বেগম হাত বাড়াল টেলিফোনের দিকে। কিন্তু কুয়াশা বলল, 'প্লীজ, আমাকে ধরতে দিন।'

হাত গুটিয়ে নিল শায়লা। রিসিভার তুলল কুয়াশা, 'হ্যালো।'

'কুয়াশা?' বাংলোয় দেখা সেই লোকটার কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ।'

'বেশ, তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেছ। এবার আমরা আমাদের কথা রাখতে চাই।'

'বেশ, বল?'

'মন দিয়ে শোন। কাঁচপুর ব্রিজ পার হয়ে, একটু এগিয়ে ডাইনে ভাঙা একটা রাস্তা পাবে। সেটা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা বদ্ধ জলাভূমিতে, লক্ষ্যা নদীর মজে যাওয়া একটা অংশ। দেখতে নদীর মতই। সেখানে আছে ভাঙা একটা ক্রুজার। সেখানেই আছে তোমাদের খোকন।'

কুয়াশা অবাক হল। ছেলেধরা দলটা তাদের কথা রেখেছে বলে নয়। লোকটার মুখে তার নাম শুনে। তার নাম লোকটা এত তাড়াতাড়ি জানল কি করে? সে তো নিজে তার নাম উচ্চারণ করেনি!

'জায়গাটা চিনতে পারছ?'

'হ্যাঁ, জঙ্গল আছে একটা।'

'ঐ জঙ্গলের মধ্য দিয়েই রাস্তাটা চলে গেছে।'

'চিনতে পারছি।'

'বেশ, এবার বাকিটা শোন। সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ,' লোকটার গলায় মকের আভাস। 'তুমি সেখানে একা যাবে। একেবারেই একা, আর তুমি কাউকেই তোমার গন্তব্যস্থান বলতে পারবে না। এমন কি বাচ্চাটার মাকেও নয়।'

'কিন্তু তা কি করে সম্ভব?'

'সম্ভব করতেই হবে,' লোকটার গলায় আদেশের সুর। কুয়াশা এই নতুন আদেশের কারণটা বুঝতে না পেরে একটু অবাক হল। কিন্তু তা প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করল না। সে বলল, 'কিন্তু ফোনটা যদি অন্য কেউ ধরত? ধর, যদি মিসেস আহমদ নিজেই ধরতেন, তাহলে কি হত?'

'আমি জানি তো, তুমি ওখানটাতেই থাকবে,' হাসল লোকটা। 'আর টেলিফোনের কাছেই থাকবে। তবু যদি অন্য কেউ ফোন ধরত তাহলে তোমাকেই ডেকে দিতে বলতাম। তোমরা যদি এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন কর তাহলেই শুধু তোমাদের শিশু নিরাপদ থাকবে। আমি আবার বলছি, কোথায় যাচ্ছ কাউকে বলতে পারবে না।'

লাইনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

কুয়াশা অবস্থাটা অনুধাবনের চেষ্টা করল। এটা কি নতুন কোন ফন্দি? টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। খোকন ক্রুজারের কেবিনে একা আছে। তাকে আনতে দশজন গেলেই বা ক্ষতি কিসের? কেন এই অতি সাবধানতা? নাকি কোন বিশ্রী ফন্দি করেছে লোকগুলো?

শায়লা ব্যাকুল দৃষ্টিতে কুয়াশার দিকে চেয়ে আছে। তার ঠোঁট কাঁপছে। বুকের ভিতরে চিরচির করছে। কুয়াশাকে চিন্তিত দেখে সে কোন প্রশ্ন করতে সাহস পাচ্ছে না। কে জানে, কোন অমঙ্গল-বার্তা শুনতে হবে কিনা।

কুয়াশা তাকে অভয় দিল, 'ভয়ের কিছু নেই। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আপনার ছেলেকে ফিরে পাবেন, এখুনি আমি যাচ্ছি ওকে আনতে।'

'আমি, আমিও যাব,' ব্যাকুল প্রার্থনা জানাল শায়লা বেগম।

'না, মিসেস আহমদ, তা হয় না। ওদের নির্দেশ, আমাকে একা যেতে হবে। আর কোথায় এখন খোকন আছে তা-ও কাউকে বলা চলবে না। জানি না কেন ওরা এই নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু তা অমান্য করলে খোকনের ক্ষতি হবে বলে শাসিয়েছে।'

'খোকন, খোকন ভাল আছে তো?'

'যতদূর জানি, ভাল আছে। কিন্ত আমি আর দেরি করতে পারছিনে। যত দেরিতে যাব খোকনকে আনতে ততই দেরি হবে।'

শায়লা যে খুশি হল না, তা বুঝল কুয়াশা। তার চোখে অনিশ্চয়তা ও ভয়ের চিহ্ন। কিন্তু উপায় কি? বেরিয়ে গেল কুয়াশা। একটু পরেই কুয়াশার গাড়ি স্টার্ট

দেওয়ার শব্দ কানে এল শায়লার।

উদ্বেগ-ব্যাকুল শায়লা করিডরে এসে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। সমস্তটা বাড়ি নীরব। চাকর-বাকর সব ঘুমিয়ে আছে। বুড়ো রুস্তম আলী জেগে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু শায়লা বেগম তাকে একরকম ধমক দিয়েই শুতে পাঠিয়েছে। কাউকে সহ্য করতে পারছে না সে। প্রায় আধঘন্টা চলে গেছে। নিঝুম রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে শায়লা প্রতীক্ষা-ব্যাকুল চিত্তে। কিছুক্ষণ আগে যে বাড়ির পিছনের বাগানের পাঁচিল ডিঙিয়ে একটা ছায়ামূর্তি ঢুকেছে তা সে জানে না। ছায়ামূর্তির হাতে একটা সুটকেস।

ছায়ামূর্তি নিঃশব্দ দ্রুততায় বাগানের ভেতর দিয়ে বাড়িটার পিছন দিকের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলল। এদিকটা এমনিতেই ফাঁকা। প্রধানত চাকর-বাকরগুলো এদিকেই থাকে। তারা সবাই এখন ঘুমাচ্ছে। দোতলায় যাবার একটা ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি আছে। ছায়ামূর্তিটা সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। না, কেউ নেই। আস্তে আস্তে অত্যন্ত নিঃশব্দে সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দোতলায়। কুয়াশার রুমটাতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। আলখেল্লার পকেট থেকে জোরালো একটা টর্চ বের করে কামরাটার কোনায় বসানো পুরানো একটা কাবার্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কাবার্ডের দরজাটা হাট করে খুলল ছায়ামূর্তিটা। ভিতরে গোটা তিনেক পুরানো সুটকেস পড়ে আছে। ছায়ামূর্তি তার হাতের সুটকেসটা পুরানো সুটকেসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। দরজাটা অমনি খুলে রেখেই সে আবার বেরিয়ে এল রুম থেকে। তিনটে রুমের পরে শায়লা বেগমের রুম। ভারি পর্দা ঝুলছে দরজায়। নিচ দিয়ে উজ্জ্বল আলোর রেখা বেরিয়ে আসছে। ছায়ামূর্তি পর্দা তুলে ভিতরে ঢুকল। সোজা চলে গেল খাটের কাছে। গদি তুলে একটা চাবির গোছা বের করে পকেটে পুরল। তারপর ফিরে এল কুয়াশার রুমে। কাবার্ডের ভিতরে কিছুক্ষণ আগে রেখে যাওয়া সুটকেসটার পিছনে চাবির গোছাটা নিঃশব্দে রেখে দিয়ে বেরিয়ে এল ছায়ামূর্তি।

অন্ধকারে পৈশাচিক হাসি হাসল ছায়ামূর্তি। তার পরিকল্পনা সফল হতে চলেছে। চরম সাফল্যের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে সে। কুয়াশা ও শায়লা বেগমকে এক তীরে বিদ্ধ করতে পেরেছে সে। তার মনস্কামনা পূর্ণ হতে আর দেরি নেই।

তখন অনেক দূরে জলাভূমির তীরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কুয়াশার জন্যে প্রতীক্ষা করছে লীনা। তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। অস্থিরতা আর অস্বস্তিতে গুমরে মরছে সে। তার বারবার মনে হচ্ছে, কোথায় কি যেন একটা গোলমাল ঘটেছে। কিন্তু এখন তা বোঝা যাচ্ছে না।

আসলে এমনটা কখনও হয় না। চুরি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাচ্চাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। অনেক সময় সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়। এত তাড়াতাড়ি বাচ্চা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা সে কোথাও শোনেনি। এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন

কারণ আছে। অন্য কোন অভিসন্ধি আছে। সে কুয়াশাকে বলবে, তার এই ধারণার কথা। কিন্তু কুয়াশা এত দেরি করছে কেন? এখনও কি নির্দেশ দেওয়া হয়নি?

ক্রুজারের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছিল লীনা। অবোধ শিশুটা একা ঐ ক্রুজারের মধ্যে আছে, ভেবে কষ্ট হচ্ছে লীনার। কিন্তু এগোতে সাহস পাচ্ছে না ও।

হাওয়া পড়ে গেছে। জলাভূমির জল নিস্তরঙ্গ। অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা চারদিকে। সেই স্তব্ধতা ভেদ করে অত্যন্ত ক্ষীণ একটা শব্দ কানে এল তার। প্রথমে সে শব্দটাকে গুরুত্ব দেয়নি কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল, ক্রুজারটা যেন একটু নিচু হয়ে যাচ্ছে। চমকে উঠল লীনা। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল। সর্বনাশ, ক্রুজার যে তলিয়ে যাচ্ছে! আর সেই মুহূর্তে সে শব্দের গুরুত্ব উপলব্ধি করল। বুদ্‌বুদের শব্দ ওটা। ক্রুজারটা যে ডুবছে শব্দটা তারই একটা প্রমাণ।

আতঙ্কে পাথর হয়ে গেল লীনা। তাহলে সেই ছায়ামূর্তিটাই এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা করে গেছে? সে হয়ত ক্রুজার থেকে নেমে যাবার আগে স্টপ-কক খুলে দিয়ে গেছে বা অন্য কিছু করে রেখেছে। তা না হলে ক্রুজারটা ডুববে কেন?

কিন্তু এর মানে তো খুন! ঠাণ্ডা মাথায় খুন। নিশ্চয়ই খোকনকে ওরা খুন করতে চায়। অসম্ভব! তা হতেই পারে না। খোকনকে যেমন করে হোক মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাতেই হবে। ইশ, আগেই যদি সে খোকনকে আনতে যেত! নিজেকে ধিক্কার দিল লীনা।

আর দ্বিধা করল না লীনা। নৌকা চালাতে জানে লীনা। সাঁতার দিতেও জানে ভাল। শাড়িটার আঁচল ভাল করে কোমরে পেঁচিয়ে লাফ দিয়ে ডিঙিটাতে চাপল সে। ওরা যদি পাহারা রেখেও গিয়ে থাকে তাহলে তা এখুনি জানা যাবে। সে চিন্তা করার সময় লীনার এখন নেই। তার লক্ষ্য এখন নিমজ্জমান ক্রুজার। তাকে এখুনি সেখানে পৌঁছুতে হবে। লগিটা তুলল লীনা। সে যত এগোতে লাগল বুদবুদের শব্দ ততই স্পষ্ট হতে লাগল।

ক্রুজারের ককপিটে উঠে একটা রডের সাথে ডিঙিটাকে বাঁধল আগে। ককপিটে ইতিমধ্যেই পানি উঠে গেছে একটু একটু। পায়ের পাতা ভিজে গেল লীনার। কেবিনের দরজাটা তার সামনেই। হ্যাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে ধাক্কা দিল। প্রথমটা সে ভাবল যে, দরজাটা বোধহয় তালা দেওয়া আছে। কিন্তু একটু পরেই সে বুঝতে পারল যে কেবিনের ভিতরের পানির চাপের জন্যে তার চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। কিন্তু পিছু হটলে চলবে না। দরজাটা যেমন করে হোক খুলতেই হবে, ভিতরে ঢুকতেই হবে। খোকনকে বের কবে আনতেই হবে। তার দেহে যতক্ষণ আছে শক্তি। শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা করবে। সে দরজায় কাঁধ লাগিয়ে দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে ঠেলতে লাগল। আর সামান্য ফাঁক হতেই সে তার পাতলা দীর্ঘ তনুটা সুকৌশলে ঢুকিয়ে দিল। কেবিনের ভিতরটা অন্ধকার। হাঁটু পর্যন্ত পানি উঠে গেছে। শাড়ির নিচের দিকটা ভিজে যাওয়ায় হাঁটতেও পারছে না ভাল করে। হাত-ব্যাগটা

ভাগ্যিস তখনও তার হাতে। দ্রুত টর্চটা বের করে আলো জ্বালল। আলোটা চক্রাকারে ছড়িয়ে পড়ল কেবিনের ভিতরে। ছোট কেবিনটায় দুটো জানালা। দুটোই ভারি নোংরা পর্দা দিয়ে ঢাকা। দু'পাশে দুটো করে বাঙ্ক। নিচের বাঙ্ক দুটো ইতিমধ্যেই ডুবে গেছে। উপরের একটা বাঙ্কের দিকে তাকাল। সেটা শূন্য। আলোটা ঘুরিয়ে অন্য বাঙ্কটার উপর ফেলল এবং সেখানে সেই বাঙ্কেই ঘুমন্ত একটা শিশুকে দেখতে পেয়ে আনন্দে ঘুমন্ত শিশুর মুখের উপর আলো ফেলল।

এখন পর্যন্ত নিরাপদেই আছে খোকন। পরম শান্তিতে ঘুমোচ্ছে সে। মুখে মিষ্টি হাসির ছাপ। অসুস্থতার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। টর্চের আলো মুখে পড়াতেও জাগল না খোকন। এমন কি নড়েচড়েও উঠল না। প্যান্ট আর গেঞ্জি রয়েছে খোকনের পরনে। পরিচ্ছন্ন ছোট একটা বিছানা। যাক, ওরা তাহলে খোকনের কোন ক্ষতি করেনি। আসলে খোকনকে যে অবস্থায় দেখতে পাবে বলে লীনা আশা করেছিল তার চেয়ে অনেক ভাল অবস্থাতেই তাকে রাখা হয়েছে।

লীনা কপালের উপর আলগোছে আঙুল ছোঁয়াল। ঠাণ্ডা কপাল। কোঁকড়া চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিল। ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিল মৃদু। কিন্তু নড়ল না খোকন। জাগল না।

বুঝতে বিলম্ব হল না লীনার। লোক দু'টো যে দুধের কথা বলেছিল তার কৃপাতেই এই অবস্থা হয়েছে খোকনের। ওরা ওকে দুধের মধ্যে কোন মাদকদ্রব্য মিশিয়ে দিয়েছিল নিশ্চয়ই। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগল লীনার।

কেবিনের মধ্যে পানি ক্রমেই বাড়ছে। পানি হাঁটু ছাড়িয়ে গেছে। আর বিন্দুমাত্র দেরি করা উচিত নয়। খোকনকে কোলে তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোতে লাগল লীনা। পানির মধ্যে দিয়ে এগোতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল তার। বারবার সে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছিল। কিন্তু চরম বিপদের মুহূর্ত দেখা দিল ঠিক তখনই যখন সে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে টেনেও সে দরজা খুলতে পারল না।

কেবিনের ভিতরে পানির চাপ এখন এতই যে, প্রচণ্ড শক্তিধর লোকের পক্ষেও দরজা এতটুকু নড়ানো সম্ভব নয়। লীনার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া আবার তার এক হাতে রয়েছে খোকন। দরজাটা পুরানো। হয়ত তেমন মজবুত নয়। কিন্তু সেটা ভাঙা অন্তত তার পক্ষে সম্ভব নয়। এক হাত দিয়ে তো নয়ই। অনিবার্য মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েছে সে আর খোকন। ফাঁদে পড়ে গেছে ওরা।

নিষ্ঠুর চেষ্টায় নিজেকে শান্ত রাখল লীনা। জানালার পর্দা সরিয়ে দিল। না, একেবারেই ছোট জানালা। কাঁচ ভেঙে ফেললেও ওর ভিতর দিয়ে সে বেরোতে পারবে না। ছেলেটাকে ফেলে দিলে পানিতে পড়ে যাবে।

ক্রুজারটা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে। কোমর পর্যন্ত পানি উঠেছে। নিজেকে বা খোকনকে রক্ষা করার ক্ষীণতম সম্ভাবনাটুকুও নেই। মৃত্যু ধীরে ধীরে এগিয়ে

আসছে শব্দহীন পদক্ষেপে। আতঙ্কে বক্ষস্পন্দন বন্ধ হয়ে আসছে লীনার। তবু সে শান্ত-সমাহিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল, 'সাহায্য কি আসবে না?'

জানালার পর্দাটা তুলে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল অসহায় দৃষ্টিতে।

ছয়

খোকনকে আনতে চলেছে কুয়াশা। দ্রুতবেগে তার মার্সিডিস ছুটে চলেছে রাজধানীর নির্জন আলো-আঁধারি পথ দিয়ে। যেতে হবে তার বাড়ির পাশ দিয়েই। থামল কুয়াশা তার বাড়ির সামনে। নিঝুম রাত। গাড়ি থেকে নেমে গেটের কাছে এগিয়ে গেল। গেট খুলল না। অন্ধকারে হাতড়ে গোপন একটা বোতাম টিপল। দূরে, বাড়ির ভিতরে ক্রিং ক্রিং করে ঘন্টা বেজে উঠল। এক মিনিট পরে নিঃশব্দে গেটের কাছে এসে হাজির হল স্যানন ডি. কস্টা।

'ইয়েস, বস্। হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ? কাম ইন প্লীজ, গেট খুলতে খুলতে সোল্লাসে স্বাগত জানাল ডি. কস্টা কুয়াশাকে।

'মান্নান কোথায়?'

'হি ইজ ইল।'

'কলিম?'

'গন হোম, ইয়েসটারডে। কাল ঘর চলা গয়া।'

'শুনুন, আমার হাতে সময় খুব কম। জরুরী একটা কাজে যাচ্ছি। আপনাকে স্কুটারটা নিয়ে আমার পিছনে পিছনে যেতে হবে। তবে অনেকটা দূরে থাকতে হবে। মনে থাকবে?'

'শ্যুওর! এখনি আমি বেরিয়ে পড়ছি।'

'কিন্তু তার আগে আর একটা কাজ করতে হবে। আমি আর ভিতরে ঢুকব না। আপনি শহীদদের বাসায় টেলিফোন করে খোঁজ নিন, লীনা ফিরেছে কিনা। বি কুইক। আমি অপেক্ষা করছি।'

চলে গেল ডি. কস্টা। কুয়াশা একটা সিগারেট ধরাল। ঘড়ি দেখল, রাত সোয়া দুটো। গাড়িতে গিয়ে বসল সে।

মিনিট পাঁচেক পরেই স্কুটারের শব্দ শোনা গেল। ডি. কস্টা আসছে। গেট পেরিয়ে বাইরে এসে কুয়াশার মার্সিডিসের পাশে স্কুটারটা দাঁড় করিয়ে বলল, 'মিস খান বাসায় ফেরেননি রাতে। টঙ্গীতে কোন এক বন্ধুর বাসায় নাকি গিয়েছেন সকালে। আপনিও নাকি গিয়েছিলেন,' গফুর বলল।

কুয়াশা কিছু বলল না। লীনার জন্যে শঙ্কিত হল। কি হল মেয়েটার, কে জানে।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, 'আমরা যাচ্ছি ডেমরার দিকে। ডেমরা নিশ্চয়ই

চেনেন আপনি?'

'চিনি, বস্। খুব ভাল করেই চিনি।'

'ব্রিজ থেকে একটু দূরে, দক্ষিণ দিকে আছে একটা জঙ্গল। তার ভিতর দিয়ে আছে একটা কাঁচা রাস্তা। ঐ রাস্তার শেষপ্রান্তে আছে একটা বড় বিল। সেই বিলের তীরেই যাচ্ছি আমরা। আমি যাব আগে। আপনি অনেকটা পিছনে পিছনে আসবেন।'

বিশ মিনিট পরে কুয়াশার মার্সিডিস জলাভূমির তীরে গিয়ে পৌছুল। গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করে নেমে পড়ল সে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে কেবিন ক্রুজারটা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু কুয়াশা কেবিনে যাবার জন্যে কোন ডিঙি খুঁজে পেল না। কয়েক মুহূর্ত নীরবে চারদিক জরীপ করল। জীর্ণ বাড়িটার দিকে একবার চোখ বুলাল। এখন ক্রুজারটাতে যাওয়া যায় কি করে, ভাবতে লাগল কুয়াশা। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, ক্রুজারটার পাশেই একটা ডিঙি রয়েছে।

একটু চিন্তিত হল কুয়াশা। ডিঙিটা তো তীরে থাকবার কথা। ওখানে থাকবার অর্থ হল, ক্রুজারে কেউ ওটাকে নিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ খোকন ছাড়াও ক্রুজারে অন্য লোক আছে। আর সে মিত্রপক্ষের লোক নয় নিশ্চয়ই। তাহলে ঐ ক্রুজারে তার সাথে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্যে তাকে একাই আহ্বান জানানো হয়েছে। বেশ, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে সে। সাঁতরেই যাবে কুয়াশা ক্রুজারে।

পানিতে নামবার আগে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার মনে হল, ক্রুজারটাতে কিছু একটা গোলমাল আছে। ওটা কাত হচ্ছে না ক্রমশ? হ্যাঁ, তাই তো, কাত হয়ে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামছে ওটা। সর্বনাশ, ওতে যে খোকন আছে? হয়ত খোকনের মত শক্রও বন্দী হয়ে আছে সেখানে।

পানিতে নেমে পড়ল কুয়াশা। দ্রুত পানি কেটে এগিয়ে চলল সে নিঃশব্দে। ক্রুজারটার দিক থেকে অস্পষ্ট এলোমেলো একটা থপথপ শব্দ আসছে বলে মনে হল কুয়াশার।

ক্রুজারটার কাছে পৌছুতেই কুয়াশার কানে এল, 'ভাইয়া!'

লীনার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল সে। দ্রুত ককপিটের উপর উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিল, 'কে, লীনা?'

'আমি আর খোকন দু'জনই আটকে পড়েছি ভিতরে। বেরোতে পারছিনে। কোমর পর্যন্ত পানি উঠেছে। দরজা বন্ধ হয়ে গেছে পানির চাপে। খুলতে পারছিনে কিছুতেই।'

'খোকন কেমন আছে?'

'এখন পর্যন্ত ভালই আছে। এখনও ঘুমোচ্ছে। কি ঘটছে তা জানে না খোকন। দরজার নিচের দিকটা ভাঙবার চেষ্টা করছি, পারছিনে। মজবুত কিছু একটা পেলে হয়ত ভেঙে ফেলা যেত।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কুয়াশা। যাক, দু'জনেই বেঁচে আছে। দু'জনই এখন পর্যন্ত সুস্থ আছে। এই মুহূর্তে ঐটুকুই যথেষ্ট। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজার উপর চাপ দিল সে। সামান্য একটু নড়েও উঠল দরজা। কিন্তু পানির চাপ এমন প্রবল যে, কুয়াশার বলিষ্ঠ দেহের সমস্ত শক্তি-প্রয়োগও ব্যর্থ হল।

সে একটু পিছনে সরে গিয়ে দরজার পাল্লার নিচের দিকে সজোরে লাথি লাগাল। দরজাটা পুরানো। তেমন মজবুত নয়। কিন্তু দরজার নিচের দিকে পানি থাকায় লাথিটা তেমন জোরে লাগল না। আবার লাথি মারল। পুরানো কাঠ ভেঙে তার পা ঢুকে গেল ভিতরে। সজোরে পানি বেরিয়ে এল ভিতর থেকে। ভিতরের পানির চাপটা কমে গেলেও পুনরায় ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলতে পারল না কুয়াশা।

আবার লাথি লাগাল কুয়াশা। লীনা যাতে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে তেমন একটা ফোকর করতে পারলেই হল। ফাঁকটা একটু বড় হতেই লীনা বলল, 'ওতেই হবে। আগে খোকনকে নিন।'

লীনার কণ্ঠস্বর একটু একটু কাঁপছিল।

কুয়াশা ভাঙা দোরের মধ্যে দিয়ে লীনার কাছ থেকে তোয়ালেতে জড়ানো খোকনকে হাত পেতে নিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই নেমে এল চরম বিপদ। ক্রুজারটা কাত হয়ে তখনই ডুবে গেল। একদম কাত হয়ে পড়ল ক্রুজারটা। লীনা তখনও ভিতরে বন্দী। খোকনকে কোলে নিয়ে কুয়াশা কোনক্রমে ভারসাম্য রক্ষা করল।

সর্বনাশ! লীনা ভিতরে রয়েছে। এ মুহূর্তেই তাকে বাঁচাতে হবে। কয়েক মিনিট দেরি হলেই নিশ্চিত সলিলসমাধি রচিত হবে তার। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? মারাত্মক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেল কুয়াশা।

কাকে বাঁচাবে সে?

লীনাকে?

খোকনকে?

দু'জনকে বাঁচানো সম্ভব নয়। ডুব দিয়ে সে লীনাকে উদ্ধার করতে পারবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু খোকনকে কোলে নিয়ে তা সম্ভব নয়। খোকনকে যদি ত্যাগ করে তাহলে ডুবে সে মারা যাবে নিশ্চিত। আর যদি সে খোকনকে বাঁচায় তাহলে লীনার মৃত্যু অনিবার্য।

কাকে বাঁচাবে? চরম দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল সে। অথচ এই মুহূর্তেই তাকে এই ভয়ঙ্কর সমস্যার সমাধান করতে হবে। এতটুকু দেরি করা চলবে না।

'এই যে বস্, খুদে শয়টানটাকে আমার হাতে দিন' ঠিক কনুইয়ের কাছে পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

শ্যানন ডি. কস্টার হাতে খোকনকে তুলে দিয়েই ডুব দিল কুয়াশা। বাক্যালাপের সময় নেই, সুযোগ নেই। তাকে এখুনি তৎপর হতে হবে। নিমজ্জিত

ক্রুজারের ককপিটে পৌঁছুতে দেরি হল না কুয়াশার। ভিতর থেকে তখন লীনা ভাঙা দরজার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু শাড়িতে আটকে যাওয়ায় তার চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছিল। কুয়াশা বুঝল, লীনা তার মাথা ও ঘাড়টা বের করতে পেরেছে। বাহুমূলে চেপে ধরে কুয়াশা প্রচণ্ড জোরে টান দিল। কাপড় ছিঁড়ে গেল লীনার। কিন্তু সে বেরিয়ে আসতে পারল। পানির উপরে ভেসে উঠল দু'জনই।

বুক ভরে শ্বাস টানল লীনা। কিন্তু অনেকক্ষণ তার বাক্‌স্ফূর্তি ঘটল না। কুয়াশা তাকে একহাত দিয়ে মজবুত করে ধরে রেখে সাঁতার কাটতে লাগল।

একটু পরে লীনা বলল, 'আমি প্রায় মারা যাচ্ছিলাম! অতক্ষণ কি কষ্ট করে যে শ্বাস বন্ধ করে রেখেছিলাম! উঃ!'

'নাকে পানি ঢোকেনি তো?'

'না। কিন্তু খোকন? খোকন কোথায়?' আর্তনাদ করে উঠল লীনা।

হাসল কুয়াশা, 'ভয় নেই। ভালই আছে। ডি. কস্টার কাছে আছে সে। আমাদেরকে সাঁতার কেটেই তীরে যেতে হবে। ডিঙিটা ক্রুজারের সাথেই তলিয়ে গেছে।' সাঁতার কাটতে কাটতে সে ডি. কস্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করছিল। সে যে এত দ্রুত বিপদটা আন্দাজ করতে পেরেছিল তার জন্যে মনে মনে তাকে ধন্যবাদ জানাল কুয়াশা।

গাড়ির মধ্যে বসে ছিল ডি. কস্টা। তার কোলে খোকন। কুয়াশা আর লীনা এগোতেই ডি. কস্টা মুখ খুলল। 'ভালই আছে বস্, খুদে শয়টানটা। টোয়ালেটা একটু ভিজে গিয়েছিল মাত্র। গায়ে পানি লাগেনি। স্টিল স্লীপিং বস্, দিস নটি বয়। বাট ভেরি সুইট।'

'কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব!' লীনা মুখ খুলল।

'মি থ্যাঙ্কস্? হোয়াই, ম্যা'ম? দিসিস্ মাই ডিউটি। নো থ্যাঙ্কস্।'

'নিশ্চয়ই ধন্যবাদ পাওনা আছে আপনার, মি. কস্টা। আপনি যথাসময়ে না পৌঁছুলে লীনা অথবা খোকন দু'জনের একজনকে মরতেই হত! কিন্তু আপনি ক্রুজারে গেলেন কি মনে করে?'

'আমার মনে হল, ক্রুজারটা ডুবে যাচ্ছে—সিংকিং। ভাবলাম, ডেখতে হচ্ছে, বস্ মে বি ইন ডেঞ্জার, অর সাম ওয়ান এল্‌স্। অ্যাণ্ড আই সোয়্যাম। মিস খান, আর ইউ অলরাইট?'

'আমি ভাল আছি, ভাল থাকবও। ঠাণ্ডাও লাগবে না। কিন্তু আমি ভাবছি অন্যকথা,' শেষের কথাটা বল্লল কুয়াশার উদ্দেশ্যে।

'কি ভাবছ?'

'ওরা খোকনকে খুন করতে চেয়েছিল। সুপরিকল্পিত ভাবে খুন করতে যাচ্ছিল ওরা খোকনকে,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল লীনা।

'সে কি!' বিস্ময় প্রকাশ করল ডি. কস্টা। 'এই নিষ্পাপ শিশুটাকে! দিস হার্মলেস কিড!'

'হ্যাঁ, আমি একটা ছায়ামূর্তিকে ক্রুজারে যেতে দেখলাম। কিছুক্ষণ পরে সে সুটকেসটা নিয়ে ফিরে এল। তার অনেকক্ষণ পরে ক্রুজারটা ধীরে ধীরে ডুবতে লাগল। সেই শয়তানটা নিশ্চয়ই স্টপকক খুলে দিয়ে গেছে অথবা অন্য একটা কিছু করেছে।'

'তোমাকে অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করব আমি। কিন্তু এখন নয়। তুমি কিভাবে এসেছিলে এখানে, জানি না। কিন্তু তোমার উপস্থিতির জন্যেই খোকন বেঁচেছে। তুমিই ওর জীবন বাঁচিয়েছ,' গম্ভীর গলায় বলল কুয়াশা।

'তা ঠিক নয়, ভাইয়া। আপনি বাঁচিয়েছেন ওকে। মি. কস্টা বাঁচিয়েছে ওকে। আপনারা আমাকেও বাঁচিয়েছেন। এ নিয়ে আলোচনা করা বৃথা। সেই ছায়ামূর্তিটা। সে এসেছিল নতুন একটা মরিস মাইনরে। অন টেস্ট লেখা। এখনও রেজিস্ট্রেশন নাম্বার লাগানো হয়নি।'

'তাতে ক্ষতি নেই। সেই ছায়ামূর্তিটা কে, তা অন্তত জানি বলে মনে হচ্ছে।'

'কে সে?'

'এখনও বলবার সময় আসেনি। আমার ধারণা নির্ভুল কি না তা আগামীকালই জানতে পারব।'

'কিন্তু লোকটার উদ্দেশ্য কি বুঝতে পারছিনে। খোকনের মৃত্যুই তার কাম্য, না টাকা? নাকি দুটোই?'

'উদ্দেশ্যটা পুরোপুরি বুঝতে পারছিনে। তবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, খোকনকে হত্যা করা-ই, আর এই হত্যাকাণ্ডের দায় আমার ঘাড়ে চাপানোই ছিল ওদের উদ্দেশ্য। টাকাটা ওদের উপরি পাওনা।'

ডি. কস্টা বলল, 'আমাদের সকলেরই কাপড়-চোপড় ভেজা। এ অবস্থায় এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না।'

'ভেজা কাপড়ের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার চিন্তা করার আছে, মি. ডি. কস্টা,' হাসল কুয়াশা। 'খোকনকে নিয়ে এই মুহূর্তে কি করা যায় তাই স্থির করতে হবে।'

'কেন? এখুনি তো ওকে ওর মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। চলুন, আর দেরি নয়। বেচারি দুশ্চিন্তায় হয়ত উন্মাদই হয়ে যাবে।'

কুয়াশা একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে লীনাকে প্রশ্ন করল, 'কিন্তু তুমি এখানটায় কি করে এলে? কি করে জানলে যে, এখানেই খোকনকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে?'

'আপনি রাগবেন না, কথা দিচ্ছেন?'

'নিশ্চয়ই,।'

'আপনার গাড়ির বুটে···।'

'সে কি?'

ঘটনাটা খুলে বলল লীনা।

সবটা শুনে কুয়াশা বলল, 'তোমার উপর রাগ করা উচিত। কিন্তু তবু তোমার এই হঠকারিতার জন্যেই খোকনকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। তুমি বাঁচিয়েছ আমার ইজ্জত। সর্বনাশটা হয়ে গেলে মিসেস আহমদের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারতাম?'

লীনা বলল, 'আমার ঠাণ্ডা লাগছে। এবারে চলুন, ভাইয়া।'

'টঙ্গীতে এখন যাচ্ছিনে, লীনা।'

'সে কি! কেন?' বিস্ময় প্রকাশ করল লীনা।

'এই নোংরা কাজটার অন্তরালে আরও ভয়ঙ্কর একটা উদ্দেশ্য আছে। সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে। আর সেটা আমাকে জানতেই হবে। আমরা শুধু এতটুকুই জেনেছি যে, খোকনকে খুন করার একটা হীন চক্রান্ত হয়েছিল। কেন? কারণটা কি? এই মৃত্যু থেকে কে কে লাভবান হচ্ছে? কিভাবেই বা হচ্ছে? একটা উদ্দেশ্য ছিল খুনের হোক, চুরির হোক, ডাকাতির হোক অথবা এর তিনটারই দায় আমার উপর চাপানো। কিন্তু কেন? আসল মতলবটা কি?' কুয়াশা ধীরে ধীরে বলল।

'আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে।'

'বুঝতে ঠিক আমিও পারছিনে। আর পারছিনে বলেই আমাকে একটা কৌশল খাটাতে হবে।'

'কি রকম?'

আমরা যদি সবাইকে বলি যে, খোকন সত্যিই মারা গেছে, তাহলে যারা ওকে খুন করতে চেয়েছিল তাদের চক্রান্তটা ধীরে ধীরে রূপ নিতে থাকবে। ওদের বুঝতে দিতে হবে যে, আমি যথার্থই ক্রুজারে দেরি করে পৌঁছেছিলাম। তার আগেই খোকন মারা গেছে।'

'না না, এমনটা আমরা কিছুতেই করতে পারিনে,' প্রতিবাদ জানাল লীনা। 'শায়লা পাগল হয়ে যাবে।'

'তুমি কি আমাকে অতটাই নিষ্ঠুর ঠাওরাচ্ছ? শায়লাকে সত্য কথাটা গোপনে জানিয়ে দেব এবং চুপ করে থাকতে বলব। শায়লাকে বুঝিয়ে বলব। সে নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্বাস করবে।'

'তাহলে অবশ্য ঠিক আছে, যদিও এতে শায়লার কষ্ট হবে।' পরিষ্কার বোঝা গেল, কুয়াশার পরিকল্পনা লীনার পছন্দ নয়।

'উপায় নেই। তার সন্তানের জীবন রক্ষার জন্যেই এটা প্রয়োজন। খোকনের

উপর দ্বিতীয়বার হামলা হোক, এটা নিশ্চয়ই তার কাম্য নয়। তাছাড়া ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তুমি আর মি. কস্টা মার্সিডিসটা নিয়ে চলে যাও সোজা তোমাদের বাসায়। আমি ফোন না করা পর্যন্ত সেখানেই থাকবে। আমি স্কুটারটা নিয়ে যাব।'

মার্সিডিসের পিছনের আলো দুটো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে স্কুটারে চাপল কুয়াশা।

সাত

ড্রইংরুমের ঘড়িতে তিনটে বাজল। সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছে শায়লা বেগম। রোজিনা ফিরে এসেছে। লীনা বাসায় ফেরেনি, এসেই রোজিনা খবর দিয়েছে। মহীউদ্দিন সাহেবও এসেছেন। জরুরী কাজে তিনি নারায়ণগঞ্জে গিয়েছিলেন। ধর্মঘটের নোটিস দিয়েছে শ্রমিকরা। মালিক সমিতির জরুরী মীটিং ছিল। না গিয়ে উপায় ছিল না।

তবু শায়লা বিরক্ত হচ্ছিল। মীটিং তো ন'টায় শেষ হয়েছে। এদিকের কাজটাও তো কম জরুরী নয়। একটা হিউম্যান কনসিডারেশনও থাকা উচিত ছিল ভদ্রলোকের। কখন তাঁকে দরকার হয় ঠিক নেই। বৈষয়িক কাজে তাকে ছাড়া যে শায়লা বেগমের চলে না, তা-ও সে জানে। তাহলে লোকটা গেল কোথায়? কোথায় ছিলো রাত দুটো পর্যন্ত?

একগাদা কাগজপত্র নিয়ে এসেছেন মহীউদ্দিন। মিল সম্পর্কীয় জরুরী নথিপত্র সেগুলো। এসব কাগজপত্র শায়লার সেফেই থাকে।

কাগজের প্যাকেটটা নামাতেই রোজিনা প্রশ্ন করল, 'বড় দেরি করে এলেন যে? এদিকের খবর শুনেছেন?'

'খোকা সাহেব নিশ্চয় ফিরেছেন?'

'না, ফেরেননি। কুয়াশা তাঁকে আনতে গেছে। এই এসে পড়বে বলে। এদিকে লীনাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'সে আবার কি! বাসায় ফিরে যায়নি তো?'

'না, আমি এক্ষুণি ফিরে এলাম ওর বাসা থেকে।'

'তাহলে তো বিপদের কথা! বয়স্কা মেয়ে!' মহীউদ্দিন সাহেব চিন্তিত হলেন।

'আমার তো মনে হয়, খোকনকে যারা চুরি করেছিল লীনাও তাদেরই কবলে পড়েছে,' রোজিনা আশঙ্কা প্রকাশ করল।

মহীউদ্দিন সাহেব চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি শায়লাকে বললেন, 'মিসেস আহমদ, এই প্যাকেটটায় অনেক জরুরী কাগজপত্র আছে। সেফে রাখতে হবে।'

শায়লার উপরে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। সে রোজিনাকে বলল, 'তুমি যাও না, ভাই একটু, প্যাকেটটা আমার শোবার ঘরের সেফে রেখে এস। গদির নিচে চাবির গোছা আছে। মহীউদ্দিন সাহেব, আপনিও না হয় ওর সঙ্গে যান।'

মহীউদ্দিন সাহেব বললেন, 'চলুন, মিস হক,' প্যাকেটটা হাতে নিলেন তিনি।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে শায়লার রুমে ঢুকল দুজন। রোজিনা বিছানার দিকে এগিয়ে গেল চাবি বের করার জন্যে। কিন্তু কিছুক্ষণ খুঁজে বলল, 'না তো, চাবি তো দেখছি না!'

'কি হল?' মহীউদ্দিন সাহেব জানতে চাইলেন। 'ভাল করে খুঁজে দেখেছেন?'

'যেখানে চাবি থাকবার কথা সেখানটাতে খুঁজে দেখেছি। পাচ্ছিনে। আপনিও একটু দেখুন না?'

ব্যাগটা রেখে মহীউদ্দিন সাহেবও চাবি খুঁজতে শুরু করলেন। শুধু বিছানা নয়। সারা ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজলেন। না কোথাও নেই।

'গেল কোথায় চাবিটা?' রোজিনা বলল, 'সাধারণত গদির নিচেই তো থাকে। এই সামান্য ব্যাপার শায়লাকে বলতে এখন ভাল লাগছে না। অন্য কোন ব্যবস্থা করা যায় না কাগজপত্র রাখার?'

'কাগজগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য নিরাপদ রাখাটাই বড় কথা। ওয়ার্ডরোবটাতে আপাতত রাখলেও চলবে।'

'কিন্তু ওয়ার্ডরোবের চাবিও তো পাওয়া যাচ্ছে না,' রোজিনা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল। 'অন্য রুমে একটা পুরানো কাবার্ড আছে। সেটা খোলা। পুরানো জিনিসপত্র রাখা হয়। সেখানে রাখলেও চলবে। কেউ সন্দেহ করবে না যে, সেখানে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র আছে। মাত্র কয়েক ঘন্টার তো ব্যাপার। খোকন ফিরে এলেই এ বাড়ির যন্ত্রণা দূর হবে। তখন সবাই মিলে চাবি খুঁজে বের করা যাবে। কি বলেন? তাছাড়া, ঐ কাবার্ডটা সাধারণত কেউ খোলে না।'

মহীউদ্দিন সাহেব আশার আলো দেখতে পেয়ে সোৎসাহে বললেন, 'চলুন তাহলে।'

যে রুমটা কুয়াশার জন্যে নির্ধারিত হয়েছিল সেই রুমে গিয়ে ঢুকল দু'জন। বোতাম টিপে আলো জ্বালল রোজিনা। মহীউদ্দিন সাহেব কাবার্ডটা খুলে কাগজের প্যাকেটটা রাখলেন ভিতরে।

রোজিনা বলল, 'এখন কাবার্ডের মধ্যে ইঁদুর না থাকলেই হয়,' তার দৃষ্টি পড়েছিল নিচের তাকের সুটকেসের উপর। 'একটা কাজ করলে হয় না, মহীউদ্দিন সাহেব?'

'আজ্ঞা করুন?'

'একটা সুটকেসের মধ্যে রেখে দিন না কাগজগুলো? নিরাপদে থাকবে।'

পরামর্শটা মনঃপূত হল মহীউদ্দিন সাহেবের। তিনি বললেন, 'তাহলে একটা

সুটকেস এনে দিন না হয়?'

'আরে, সুটকেস তো আপনার নাকের ডগাতেই আছে! দেখুন না, কতগুলো। ওগুলো সব খালি। খালি সুটকেসই রাখা হয় এখানে।'

'কিন্তু সবগুলো পুরানো। ভাঙা।'

'ভালও আছে, দেখুন না? সরুন, আমি বের করছি।'

সরলেন না তিনি। পরপর দুটো সুটকেস বের করলেন মহীউদ্দিন সাহেব। দুটোই ভাঙা। তৃতীয়টা বেশ ভারি। তবু সেটা টেনে বের করে আনলেন। আত্মগতভাবে বললেন, 'কি ব্যাপার, এটা এত ভারি কেন? কি আছে এর মধ্যে?'

'খোলা নাকি? না বন্ধ?' রোজিনা জিজ্ঞেস করল।

'দেখি। দেখতেই হবে, সুটকেসটা,' আমতা আমতা করতে লাগলেন মহীউদ্দিন সাহেব।

'কি হল? অমন করছেন কেন?'

'মনে হচ্ছে...আচ্ছা, আমি দেখছি।'

তালা লাগানো ছিল না। ঢাকনাটা খুলেই সাপ দেখার মত চমকে উঠলেন তিনি। চমকে উঠল রোজিনাও। সমস্তটা সুটকেস ভর্তি দশ টাকার নোট।

বিস্মিত রোজিনা বলল, 'তাই তো, এ দেখছি অনেক টাকা! সুটকেসটা নিশ্চয়ই কুয়াশার।'

তীব্র কণ্ঠে মহীউদ্দিন বললেন, 'তার মানে?'

হকচকিয়ে গেল রোজিনা। সে বলল, 'হ্যাঁ, মানে এই রুমেই কুয়াশাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে কিনা, তাই বলছি। উনি তো একটা সুটকেস নিয়ে এসেছেন। হয়ত এইটাই।'

'না, এটা সে সুটকেস নয়,' দাঁতে দাঁত চাপলেন মহীউদ্দিন সাহেব। 'এ টাকা আমি আজকে ব্যাংক থেকে তুলেছি। এই সুটকেসে করেই এনেছি। এই টাকাই দেবার কথা ছিল ছেলেধরা দলটিকে খোকনের মুক্তিপণ হিসেবে। এ টাকা এখানে এল কি করে?'

রোজিনা পরম বিস্ময়ে বলল, 'বলছেন কি আপনি! আর ইউ ইন ইওর সেন্সেস্? আপনার নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে।'

'ভুল! মনে রাখবেন, আমি একটা অত্যন্ত দায়িত্বশীল পদে কাজ করি। এতটা ভুল আমার হয় না।'

'তাহলে এটা এখানে এল কি করে?' রোজিনা অবিশ্বাসের সুরে বলল।

'আমারও সেই প্রশ্ন,' বিদ্রূপ করলেন মহীউদ্দিন সাহেব। 'আমারও সেইটাই প্রশ্ন। নিশ্চয়ই আমি এটা এনে এখানটায় রাখিনি, আপনিও রাখেননি, মিসেস আহমদও না। তাহলে কে?'

'আমার, আমার মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে,' রোজিনা বলল।

'কিন্তু গুলিয়ে গেলে চলবে না। আরও দেখতে হবে, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। ভাল করে দেখতে হবে, কি কি সম্পদ আছে এই রুমে। তখনি বারবার করে নিষেধ করেছিলাম, ঐ ক্রিমিনালটার সাথে যোগাযোগ করতে,' সোৎসাহে তিনি ওয়ার্ডরোবের সমস্ত সুটকেস বের করলেন। প্রত্যেকটাই খুললেন, কোনটাতে কিছু পাওয়া গেল না।

হতবাক হয়ে শূন্য দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ছিল রোজিনা কাবার্ডের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার চোখে পড়ল, নিচের তাকের কোণে কি একটা চকচক করছে। কম্পিত পদক্ষেপে সে এগিয়ে গিয়ে চকচকে জিনিসটায় হাত দিল। একটা চাবির গোছা। সেটা বের করে উজ্জ্বল আলোয় দেখল রোজিনা। মহীউদ্দিন সাহেবও দেখলেন। শায়লার চাবির গোছা, যেটা তারা খুঁজছিল। রোজিনার কম্পিত হাত থেকে পড়ে গেল গোছাটা।

অর্থহীন, ব্যথিত দৃষ্টিতে মূক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রোজিনা।

নিচে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। মহীউদ্দিন সাহেব দ্রুত হাতে সুটকেসগুলো তাক-এ তুলে রেখে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চাবির গোছাটা পকেটে ফেলল। রোজিনা চেতনাহীনের মত তখনও দাঁড়িয়ে রইল।

মহীউদ্দিন সাহেব বললেন, 'প্লীজ, মিস হক, এই মুহূর্তে অমন আত্মবিস্মৃত হবেন না। এখন নার্ভটাকে শক্ত করুন। পরে আপনার সাথে বিস্তারিত আলাপ করা যাবে। চলুন, কুয়াশা নিশ্চয়ই খোকাকে নিয়ে এসেছে। প্লীজ, প্লীজ একটু শক্ত হোন।'

রোজিনা ফিসফিস করে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না! বুঝতে পারছি না!'

'প্লীজ, ডোন্ট বি অ্যান অ্যাস। আসুন নিচে। কুয়াশা এসে পড়েছে নিশ্চয়ই।' রোজিনার ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিলেন মহীউদ্দিন সাহেব। 'এগুলো আগে ঠিক মত গুছিয়ে রাখি। আপনিও একটু হেল্প করুন। যেমন ছিল ঠিক তেমনি রাখতে হবে সুটকেসগুলো।'

রোজিনা যেন সংবিৎ ফিরে পেল এতক্ষণে। সে-ও মহীউদ্দিন সাহেবের সাথে সাথে কাবার্ডে সুটকেসগুলো তুলতে লাগল।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে মহীউদ্দিন সাহেব বললেন, 'খবরদার! আমাদের এই আবিষ্কারের কথা এই মুহূর্তে প্রকাশ করা চলবে না।'

'কিন্তু...,' আপত্তি জানাল রোজিনা।

'কোন কিন্তু নয়। আমি জানি, আমার বিদ্যাবুদ্ধির উপর আপনার আস্থা কম। কিন্তু একবার অন্তত নির্ভর করে দেখুন আমার উপর। ঠকবেন না,' একটু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন মহীউদ্দিন সাহেব রোজিনার খুব কাছে এসে।

মাথা নেড়ে সায় দিল রোজিনা।

আট

নীলাভ নিলয়ে যখন কুয়াশা পৌঁছুল, তখন চারটে প্রায় বাজে-বাজে। ভেজা কাপড় গায়ে শেষ রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় স্কুটার চালিয়ে কুয়াশা যখন এসে পৌঁছুল তখন শীতে সে একটু একটু কাঁপছে। স্কুটার রেখে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই শায়লা ছুটে গেল, 'খোকন? আমার খোকনকে আনেননি?'

'মিস হক ও মহীউদ্দিন সাহেব কোথায়?' শায়লার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল কুয়াশা।

'খোকন?'

'আমার প্রশ্নের জবাব দিন,' কঠিন শোনাল কুয়াশার কণ্ঠ।

আশঙ্কায়, উত্তেজনায়, যন্ত্রণায় অর্ধোন্মাদ শায়লা বলল, 'আগে বলুন, খোকন কোথায়?'

'নিচে কি আপনি একাই আছেন?'

একটু থতমত খেয়ে শায়লা বলল, 'হ্যাঁ, একাই আছি। মহীউদ্দিন সাহেব আর রোজিনা উপরে গেছে। কিন্তু আমার খোকন কোথায়? বলুন, চুপ করে রইলেন যে?' ভীত কণ্ঠে বলল শায়লা। 'খোকনকে কি আপনি...?' থরথর করে কাঁপতে লাগল সে।

'চিৎকার করবেন না। যা বলি চুপ করে শুনুন। আপনাকে একাকী পাওয়াই আমার দরকার ছিল। আমাকে বাধা দেবেন না। কোন প্রশ্ন করবেন না। যা বলব, শুনবেন। যা করতে বলব, করবেন। আপনার খোকন বেঁচে আছে। সুস্থ আছে। লীনার কাছে আছে। ভয় নেই। কোন চিন্তা নেই। আমার উপর বিশ্বাস রাখুন।'

'সত্যি, সত্যি বলছেন?' শায়লার কণ্ঠে অবিশ্বাস আর আশঙ্কা।

'সত্যি বলছি।'

'তাহলে তাকে আনলেন না কেন?'

'একটু শান্ত হোন। প্লীজ, শান্ত হোন। যা বলি, মন দিয়ে শুনুন। মাথা ঠাণ্ডা করে শুনুন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা কথা আপনাকে বলতে হবে।'

শায়লার কাঁপুনি ধীরে ধীরে কমে এল। উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হল।

কুয়াশা বলল, 'ছেলেধরাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে।'

'তার মানে? ওরা তো টাকা পেয়েছেই, কথাও রেখেছে। খোকনকেও ফিরিয়ে দিয়েছে। আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে।'

'আমি বুঝিয়ে বললেই বুঝতে পারবেন।'

কুয়াশা ধীরে ধীরে অতি সংক্ষেপে খোকনকে উদ্ধার সম্পর্কিত ঘটনা খুলে বলল। লীনা কিভাবে ক্রুজারে পৌঁছেছিল, কিভাবে সে খোকনকে বাঁচিয়েছে, সবই

সে শায়লার গোচরে আনল। শেষটায় মন্তব্য করল, কেউ একজন আপনার ছেলেকে খুন করতে চেয়েছিল। আমি জানি সে কে—কিন্তু আমার হাতে কোন প্রমাণ নেই। তাই তার নাম উচ্চারণ করাও সঙ্গত নয়। আমি তার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করতে চাই। আর তার জন্যে দরকার হল সেই লোকটাকে বুঝতে দেয়া যে, তার পরিকল্পনা সফল হয়েছে। আসলে এটা সামান্য ছেলেচুরির ব্যাপার নয়। পাঁচলাখ টাকার ব্যাপার নয়। উদ্দেশ্য আরও জঘন্য কিছু একটা। এই জন্যেই আমি গোপনে একথাগুলো বলতে চেয়েছিলাম। আর এই জন্যেই আমি খোকনকে নিয়ে আসিনি।'

'কিন্তু কেন, কেন খোকনকে নিয়ে আসেননি আপনি? আমি আপনার কথা বুঝতে পারছিনে,' অবুঝ শায়লা বলল।

'কারণ সেই শয়তানটাকে ধরবার একমাত্র পথ হল তাকে বুঝতে দেওয়া যে, তার পরিকল্পনা অনুযায়ী খোকন মারা গেছে। আপনাকে আপনার ভূমিকায় পাকা অভিনেত্রীর মত অভিনয় করতে হবে। শোকে, বেদনায় আপনি মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন, বোধশক্তিহীন হয়ে গেছেন এমন একটা ভাব দেখাতে হবে।'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে শায়লা তাকাল কুয়াশার দিকে।

'আপনি সত্যি বলছেন সব কথা?'

কুয়াশা দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'আমার উপরে বিশ্বাস রাখুন, মিসেস আহমদ। আপনার খোকন বেঁচে আছে। সে সুস্থ আছে। ক্রুজার থেকে নিয়ে আসবার সময় শুধু ওর গায়ের তোয়ালেটা ভিজে গিয়েছিল। অন্য একটা কাপড় দিয়ে ওর গা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ওর ঘুম ভাঙেনি এখন পর্যন্ত। এখন সে লীনার বাসাতে আছে। তবে সকালেই ওকে অন্য এক জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাব। তার ঠিকানাও দিয়ে যাব। ফোন নম্বর দিয়ে যাব। এমন কি আপনি ইচ্ছে করলে এখুনি লীনাদের বাসায় ফোন করে জানতে পারবেন। কিন্তু সেটা ক্ষতিকর হতে পারে। আপনাকে এখন এমন একটা ভাব দেখাতে হবে যে, শোকে আপনি পাথর হয়ে গেছেন। কাঁদতে পর্যন্ত পারছেন না, কান্না আসছে না। আর আসল ব্যাপারটা কাউকেই বলা যাবে না। আপনাদের ম্যানেজারকে নয়, রোজিনাকেও নয়। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর, সন্দেহ নেই। কালকেই পুলিস আসবে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করবে কিন্তু কিছুই বলা চলবে না। বললে, আসল অপরাধী হাতের বাইরে চলে যাবে।'

কুয়াশার বাচন-ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু ছিল যাতে তার উপর শায়লার বিশ্বাস দৃঢ়তর হল। কুয়াশা যে খোকন সম্পর্কে এতটুকু মিথ্যা বলছে না তা অনুভব করতে পারল সে।

'কাজটা কিন্তু খুবই কঠিন হবে। চাকরদেরও বলা যাবে না, আপনি বলছেন। রুস্তম আলীকেও না। সে কিন্তু খুবই বিশ্বাসী। অনেক বছর ধরে সে এই বাড়িতে আছে, বলতে গেলে আমাকে সে সন্তানের মত স্নেহ করে। ওর সাথে কি করে

প্রতারণা করি? মহীউদ্দিন ও রোজিনা না হয় বুঝবে।'

'না না, কাউকে বলতে পারবেন না। রোজিনা বা মহীউদ্দিনকেও নয়।'

'তা কি করে হবে?' মৃদু প্রতিবাদ করল শায়লা।

'আমি যতদূর ওদের দু'জনকে বুঝতে পেরেছি, তাতে কোন কথা চেপে রাখার ধাত ওদের নয়। কোন কথা গোপন রাখার মত মানসিক প্রবণতা ওদের নেই। আর-চাকরদের কানে তুললে তো দুনিয়াসুদ্ধ লোক জেনে ফেলবে। এই ঝুঁকি নেবেন না। তাছাড়া ব্যাপারটা মাত্র দু-তিন দিনের মধ্যেই ফয়সালা করতে পারব আমি।'

'কিন্তু কি করেই বা মিথ্যে কথা বলব? বিশেষ করে মহীউদ্দিন আর রোজিনার কাছে? ওরাও তো খোকনকে ভালবাসে। খোকন মারা গেছে শুনলে কি সাংঘাতিক আঘাত পাবে ওরা, বলুন তো? না না, আমি ওসব পারব না। এ অসম্ভব। নিতান্তই অসঙ্গত। অন্যায়। খোকন যদি বেঁচে থাকে, যদি সত্যি সে সুস্থ থাকে তাহলে ওকে এনে দিন আমার কাছে।'

দাঁতে দাঁত চাপল কুয়াশা। শায়লা বেগমকে পরিস্থিতির ভয়াবহতা বোঝানো যাচ্ছে না। তার সহযোগিতা পাওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছে। এখন তাকে তার তুরুপের তাস ছাড়তে হবে।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তবে তাই হোক, আপনি যদি আমার পরিকল্পনায় সহযোগিতা করতে না চান, তাহলে আমার আর বলবার নেই কিছু। আমি এক্ষুণি গিয়ে তাকে নিয়ে আসছি।'

'তাই করুন। দয়া করে তাই করুন,' মিনতি জানাল শায়লা।

'কিন্তু মনে রাখবেন মিসেস আহমদ,' তীব্র কণ্ঠে কুয়াশা বলল। 'মাত্র দু'ঘন্টা আগে আপনার ছেলেকে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে, বেঁচে আছে আপনার খোকন। এই মুহূর্তে সে নিরাপদ আছে। আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবার পর তার কোন দায়িত্ব আমি নেব না। আর তার উপর যে আবারও হামলা হবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।'

ঠিক জায়গাতেই আঘাত লাগল। কেঁপে উঠল শায়লা।

সে বলল, 'কিন্তু কে?...কে সে?'

'ছেলেধরার দল খোকনকে চুরি করেনি। মুক্তিপণের টাকাটা এখানে বড় উদ্দেশ্য ছিল না। খোকনকে খুন করতে চেয়েছিল কেউ একজন। সে আবারও খুনের চেষ্টা করতে পারে। খোকনকে এখানে এখন ফিরিয়ে নিয়ে এলে তার বাসনাই চরিতার্থ হবে। আমি আর এর মধ্যে থাকব না,' প্রস্থানের ভঙ্গি করল কুয়াশা।

'দাঁড়ান। কিন্তু কে খোকনকে খুন করতে চাইবে? কেনই বা চাইবে?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল শায়লা।

'সেটাই তো জানতে চাই। আর তা আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা, তাকে বুঝতে দেওয়া যে, তার আজকের রাতের পরিকল্পনা সফল হয়েছে। খোকন মারা গেছে, জানতে পারলে তার পরিকল্পনার অবশিষ্টটুকু ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু আপনি যখন রাজি নন তখন…।'

'আমি রাজি। রাজি আছি আমি, আপনি যেমন বলবেন তাই আমি করব, নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলল শায়লা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কুয়াশা। সে বলল, 'আপনাকে যেমন অভিনয় করতে বলেছি, তেমনি অভিনয় করতে হবে। এমন ভাব দেখাবেন যেন আপনি শোকে পাথর হয়ে গেছেন। ভাল কথা, খোকনের অবর্তমানে আপনাদের এই বিপুল সম্পত্তির মালিক কে হবে? মিল কি আপনার নামে? খোকনের অবর্তমানে আপনিই কি মিলের মালিক হবেন? অন্য সম্পত্তিই বা কে পাবে?'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কুয়াশার দিকে তাকাল শায়লা।

'আমি, আমি এভাবে কখনও ভাবিনি।'

'এখন ভাবার সময় এসেছে।'

'খোকনের অবর্তমানে আমার স্বামীর চাচাত ভাই, মানে একমাত্র চাচাত ভাই হাসেম হবে মিলের মালিক। মিলে আমার নামে অবশ্য সামান্য শেয়ার আছে। কিন্তু হাসেমই আমার শ্বশুরের তরফের নিকটতম আত্মীয়। খোকনের অবর্তমানে সেই লাভবান হবে সন্দেহ নেই। কতটা হবে তা অবশ্য জানি না। কিন্তু হাসেম এমন ধরনের কাজ করতে পারে বলে আমার মনে হয় না। তাকে আমি জানি। আধ্যাত্মিক সন্ন্যাসী টাইপের লোক সে। অবিবাহিত। আমার স্বামী মিলের কাজে ওকে উৎসাহিত করার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিলেন। রাজি করাতে পারেননি। কিন্তু এসব প্রশ্ন উঠছে কেন? খোকন তো বেঁচেই আছে। ইনশা-আল্লাহ্ সেই তার পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক হবে।'

'তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি যে, খোকন মারা গেছে। হত্যাকারী ব্যাপারটা যেভাবে দেখত আমাদেরকেও সেই ভাবে দেখতে হবে। তা হাসেম সাহেব এখন কোথায়?'

'পশ্চিম পাকিস্তানে, এক ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাসের লেকচারার। কিন্তু ওকে আমি জানি। ওর পক্ষে এ কাজ অসম্ভব।'

'তা হোক। আজকেই তাকে খবর দিন, একাজটা অবশ্য আপনাদের এটর্নীর। তবু দায়ে পড়ে আপনাকেই তাকে খবর দিয়ে আনতে হবে। এখুনি যেন সে চলে আসে। আর আপনাকে বেদনায় বোধ-শক্তিহীন মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে হবে। মনে রাখবেন, আপনার অভিনয়ের উপরই আমার পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করছে।'

কথা বলতে বলতে দু'জন ড্রইংরুমে ঢুকল। ভিতরের বারান্দায় পায়ের শব্দ

শোনা গেল। কুয়াশা ফিসফিস করে বলল, 'এবার আপনি নিজের রূমে যান। যেমন বলেছি খেয়াল রাখবেন। ওদের আমি ফেস্ করব।'

শায়লা দাঁড়াল না। সে ধীর পদক্ষেপে শূন্য দৃষ্টি মেলে ভিতরের বারান্দার দিকে এগোল।

দরজা পেরিয়েই রোজিনা আর মহীউদ্দিন সাহেবের মুখোমুখি হল শায়লা। কিন্তু যেন তাদেরকে দেখতে পায়নি এমনভাবে এগিয়ে গেল শায়লা। তার শূন্য, বোবা দৃষ্টি ওরা দু'জনই দেখতে পেয়েছিল। দু'জনই থমকে দাঁড়াল। কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেল না! শায়লা যেন নিশির ডাকে পাওয়া মানুষের মত পরিবেশ বিস্মৃত হয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল শায়লা। শায়লাকে যতক্ষণ দেখা গেল রোজিনা ও মহীউদ্দিন ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দুজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ধীরে ধীরে ড্রইংরূমে ঢুকল। মারাত্মক আশঙ্কায় ওরা দু'জনই নির্বাক হয়ে গেছে যেন।

মুখ নিচু করে বসে ছিল কুয়াশা। ওদের দেখে মুখ তুলল

রোজিনা প্রশ্ন করল, 'খোকনকে এনেছেন? কোথায় সে?'

মাথা নাড়ল কুয়াশা ধীরে ধীরে। নম্র, বেদনাঘন কণ্ঠে বলল, 'বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল আমার।'

'দেরি! কিসের দেরি?' আতঙ্কভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করল রোজিনা।

'খোকন মারা গেছে,' অনেক দূর থেকে যেন কথা বলল কুয়াশা।

'মারা গেছে,' আর্তনাদ করে উঠল রোজিনা। 'ইয়া আল্লাহ। না না, একথা সত্য নয়। আপনি বলুন, একথা সত্য নয়! মিথ্যা মিথ্যা! খোকন মারা যায়নি,' উন্মাদের মত রোজিনা ছুটে গেল কুয়াশার দিকে। তার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'বলুন, সত্যি করে বলুন! বলুন, বেঁচে আছে খোকন।'

কুয়াশা আলগোছে রোজিনার হাত দুটো নামিয়ে তাকে সোফায় বসিয়ে দিয়ে বলল, 'শান্ত হোন, মিস হক।'

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল রোজিনা। অনেকক্ষণ পরে আবেগ একটু প্রশমিত হলে সে আঁচলে মুখ মুছে জিজ্ঞেস করল, 'কি করে ঘটল এই দুর্ঘটনা? আপনিও খোকনকে বাঁচাতে পারলেন না!'

কুয়াশা পুনরাবৃত্তি করল, কিন্তু শেষের দিকটা সামান্য পরিবর্তন করে। সে বলল, 'আমি ক্রুজারে যখন পৌছুলাম তখন সেটা ডুবতে শুরু করেছে। ককপিটে উঠতে পেরেছিলাম ঠিকই। লাথি মেরে দরজার প্যানেলও ভাঙতে পেরেছিলাম। কিন্তু ভাঙা জায়গাটা দিয়ে ভিতর থেকে এমন প্রচণ্ড তোড়ে পানি বেরিয়ে এল যে, আমি তার ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গেলাম। আমি উঠবার আগেই ক্রুজারটা একেবারে তলিয়ে গেল। তোয়ালের মত কিছু একটা ভেসে আসতে দেখে আমি চেপে ধরলাম। বুঝতেও পারলাম যে, ঐ তোয়ালেটার মধ্যেই আছে খোকন।'

'তবু তাকে বাঁচাতে পারলেন না?'

'না, পারলাম না! সে মারা গিয়েছিল অনেক আগেই। ক্রুজারটা উল্টে যাওয়ায় আমিও একদম তলিয়ে গেলাম। নিজের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে খোকনকে আর তুলে আনতে পারলাম না। এখনও তার লাশ হয়ত ওখানেই পড়ে আছে।'

অশ্রু-সজল চোখে রোজিনা বলল, 'কয়েক মিনিট আগে গেলেই খোকনকে বাঁচাতে পারতেন। আহা, মাত্র কয়েক মিনিটের পার্থক্যের জন্যে খোকন আমাদেরকে ছেড়ে গেল! আপনার আর কি দোষ,' ফোঁপাতে লাগল রোজিনা।

মহীউদ্দিন সাহেব এতক্ষণ চুপ করে শুনেছেন। কোন প্রশ্ন করেননি। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংযত রেখেছিলেন। রোজিনার শেষ কথাটা শুনে তার সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল।

তিনি বললেন, 'আপনার এই আষাঢ়ে গল্প আমাদেরকে বিশ্বাস করতে বলেন?'

'হোয়াট ডু ইউ মীন?' কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করে কুয়াশা তাকাল মহীউদ্দিন সাহেবের দিকে।

চুপসে গেলেন মহীউদ্দিন সাহেব মুহূর্তের জন্যে। কিন্তু থামলেন না। তিনি বললেন, 'খোকনের যদি মৃত্যু হয়েই থাকে তাহলে তার জন্যে আমরা আপনাকেই দায়ী করব। এবং আরও অনেক কারণেই দায়ী করব আমরা আপনাকে।'

'যথা...?' বিদ্রূপ করল কুয়াশা।

'আপনার রুমে খোকনের মুক্তিপণের টাকা-ভর্তি সুটকেস এল কোত্থেকে?'

'তার মানে!' চমকে উঠল কুয়াশা।

'তার মানে কি, দেখতে চান, না শুনতে চান?'

'দেখতেই চাই।'

'তাহলে আসুন! না থাক, আমিই নিয়ে আসছি।'

দৃপ্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন মহীউদ্দিন সাহেব।

রোজিনা অবাক হয়নি। সে নিজেই দেখে এসেছে টাকা-ভর্তি সুটকেসটা।

কুয়াশা দেখল, রোজিনার চোখে ঘৃণা, অবিশ্বাস আর ভয়। মনে মনে হাসল সে। কিন্তু কোন কথা বলল না কুয়াশা। রোজিনাও চুপ করে রইল।

অনেকক্ষণ পরে রোজিনা কথা বলল। 'কিন্তু আপনি গেছেন মার্সিডিসে, আর ফিরলেন স্কুটারে। ব্যাপার কি?'

'পথে গাড়িটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। একটা পরিচিত দোকানে রেখে এসেছি। ভেসপাটা ওদের কাছ থেকেই ধার নিয়ে এসেছি।'

সিগারেট ধরাল কুয়াশা।

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। সুটকেস হাতে মহীউদ্দিন সাহেব ঢুকলেন। কার্পেটের উপর সুটকেসটা ফেলে দিয়ে বললেন, 'চিনতে পারেন সুটকেসটা?

এটাতে করেই আপনার হাতে খোকনের মুক্তিপণের টাকা পাঠানো হয়েছিল, এই আজকে রাতেই। টাকা ভিতরে আছে। সবটা অবশ্য নেই। তবে আমার পকেটে নোটের যে নম্বর ছিল মিলিয়ে দেখলাম এখুনি। এগুলো সেই টাকাই।' উবু হয়ে সুটকেসটা খুললেন তিনি।

কুয়াশা দেখল, তারপর একবার মহীউদ্দিন ও একবার রোজিনার দিকে তাকাল। ওদের দু'জনের দৃষ্টিতে চরম অবিশ্বাস আর ঘৃণা। সিগারেটে টান দিয়ে সে বলল, 'এতে কি প্রমাণিত হয়?'

'সে বিচারের ভার আদালতের উপর। আপনাকে আমি পুলিসের হাতে তুলে দেব। তারা আপনাকে আদালতে সোপর্দ করবে হুমকি, চুরি ও খুনের দায়ে।'

মৃদু হাসল কুয়াশা।

'আপনি এখান থেকে যেতে পারবেন না,' আদেশ জারি করলেন মহীউদ্দিন সাহেব।

বাইরের দিকে তাকাল কুয়াশা। ভোর হয়ে গেছে। আঁধার কেটে গেছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওসব মেলোড্রামাটিক ভয় আমাকে দেখাবেন না, সারারাত বড় ঝামেলা গেছে। মিস হক, আপনি বোধহয় অফিসে যাবেন আজ? অফিস খুলবে না?'

মাথা নাড়ল রোজিনা।

'অফিসে দেখা হবে আপনার সাথে। চলি এখন, আশ্চর্য শান্ত শোনাল কুয়াশার কণ্ঠস্বর।

দৌড়ে সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ালেন মহীউদ্দিন সাহেব। 'নো ইউ কান্ট লীভ। ইউ মাস্ট ওয়েট টিল দ্য পুলিস কাম। আদারওয়াইজ...।'

মহীউদ্দিন সাহেবের মুখের কথা শেষ হবার আগেই কুয়াশা বাঁ হাত দিয়ে তাঁকে একপাশে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ঘুসি বাগিয়ে এগিয়ে এলেন, কিন্তু আঘাত হানবার আগেই কুয়াশা তাঁর কব্জি ধরে আস্তে করে মুচড়ে দিল। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। হাতটা ছেড়ে দিয়ে কুয়াশা বলল, 'এ ধরনের ছেলেমানুষী করার চেষ্টা করবেন না।'

মহীউদ্দিন সাহেব বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতটা বুলোতে বুলোতে চরম আক্রোশে কি যেন বলতে চাইলেন। কিন্তু কুয়াশা দাঁড়াল না। ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে গেল।

রোজিনা সহানুভূতি সহকারে জিজ্ঞেস করল, 'খুব লেগেছে বুঝি?'

জ্বলে উঠলেন মহীউদ্দিন সাহেব। কিন্তু কর্ত্রীর বোনকে কঠোর কোন কথা বলতে তিনি সাহস পেলেন না। রোজিনাকে তিনি চেনেন। তাকে ঘাঁটালে ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা, সুতরাং অপমানটা নীরবে হজম করলেন তিনি।

নয়

ওদিকে দোতলায় তখন অন্য এক দৃশ্যের যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে।

শায়লা তার রুমে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দিল। দুরুদুরু বুকে সে টেলিফোনটার কাছে এসে দাঁড়াল। কাঁপা কাঁপা হাতে ফোন-ডিরেক্টরীটা ঘেঁটে শহীদ খানের বাসার নম্বর বের করল। (আজকাল ফোন-গাইডগুলোও কি বিশ্রী হয়েছে। দরকারি নম্বরটা খুঁজে বের করতে হিমশিম খেতে হয়।)

ডায়াল করতে ভয় করছিল তার। যদি…যদি… খোকন…যদি চরম দুঃসংবাদটাই শুনতে হয়? লীনা অন্তত মিথ্যে বলবে না। তবু বলা যায় না। সে তো কুয়াশারই লোক।

টেলিফোনটা বেজে চলেছে ওদিকে। কেউ ধরছে না। বুকের কাঁপুনি বাড়ছে শায়লার। ক্রেডলে চাপ দিয়ে আবার ডায়াল করল শায়লা।

'হ্যালো…? শহীদ খান সাহেবের বাসা?'

'লীনা আছে?'

'আপা ঘুমোচ্ছেন।'

'উনি একাই আছেন? না আর কেউ আছে?' বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে শায়লার।

'ওঁর সাথে…। আচ্ছা, আমি আপাকে ডেকে আনছি। আপনি লাইনে থাকুন।'

'শুনুন, আপনি কে বলছেন?'

'আমার নাম গফুর। আমি এই বাসায় কাজ করি।'

'ওহ্, ঠিক আছে, ডেকে আনুন ওঁকে। তাড়াতাড়ি আসতে বলবেন। বড্ড দরকার।'

'জ্বি।'

শায়লার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। রিসিভারটা টেবিলের উপর রেখে সে কোনরকমে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। আবার রিসিভার তুলে নিল।

ওদিকে কোন সাড়াশব্দ নেই। অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। যেন একটা যুগ পেরিয়ে গেল। ঘড়ি দেখল শায়লা। এক মিনিটও যায়নি। ওদিকে তার দেহের কাঁপুনি বাড়ছে। সে কি এখুনি মূর্ছিত হয়ে পড়বে? না, তাকে চেতনা হারালে চলবে না। যেভাবেই হোক আত্মসংবরণ করতে হবে। ডান হাতে চেয়ারের হাতল ধরে দাঁতে দাঁত চেপে সে নিজের অস্থিরতা দমাতে চেষ্টা করল। কিন্তু লীনা কেন এত দেরি করছে?

'হ্যালো?'

'লীনা?' অস্ফুটকণ্ঠে বলল শায়লা। প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও তার বক্ষস্পন্দন আবার

বেড়ে গেল।

'হ্যাঁ, লীনা বলছি। আপনি?'

'শা-শায়লা,' কাঁপছে শায়লার ঠোঁট, তার কণ্ঠস্বর। 'খোকন কেমন আছে?'

কোন উত্তর শোনা গেল না।

'বল, কেমন আছে আমার যাদু? বেঁচে আছে তো? ভাল আছে তো?'

'তুমি যেখান থেকে ফোন করছ সেখানে তুমি ছাড়া আর কে আছে?'

'কেউ নেই, কেউ নেই,' ফিসফিস করে বলল শায়লা। 'লীনা, লক্ষ্মীটি, এখানে আমি একাই আছি আমার রুমে। দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছি।'

'ঠিক বলছ?'

'আমাকে আর কত যন্ত্রণা দেবে, তোমরা সবাই মিলে বল, লীনা?' কান্না-জড়িত কণ্ঠে বলল শায়লা।

লীনা কোন কথা বলল না। কিসের দ্বিধা, কে জানে, নাকি সে যে শায়লাই, সে সম্পর্কে লীনার মধ্যে সন্দেহ আছে? অথবা কুয়াশার অন্য কোন নির্দেশ আছে? অথবা সেই রকম দুঃসংবাদটাই?

লীনা বলল, 'একটু ধর। আমি এখুনি আসছি।'

রিসিভার কানে লাগিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল শায়লা। লীনা পর্যন্ত তাকে আমল দিতে চাইছে না। ভাগ্যাহত শায়লার উপর এখন সবাই আঘাত হানছে একের পর এক। হয়ত চরম দুঃসংবাদটা দিতে ওদের বাধছে বলে সবাই তাকে মিথ্যা প্রতারণা করছে। তাতে যে তার ব্যথা সহস্রগুণ বাড়ছে-তা কি কেউ বোঝে না?

'মামণি? ম্য'মী? আমি খোকন বলছি! কেমন আছ তুমি?'

দু'কান জুড়িয়ে গেল শায়লার। আনন্দে তার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। চট করে জবাব দিতে পারল না শায়লা। অসহ্য পুলকে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে।

'বাবু! বাবু! আব্বু। কেমন আছ তুমি?'

'খুব ভাল আছি। আমাদের বাড়ির মতই মস্ত একটা বাড়িতে আছি আমি আর লীনু আন্টি। জান মামনি, আন্টি বলেছে, একটু পরেই আমরা নাকি আবার অন্য বাসায় বেড়াতে যাব। শ্যানন মামা আমার জন্যে খেলনা কিনতে গেছে। গফুর না, ঘোড়া হয়েছিল···। তুমি এখানে আসছ না কেন? তোমাকে যে ক'দিন দেখিনে?'

'আসব, বাবা, আসব। তোমাকে আনতে যাব আমি।'

'আচ্ছা, আমি এখানে কি করে এলাম? লীনু আন্টি কিছুতেই বলতে চায় না। আমি কিন্তু এখানেই থাকব। তুমিও চলে এস না? আন্টি বলেছে, আমাকে একটা আস্ত অ্যারোপ্লেন কিনে দেবে। আমি চালাব।'

দু'কান ভরে শুনতে লাগল শায়লা।

একটু পরে লীনা রিসিভার নিয়ে বলল, 'খুশি হয়েছ তো শায়লা? নাকি

এখনও সন্দেহ আছে কোন? আর সব কথা কুয়াশা দাদামণির কাছে নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। মনে রেখ, কুয়াশা মানুষের ক্ষতি করেন না। উপকারই করেন, তা ওঁর সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যাই হোক।'

'আমায় মাফ করো, লীনা। আমার মানসিক অবস্থা কি তোমরা অনুভব করতে পার না? কি তীব্র যন্ত্রণা যে আমি দু'দিন ধরে ভোগ করছি তা এক আমি ছাড়া আর কে বলতে পারে?'

'পারি বোন, সবই বুঝতে পারি। কিন্তু···এবারে ছেড়ে দিই। খোকনকে এখনও নাস্তা দেওয়া হয়নি।'

'শোন, ওকে কবে ফিরে পাব আমি?'

'সেকথা আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে যতক্ষণ খোকন বিপদ থেকে পুরোপুরি মুক্তি না পায়, অনুমান করি, ততক্ষণ কুয়াশা দাদামণি ওকে তোমার কাছে নেবেন না।'

দশ

পরের ঘটনাগুলো রুটিন মাফিক। পুলিস এল। যথারীতি তদন্ত হল। শায়লা পুলিসের প্রশ্নের জবাব দিল না। বোবার মত শূন্য দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল ইন্সপেক্টরের দিকে। যেন কোন প্রশ্নই সে শুনতে পায়নি। রোজিনা শায়লাকে রেখে এল তার রুমে। ফিরে আসতেই ইন্সপেক্টর ফিরোজ হোসেন বললেন, 'বড্ড শোক পেয়েছেন মিসেস আহমদ। আপনাদের এখুনি কোন সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে যোগাযোগ করা উচিত। উনি হয়ত পাগলই হয়ে যাবেন।'

মহীউদ্দিন সাহেব আনুপূর্বিক ঘটনা বললেন। কুয়াশার রুম থেকে মুক্তিপণের টাকা বের করে দেখালেন। মিসেস আহমদের চাবির গোছাও যে কুয়াশার রুমে ওয়ার্ডরোবের মধ্যে পাওয়া গেছে তাও জানালেন এবং শেষটায় বললেন, 'কুয়াশার মত একটা সমাজ-বিরোধী লোককে একাজে নিয়োগ করাটা ভুল হয়েছিল গোড়াতেই। আমি আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু এঁরা শুনলেন না।'

ইন্সপেক্টর কুয়াশার রুম তল্লাশি করলেন, প্রয়োজনীয় নোট নিলেন এবং প্রমাণ হিসেবে মুক্তিপণের টাকাভর্তি সুটকেসটা নিয়ে চলে গেলেন। তিনি তদন্ত শেষে বললেন, 'যতদূর মনে হচ্ছে, মুক্তিপণের টাকাটা কুয়াশা ছেলেধরাদের দেয়নি বলেই ওরা খোকনকে খুন করেছে। আবার এমনও হতে পারে যে, কুয়াশা নিজেই খোকনকে চুরি করেছিল টাকার লোভে।'

রোজিনা অস্ফুট কণ্ঠে মৃদু প্রতিবাদ জানাল, 'না না, এ অসম্ভব! এ হতেই পারে না!'

জবাবে ইন্সপেক্টর একটা রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, 'কুয়াশার রেকর্ড যারা

জানে তারাই আমার কথার মর্মার্থ বুঝবে। সারা পৃথিবী জুড়ে সে হাজারটা অপরাধ করে বেড়িয়েছে। হি ইজ এ বর্ন ক্রিমিন্যাল। অপরাধ সে করবেই। খুন-জখম ওর রক্তের দাবি।'

চলে গেলেন ইন্সপেক্টর।

ডেমরা ব্রিজের কাছে বদ্ধ জলাভূমিটা পুলিস জেলে লাগিয়ে তন্নতন্ন করে খোঁজ করল। খোকনের কাল্পনিক লাশ পাওয়া গেল না। ডুবুরিরাও ব্যর্থ হল।

সকালেই টেলিগ্রাম করা হয়েছিল শায়লার দেবর আবুল হাসেমের কাছে। দুপুরে জবাব এল। সে দুপুরেই রওয়ানা দিচ্ছে। সন্ধ্যায় পৌছুবে।

মহীউদ্দিন সাহেবের অনুরোধে রোজিনা সেদিন অফিস থেকে ছুটি নিল। হাসেমকে রোজিনা-ই এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে এল।

শায়লার জন্যে ডাক্তার ডাকবার কথা উঠল। কিন্তু সে আপত্তি করল। সে এতক্ষণে একটু ধাতস্থ হয়ে উঠেছে। হাসেমকে সে শান্তভাবে অভ্যর্থনা জানাল। তার শোকার্ত শূন্য দৃষ্টিতে বিচলিত হল হাসেম। মহীউদ্দিন সাহেবের মনে হল, এই করুণ ঘটনার মধ্যেও হাসেমের উপস্থিতিতে একটু সান্ত্বনা পেয়েছে শায়লা।

দু'একটা কথাও হল শায়লা ও হাসেমের মধ্যে। নিতান্তই ফর্মাল আলাপ। হাসেমকে এর আগে মহীউদ্দিন কখনও দেখেননি। ইনিই হবেন তাঁর নতুন মনিব। লোকটাকে বড্ড আনইম্প্রেসিভ মনে হল তাঁর। দু'একটা কথাতেই তিনি বুঝতে পারলেন, বৈষয়িক ব্যাপারে ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতার যেমন অভাব, উৎসাহের অভাবও তেমনি প্রবল। শায়লা মিল পরিচালনা সম্পর্কে যতটা বোঝে তার হাজার ভাগের এক ভাগও লোকটা বোঝে কিনা সন্দেহ আছে। ভদ্রলোক বোধহয় অত্যন্ত লাজুকও। সে শায়লা, বিশেষ করে রোজিনার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই চায় না। রোজিনা যে দু'একটা প্রশ্ন করেছে তার জবাব দিলেও তার দিকে একবারও মুখ তুলে তাকায়নি হাসেম। কে জানে, হয়ত রোজিনার প্রতি কোন দুর্বলতাও থাকতে পারে হাসেমের। মনে মনে হাসলেন মহীউদ্দিন সাহেব। অবশ্য রোজিনার দিকে অনেক সময় তিনি নিজেও মুখ তুলে কথা বলতে সাহস পান না। যদিও তার কারণ আলাদা। কিন্তু আলাদা হলেও নির্দিষ্টভাবে কারণটা যে কি, মহীউদ্দিন সাহেব নিশ্চিতভাবে তা বলতে পারেন না। তবে তিনি জানেন যে, রোজিনাকে তিনিও একটু সমীহ করেন, এমন কি মিসেস আহমদের চাইতে রোজিনাকেই তিনি বেশি সমীহ করেন।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর মহীউদ্দিন সাহেব বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। শায়লা ডাইনিংরুমে আসেনি। তাই তাকে তার রুমেই খাবার দেওয়া হয়েছে।

রুস্তম আলী দ্বিতীয়বারের মত কফির সরঞ্জাম দিয়ে গেল। রোজিনা দু'কাপ কফি তৈরি করল। এক কাপ এগিয়ে দিল হাসেমের দিকে। চুপচাপ চুমুক দিল হাসেম। রোজিনার সামনে একা একা অস্বস্তি বোধ করছিল হাসেম। মাথা নিচু করে

সে কফিতে চুমুক দিচ্ছিল। কিন্তু কিছু একটা বলা দরকার। এভাবে চুপচাপ থাকা কী বিশ্রী? বিশেষ করে খোকনের মৃত্যুজনিত শোকাবহ পরিবেশে নীরবতা আরও বেদনাদায়ক।

কিছু একটা বলা উচিত, ভাবছিল হাসেম। কিন্তু কথা বলবার সূত্র খুঁজে পাচ্ছিল না সে। অথচ, রোজিনা যে তার সাথে কথা বলতে উন্মুখ তা সে অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পেরেছে। কিন্তু তবু সে আলোচনার বিষয় খুঁজে পেল না।

নীরবতা ভাঙল শেষ পর্যন্ত রোজিনা। সে জিজ্ঞেস করল, 'ছুটি নিয়ে এসেছেন, না একেবারে ইস্তফা দিয়ে এসেছেন?'

রোজিনার চোখের দিকে কুণ্ঠিত দৃষ্টি মেলে ধরল হাসেম।

'ইস্তফা দেব কেন?' শিশুর মত প্রশ্ন করল সে।

রোজিনা বলল, 'অনেক দিন, বলতে গেলে অনেক বছর পরে আপনার সাথে দেখা। তাই না? সেই শায়লার বিয়ের সময়। তাম-এ-ওয়ালিমার দিন এই বাড়িতেই শেষ দেখা। মনে পড়ে আপনার সেদিনের ঘটনা? আপনি গাড়ি থেকে নামলেন।...অনেক বছর হয়ে গেল তবু মনে হচ্ছে, এই তো সেদিন,' স্থির দৃষ্টিতে রোজিনা তাকাল হাসেমের দিকে।

'সাত বছর,' মাথা নামাল হাসেম।

আবার কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল দু'জন।

একটু পরে রোজিনা বলল, 'আপনার উপকারের কথা ভুলব না।'

'কোন উপকার?' মাথা তুলল হাসেম।

'মনে নেই আপনার?'

'ওহ।'

'ভাল কথা, এই সাত বছরের মধ্যে আপনি আর আসেননি?'

'এসেছিলাম একবার। এই দিন পনের আগে। খুলনায় হিস্ট্রি কনফারেন্সে। এক সপ্তাহ ছিলাম সেখানে। ঢাকায়ও ছিলাম দু'দিন, কিন্তু বড্ড ব্যস্ততার মধ্যে। ফিরে গিয়েছি মাত্র দিন সাতেক আগে।'

রোজিনা বলল, 'এত বছর পরে দেশে ফিরলেন, অথচ এমনি ব্যস্ত ছিলেন যে, একমাত্র আত্মীয়ের সাথেও দেখা করার সময় হল না! আপনি তো খোকনকে দেখেননি তাহলে?'

'না, তবে, ওর অনেক ছবি আছে আমার কাছে। ভাবি মাঝে মাঝে পাঠাতেন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল হাসেম।

রোজিনা বলল, 'এবারে কি করবেন, ঠিক করেছেন কিছু?'

'কোন ব্যাপারে?'

'বলতে গেলে আপনিই তো এখন আহমদ দুলাভাইয়ের সম্পত্তির প্রধান

উত্তরাধিকারী। সুতরাং আপনাকে এসব বুঝে নিতে হবে না।'

'ঠিক বুঝতে পারছিনে, কি করা উচিত।'

রোজিনা একটু তরল গলায় বলল, 'বুঝবার কি আছে, এতবড় মিল তো আর গরিব-দুঃখীদের দান করা যায় না। আপনাকেই মিলের মালিকের দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর সেই সাথে আপনাকে নিশ্চয়ই ঘর-সংসারও পাততে হবে।'

'এসব প্রসঙ্গ এখন থাক, মিস. হক। পরে আলাপ করা যাবে,' বিব্রত হয়ে হাসেম বলল।

'সেই ভাল,' উঠে দাঁড়াল রোজিনা।

সে যখন শায়লার ঘরে ঢুকল তার ঠিক এক মিনিট আগেই শায়লা খোকনের সাথে আর একদফা টেলিফোনে আলাপ করে দরজাটা সবে খুলে দিয়ে শুয়ে পড়েছে। পায়ের আওয়াজ পেয়ে সে দেয়ালের দিকে ঘুরে শুলো।

রোজিনা ডাক দিল, 'শায়লা, জেগে আছ?'

শায়লার স্তিমিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আছি, বোন, তুমি শুয়ে পড়গে। সারাদিন ঝামেলা তো কম যায়নি!'

'আমার কথা ভাবতে হবে না। শরীর কেমন লাগছে?'

'আছে ভালই,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শায়লা। 'তুমি কালকেই চলে যাচ্ছ ঢাকায়, তাই না?'

'যাওয়া তো দরকারই। ইয়ার এণ্ডিং-এর সময়। কিন্তু এখানেও তো থাকা দরকার।'

'এখানে আর থাকবার কি দরকার আছে? আমার জন্যে ভেব না, যা হবার তা তো হয়েই গেছে।'

'তা হয় না, শায়লা। আরও দু'একদিন যাক।'

গভীর শোকার্তের ভূমিকায় অভিনয় করতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল শায়লার। সুতরাং রোজিনা আপাতত চলে যাক সেটাই মনে-প্রাণে চাইছিল শায়লা। কিন্তু রোজিনা যে এই অবস্থায় তাকে ফেলে যাবে না তা-ও সে জানে।

সে বলল, 'তা বেশ, কিন্তু অফিস কামাই কোরো না। এখান থেকেই না হয় অফিস করো। আমার গাড়িটা করেই যেয়ো।'

'সে হবে'খণ,' রোজিনা নিষ্ক্রান্ত হল।

এগার

অফিসে সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটল রোজিনার। তবু সে ফোনে শায়লার খোঁজ নিল। হাসেমের সাথেও ফোনে অনেকক্ষণ কথা বলল। সকালে অফিসে আসার পথে লীনার বাসায় গিয়েছিল সে। গফুর জানাল, লীনা গতকাল তার সাথে বেরিয়ে

যাবার পর আর ফেরেনি। চিন্তিত হল রোজিনা। লীনা তাহলে গেল কোথায়?

লাঞ্চের পর লীনা হঠাৎ এসে হাজির। সোজা এসে ঢুকল রোজিনার রূমে। ভূত দেখার মত চমকে উঠল রোজিনা। উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল সে। হাজারটা প্রশ্ন করল এক নাগাড়ে, 'কোথায় গিয়েছিলি, কি হয়েছিল? আমরা তো সবাই ভেবে মরছি! এমন কি শায়লা তার পুত্র-শোকের মধ্যেও তোর জন্যে চিন্তিত হয়ে রয়েছে। কি হয়েছিল, বল তো? কোন বিপদে পড়েছিলি নিশ্চয়ই?'

'বিপদে পড়েছিলাম ঠিকই। ব্যাপারটা অবশ্য নিতান্তই ব্যক্তিগত।'

'ও, তাই নাকি!' স্মিতহাসি হাসল রোজিনা, 'তাই তো বলি···। তবু এমনিভাবে যাওয়াটা তোর ঠিক হয়নি। আমরা ভেবে মরছি। সকালেও গিয়েছিলাম তোর বাসায় খোঁজ করতে।'

'শুনেছি আমি।'

'চা খা এক কাপ?'

'বেশ তো। আমারও চায়ের জন্যে প্রাণটা আইঢাই করছে।'

বেয়ারাকে ডেকে চায়ের অর্ডার দিল রোজিনা।

লীনা বলল, 'শোন, আসল কথাটাই বলা হয়নি। কুয়াশা দাদামণি নিচে গাড়িতে বসে আছে তোর অপেক্ষায়। খুব জরুরী কথা আছে তোর সাথে। এখুনি যা তুই।'

'সে কিরে, এতক্ষণ বলিসনি কেন?' ব্যস্ত হল রোজিনা।

'সময় দিলি কোথায়, বল? যেভাবে এক নাগাড়ে কৈফিয়ত চাইলি, সময় পেলাম কোথায়?'

'কিন্তু নিচে কেন, এখানে নিয়ে এলেই পারতিস?'

'না, উনি উপরে এলেন না। আমি বলেছিলাম। তুই জলদি যা।'

'তুইও চল।'

'না, গোপন কথা আছে। আমার সামনে বলবেন না, বলেছেন তিনি।'

'বেশ, আমি যাচ্ছি।'

রোজিনা বেরিয়ে গেল।

নিচে গিয়ে কুয়াশার খোঁজ করল রোজিনা। তাকে দেখতে পেল না, তার মার্সিডিসটাও নয়। চারদিক ভাল করে সন্ধান করে রূমে ফিরে গেল রোজিনা। ব্যাপার কি, কুয়াশা তাকে ডাকতে লোক পাঠিয়ে সরে পড়ল কেন? এই রহস্যজনক আচরণের কারণ খুঁজে পেল না সে।

ফিরে গিয়ে রোজিনা বলল, 'কিরে, কোথায় কুয়াশা? পেলাম না তো! নিচে তো দেখলাম না ওকে!'

'সে কিরে, নিচেই তো গাড়িতে বসে আছেন! আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে উনি বসে রইলেন।'

'কই, দেখলাম না তো।'

লীনাও অবাক হয়ে বলল, 'এমন তো হবার কথা নয়! ভাল কথা, তুই কি আজকে শায়লাদের বাসায় ফিরে যাবি, না কি তোর নিজের বাসায় যাবি?'

'শায়লাদের ওখানেই যাব। তুই যাবি?'

'আমি? আমি আর গিয়ে কি করব? কোন উপকার তো করতে পারলাম না। আচ্ছা, মহীউদ্দিন সাহেব লোকটা কেমন রে?'

'কেন রে? এ প্রশ্ন করছিস কেন?'

'এমনি।'

'এমনিই এ ধরনের প্রশ্ন করেছিস বলে মনে হয় না।'

'উনি নাকি কুয়াশা দাদামণিকে পুলিসের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন?'

রোজিনা বলল, 'কিছু যদি মনে না করিস, তো বলি। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার অত্যন্ত ঘোলাটে লাগছে। বিশেষ করে কুয়াশার রুমে মুক্তিপণের টাকাটা পাওয়ার পর থেকে আমার নিজের মনেই হাজারটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আমার মনে হয়, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, কুয়াশার জন্যেই এই দুর্ঘটনা ঘটল। এর জন্যে আমিও দায়ী। মহীউদ্দিন সাহেবের তীব্র আপত্তি উপেক্ষা করে আমিই কুয়াশার উপর খোকনকে উদ্ধারের দায়িত্ব দেবার জিদ ধরেছিলাম। তাই মহীউদ্দিন সাহেবকেও দোষ দিতে পারি না।'

লীনা কিছু বলল না।

চা দিয়ে গেল আর্দালী। বিরস মুখে চা খেয়ে বিদায় নিল সে।

বার

নীলাভ নিলয়ে নৈশ-ভোজের পা া এই মাত্র শেষ হল। কফি দিয়ে গেল রুস্তম আলী ড্রইংরুমে। শায়লা তার ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করছিল। কথাবার্তা বড় একটা সে বলেনি, আর তার স্থবির অভিব্যক্তি সাফল্যের সাথে বজায় রেখেছে। কিন্তু এতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তবে সে জানে, তার এই কষ্টকর অভিনয়ের পালা শেষ হতে আর দেরি নেই।

কুয়াশা যে-কোন মুহূর্তে খোকনকে নিয়ে পৌঁছুতে পারে। এই, এল বলে, বিকেলে ফোন করে জানিয়েছে সে। নৈশ-ভোজের পর হাসেম, মহীউদ্দিন সাহেব ও রোজিনা যেন নীলাভ নিলয়ে থাকে, তার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে বলেছে। তেমন কিছু অসুবিধে হয়নি। মহীউদ্দিন সাহেবকে শুধু রাতে খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে হয়েছে। কারণ, ব্যাচেলার মহীউদ্দিন সাহেব সন্ধ্যার পর হোটেল বা ক্লাবের উষ্ণ পরিবেশই বেশি পছন্দ করেন।

ডাইনিং টেবিলেও বটে, ড্রইংরুমেও কথা দুই-একটা রোজিনা-ই বলেছে।

হাসেম স্বভাবতই গম্ভীর, নীরব। কিন্তু এখন সে যেন আরও মিইয়ে গেছে। সব মিলিয়ে একটা অস্বস্তিকর দম বন্ধ করা পরিবেশ।

মহীউদ্দিন সাহেব কথা একটু বেশিই বলেন। কিন্তু তাঁরও কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল। তবু তিনি চুপচাপ ছিলেন।

রোজিনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'যেন কোন কিছু ঘটেনি, এমনি একটা ভান করে অভিজাত আচরণে কফি খাওয়ার কোন মানে হয় না। আমরা যেন নিজেদের মনকে চোখ ঠাওরাচ্ছি। নিজেদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করছি, যেন এ বাড়িতে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। এভাবে আত্মপ্রতারণা করে কি লাভ? সত্যি বলছি, শায়লা, যদি এমন করে বাক্‌হীন না হয়ে তুমি একটু কাঁদতে পারতে⋯!'

মহীউদ্দিন সাহেব এই প্রসঙ্গ অবতারণা না করার জন্যে রোজিনাকে ইশারা করলেন। রোজিনা কিছু বলার আগেই হাসেম প্রশ্ন করল, 'পুলিস কিছু করতে পারল? ধরতে পেরেছে ঐ খুনে কুয়াশাকে?'

'আর পুলিসের কথা। বেহদ্দ অপদার্থ। সেই ভয়ঙ্কর অপরাধীটাকে পুলিস এখনও ধরতে পারেনি। শয়তান খুনেটা⋯।' মহীউদ্দিন সাহেব এতক্ষণে অবাক হলেন।

'শয়তান, খুনে কাকে বলছেন মহীউদ্দিন সাহেব?' দরজার দিক থেকে কে যেন বলল। সবাই তাকিয়ে দেখল, কুয়াশা দাঁড়িয়ে আছে ড্রইংরুমের দ্বারপ্রান্তে।

মৃত্যুর মত স্তব্ধতা নেমে এল রুমটার মধ্যে। মহীউদ্দিন সাহেব আর হাসেম যেন চেয়ারের সাথে সেঁটে গেছে। রোজিনা আতঙ্ক-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কুয়াশার দিকে। শুধুমাত্র শায়লাই মনে মনে গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

তবু লাফিয়ে উঠলেন মহীউদ্দিন সাহেব। 'কেন, কেন এসেছেন আপনি? আপনার কি রক্তের আর অর্থের তৃষ্ণা মেটেনি? খোকনকে খুন করেও কি আপনার জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ হয়নি?' চিৎকার করে বলে উঠলেন তিনি। 'আবার কাকে খুন করতে এসেছেন?'

কুয়াশা তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। শান্তভাবে বলল, 'উত্তেজিত হবেন না। কেন এসেছি জানতেই পারবেন।'

'কই, লীনা, এস। দেরি করছ কেন?' বাইরের দিকে চেয়ে রইল কুয়াশা। দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল লীনা। সে ঢুকল। একা নয়, তার কোলে খোকন।

'আম্মা!' খোকন লীনার কোল থেকে নেমে দৌড়ে এল শায়লার কাছে।

অসহ্য আনন্দে তখন বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছে শায়লা। খোকনকে সাপ্টে কোলে তুলে চুমোয় চুমোয় আচ্ছন্ন করে দিল সে। সেদিকে মনযোগ দিল না কুয়াশা। শায়লা যে এমনটা করবেই সে তো স্বাভাবিক। সে মনোযোগ দিল, তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল রোজিনা হকের দিকে। মহীউদ্দিন সাহেব ও হাসেম দৃষ্টি নিবদ্ধ করল রোজিনার দিকে। কারণ, রোজিনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে এমন তীব্র আর্তনাদ করে

উঠেছে যে ওরা সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আর চেহারাটা এমন বিকৃত হয়ে গেছে যে, তাকে ভয়ঙ্কর কুৎসিত দেখাচ্ছে। ভয়ে তার চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

'এটা খোকন নয়! এটা খোকন হতেই পারে না!' রোজিনা উন্মাদের মত চিৎকার করে উঠল। 'এটা একটা তামাশা। জঘন্য তামাশা। খোকন মরে গেছে। কুয়াশা তাকে হত্যা করেছে। আমরা সবাই সে কথা জানি।'

মহীউদ্দিন সাহেব অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বললেন, 'ফর গডস্ সেক্, কি হয়েছে আপনার? এমন উন্মাদের মত চিৎকার করছেন কেন?' কুয়াশার দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন তিনি, 'আর আপনিই বলুন, এটা কি ধরনের তামাশা হল? এর মানে কি?'

খোকনকে কোলে নিয়ে শায়লা রোজিনার দিকে আতঙ্ক নীল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে বলল, 'রোজিনা, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? খেপেই বা গেলে কেন? আর এমন গর্জনই বা করছ কেন?'

'এর মানে কি! মিসেস আহমদ কেন চিৎকার করে উঠলেন না খোকনকে দেখে? তিনি অবাকই বা হলেন না কেন? মি. কুয়াশা, এসব হেঁয়ালির মানে কি?'

'কারণ শায়লা গোড়া থেকেই জানত যে, তার ছেলে ডুবে মারা যায়নি,' তিক্ত কণ্ঠে বলল লীনা। 'যদিও আপনারা ভেবেছিলেন, কুয়াশা দাদামণিই তাকে খুন করেছে। আসলে উনিই খোকনকে বাঁচিয়েছেন।'

'কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। বলতে গেলে খোকনকে বাঁচিয়েছে লীনা-ই। ওকে বাঁচাবার সেন্ট পারসেন্ট কৃতিত্বই লীনার। কিন্তু সে যাক, মিস হক কেন ক্ষিপ্ত হলেন জানেন?' কুয়াশার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কঠোর শোনাল, 'মিস হকই ঐ নিষ্পাপ শিশুকে পুরানো ক্রুজারের মধ্যে ফেলে রেখে এসেছিল তাকে ডুবিয়ে হত্যা করার জন্যে।'

'মিথ্যা, মিথ্যা!' আবার চিৎকার করে উঠল রোজিনা। 'নির্জলা মিথ্যা! তোমরা কেউ বিশ্বাস কোরো না। শায়লা, বিশ্বাস কোরো না।'

'অস্বীকার করে কোন লাভ হবে না। খোকন নিজেও বলেছে, সে তোমাকে শাবল হাতে ক্রুজারের তলায় আঘাত করতে দেখেছে। তুমি তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ইঁদুরের মত ফাঁদে ফেলে ডুবিয়ে মারবার জন্যে ক্রুজারে রেখে এসেছিলে। তুমি, তুমি মানুষ নও পিশাচ,' কুয়াশার কণ্ঠে ঘৃণা ফেটে পড়ল।

খোকনকে কোলে নিয়ে শায়লা কাঁপতে লাগল। সে বলল, 'এসব কি সত্য, রোজিনা? ইয়া আল্লাহ, এ কথা যেন সত্য না হয়।'

রোজিনার অপরাধ সম্পর্কে আর প্রমাণের প্রয়োজন ছিল না। ক্রোধ ও ভয়ে বিকৃত রোজিনার মুখটাতেই তার অপরাধ যেন আঁকা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

'তুমি যা করেছ তার একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। মুক্তিপণের সামান্য টাকার

জন্যে এ কাজ করনি। কারণ সে টাকা তো সেই রাতেই ক্রুজার থেকে এনে আমার রুমে লুকিয়ে রেখেছ। ভাল কথা, মিসেস আহমদের চাবির গোছাও ঐ রুমে কাবার্ডের মধ্যে রেখে দিয়েছিল কে? যাক, তুমি এসব করেছিলে এই জন্যে যে, খোকন মারা গেলে তার অপরাধের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপানো যাবে। খোকনকে চুরির জন্যে তুমি লোক নিযুক্ত করেছিলে। খোকনকে তারা আদর-যত্নেই রেখেছিল। কিন্তু খুন করতে গিয়েছিলে তুমিই এবং ভেবেছিলে, তুমি সফল হয়েছ। তোমার চক্রান্তের অন্তরালে ভয়ঙ্কর কিছু একটা লুকিয়ে আছে। কিন্তু সেটা কি···?'

'রোজিনা, তুমি কিছু বলছ না কেন?' মিনতি করল শায়লা, 'খোকন মরলে তোমার কি লাভ হত? তুমি কি আমাকে ঘৃণা কর? আমি কি তোমার কোন ক্ষতি করেছি কখনও? উনি যাই বলুন আমার বিশ্বাস হয় না তুমি এর মধ্যে জড়িত আছ।'

'বিশ্বাস না হবার কারণ নেই। মুক্তি পণের দাবি সম্পর্কে এই চিঠিগুলো দেখুন। আর এই লেখাগুলোও দেখুন। সবগুলো মিলিয়ে দেখুন, একই টাইপরাইটারে টাইপ করা হয়েছে কিনা। আপনিও দেখুন, মহীউদ্দিন সাহেব।'

মহীউদ্দিন সাহেব অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। তিনি বললেন, 'ও দুটো তো মুক্তিপণের চিঠি, কিন্তু এটা পেলেন কোথায়?'

'আজ বিকেলে একটা ফন্দি করে লীনাকে দিয়ে মিস হকের রুমের টাইপরাইটারটা দিয়ে টাইপ করিয়েছি,' ঘটনাটা আনুপূর্বিক খুলেই বলল কুয়াশা। 'এর মানে কি এই নয় যে, মিস হকই এই চিঠিগুলো পাঠিয়েছে? আরও প্রমাণ চান?'

মিসেস আহমদ দু'বছর বাড়ি থেকে বেরোননি। আর যেদিন বেরোলেন সেইদিনই দুর্ঘটনাটা ঘটল। তার মানে, এই বাড়ির মধ্যেই ছেলেধরাদের লোক আছে। সে কে? চাকর-বাকরদের সাথে আমি আলাপ করে দেখেছি, তারা প্রত্যেকেই বিশ্বস্ত? খোকনকে প্রাণাধিক ভালবাসে। ছেলেধরাদের সাথে তাদের কারও যোগাযোগ থাকার অবকাশ নেই। তারা বাইরে এসব নিয়ে আলোচনাও করেনি। তাহলে ঐ রাতে যে মিসেস আহমদ বাইরে যাবেন তা ছেলেধরাদেরকে কে বলেছে?'

'মিস হক একটা নতুন মরিস মাইনরে করে ক্রুজারে গিয়েছিল। গাড়িটা তার অফিসের এক হোমরাচোমরা অফিসারের। সেই দিনই কেনা হয়েছিল। লীনার খোঁজ নেবার নাম করে সে মিসেস আহমদের ট্রায়াম্ফ গাড়িটা নিয়ে সেই ভদ্রলোকের বাসায় রেখে তার নতুন গাড়িটা নিয়ে ক্রুজারে খোকনকে খুনের আয়োজন করতে গিয়েছিল। খোঁজ-খবর করে এসব জানা গেছে। আইয়ুব ও নওসের নামে যে লোক দু'টোকে দিয়ে সে খোকনকে চুরি করিয়েছে তারা এখন পুলিসের কাস্টডিতে আছে। তারা ইতিমধ্যেই তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে। এর

পরেও কি, মিস হক, আপনি অভিযোগটা অস্বীকার করবেন?'

আরও প্রমাণ সরবরাহ করা হল। এত উত্তেজিত আলোচনার কারণ সম্পর্কে খোকনের এতটুকু ধারণা ছিল না। মায়ের কোল থেকে নেমে সে একদৌড়ে রোজিনার দিকে ছুটে এল। তার হাত দুটো ধরে শিশু-সুলভ কৌতূহলভরে প্রশ্ন করল, 'খালাম্মা, তুমি কেবিনের মেঝেটা শাবল দিয়ে ভাঙছিলে কেন? আমি জেগে যখন দেখছিলাম তুমি তখন আমার উপর রাগ করলে কেন? জান মা, খালাম্মা আমাকে মিষ্টি দুধ খেতে দিয়েছিল কেবিনে!'

শায়লা খোকনকে টেনে কাছে নিয়ে বলল, 'ও কিছু না, বাবা, খালাম্মা তোমার সাথে খেলা করছিলেন।'

রোজিনা কিছু বলল না। সে মাথা নত করে বসে রইল। শায়লা ও মহীউদ্দিন সাহেব এত গভীরভাবে তাকে লক্ষ্য করছিলেন যে, আবুল হাসেমের আকস্মিক অদ্ভুত আচরণ তাদের চোখে পড়েনি। অথচ চোখে পড়লে তারা দেখতেন যে সে ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছে। তার দিকে ওদের দৃষ্টি পড়ল তখনি, যখন সে চোখমুখ উত্তেনায় লাল করে সশব্দে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'উঃ, আমার আর সহ্য হচ্ছে না!' কঠিন গলায় হাসেম বলল, 'এই স্ত্রীলোকটা আসলেই একটা শয়তান, একেবারে পিশাচ! সাপের চাইতেও খল। সে জানত যে, খোকন-সোনা মারা গেলে সম্পত্তির বড় শেয়ারটা আমারই হাতে আসবে। পরে সব যখন চুকে-বুকে যাবে তখন সে আমাকে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করবে।'

'এ আবার কেমন কথা বলছেন, স্যার!' অবাক হলেন মহীউদ্দিন সাহেব। 'মিস হক আপনাকে জোর করেই তাকে বিয়ে করাবে! এটা কেমন ধারার কথা হল?'

'ঠিকই বলেছি। আশ্চর্য শোনালেও কথাটা ঠিক। রোজিনা সবল, আর আমি দুর্বল। আমি জানি, আমি দুর্বল কিন্তু এই মুহূর্ত থেকে আর দুর্বল নই। এই মুহূর্তে যদি আমি সত্য কথা না বলি, তাহলে কোন দিনই আর সত্য বলার সৎসাহস আমার হবে না।'

ভেঙে পড়ল হাসেম। সমস্ত শরীর তার কাঁপতে লাগল, 'সে এই পরিবারের বিরাট বিত্তের মালিকানা চেয়েছিল। মুক্তিপণের পাঁচ লাখ টাকা সম্পূর্ণ সম্পত্তির তুলনায় অতি সামান্য। সে জানত তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস আমার হবে না কোনদিনই।'

কিন্তু কোন মেয়েই জোর করে কোন পুরুষকে বিয়ে করতে বাধ্য করতে পারে না। উল্টোটা অবশ্য হরহামেশাই ঘটে থাকে,' অবিশ্বাসের সুরে বললেন মহীউদ্দিন সাহেব। 'এটা মেয়েটার উপর নির্ভর করে। আপনি ঠিকই বলেছেন, হাসেম সাহেব। এটাই ছিল রোজিনার চক্রান্তের মূল লক্ষ্য। আপনাকে হাতের মুঠোয় পুরে ফেলবার মত ধূর্ততা তার অবশ্যই আছে। আর সেটা সে করত রয়ে-সয়ে

তাড়াহুড়া করে নয়। আর তাতে কেউ সন্দেহও করত না। বরং এটাকে স্বাভাবিকই মনে হত। সবাই তা সহজভাবে গ্রহণও করত।'

'ব্যাপারটা শুধু তাই নয়। আমি আপনাদের কাছে একটা স্বীকারোক্তি করতে চাই। কয়েক বছর ধরে আমি বিবেকের দংশন সহ্য করেছি, কিন্তু তা স্বীকার করার মত সাহস আমার হয়নি, কারণ কথাটা প্রকাশ করলে আমাকে জেল খাটতে হত। কিন্তু জেলে যেতে আমি এখন প্রস্তুত। প্রাপ্য শাস্তি আমাকে ভোগ করতেই হবে। আমি এখন প্রায়শ্চিত্তই করতে চাই।'

'জেল খাটতে হবে! কি বলছ, হাসু?' বিস্মিত হল শায়লা। 'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে!'

শায়লার কথা কানে তুলল না হাসেম। তাকে থামতে ইঙ্গিত করে সে বলল, 'দাদার বিয়ের তাম এ-ওয়ালিমা হয়েছিল এই বাড়িতেই। আমি তখন সেগুন বাগিচা থাকতুম। আমার বেবী অস্টিনে করে আসছিলুম আমি। পথ ছিল অন্ধকার। গাড়িটার হেডলাইটও ছিল অনুজ্জ্বল। সেই আধো-অন্ধকারে গাড়িতে কি যেন চাপা পড়ল। ভাবলুম, ছাগল-টাগল হবে হয়ত। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারলাম না। ভয়ে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে চলে এলুম। নির্বোধ আমি, তাই পিছন ফিরেও তাকালুম না একবার। গাড়ি থেকে যখন পোর্টিকোতে নামলুম তখন আমি কাঁপছিলুম। কাছেই ছিল রোজিনা। সে এগিয়ে এল। স্বীকার করতেই হবে, ওকে আমার খুব ভাল লাগত। (এই সময় হাসেমের মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে গেল।) সে আমাকে দেখে কি বুঝল, জানি না। আমার কাছে ব্যাপারটা জানতে চাইলে আমি খুলেই বললুম তাকে। গাড়ির সামনের উইংয়ের রক্তের দাগও তার চোখে পড়ল। আমাকে সে উদ্বিগ্ন হতে নিষেধ করে বলল, 'এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল কাজ হল, মুখ বন্ধ করে রাখা এবং ভুলে যাওয়া।'

'কিন্তু হাসু...,' উত্তেজিত হয়ে বলতে গেল শায়লা।

'প্লীজ, ভাবী, আমাকে শেষ করতে দাও,' মিনতি জানাল হাসেম। 'একটু পরেই সেই ভয়ঙ্কর খবরটা শুনতে পেলুম—একটা গাড়ির তলে চাপা পড়ে এক বুড়ি মারা গেছে। স্থান-কালও মিলে গেল। বুঝতে পারলাম, ঐ বৃদ্ধার মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী। আমি পুলিসের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে চাইলাম। কিন্তু রোজিনা কিছুতেই আমাকে যেতে দিল না। তার প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে আমার নৈতিক দায়িত্ব-বোধকে আছন্ন করে ফেলল সে। সে বলল বোকার মত কেন জেল খাটতে যাবে? সে ছাড়া এব্যাপার তো আর কেউ জানে না। কেউ জানতেও পারবে না। বোকার মত আমি তার কথা মেনে নিলুম। আমি জানি, আমি দুর্বল। আমাকে সে পরাভূত করল। সে থেকেই সে আমাকে হাতের মুঠোয় বন্দী করে রেখেছে। সে জানে, তাকে অস্বীকার করার সাধ্য আমার নেই। করলে আমাকে জেলে পচতে হবে। কিন্তু এখন আমি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।'

'আর এটাকে সম্বল করেই মিস রোজিনা হক খোকনকে হত্যা করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। কারণ সে জানে, খোকনের অবর্তমানে হাসেম সাহেবই হবেন আহমদ সাহেবের প্রায় সমস্ত সম্পত্তির মালিক। আর তাকে বিয়ে করতে সে বাধ্য করবে জেলখানার ভয় দেখিয়ে,' পাদপূরণ করল কুয়াশা।

'নিশ্চয়ই। কাল সন্ধ্যায় আমি তেজগাঁ পৌঁছুবার পর থেকে আজ পর্যন্ত অনেকবার রোজিনা সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আমাকে। সরাসরি নয়। আকারে ইঙ্গিতে। অস্বীকার করব না। আমি গত কয়েকটা বছর ধরে তার ভয়ে সিটিয়ে আছি। আমি জেল খাটবার কথা, নিজের লাঞ্ছনা আর অবমাননার কথা ভাবতেই পারি না। অথচ তার জন্যে দায়ী ঐ স্ত্রীলোকটাই। কিন্তু এখন আমি আর কিছু পরোয়া করি না,' একটানা নিজের অপরাধের কথা বলে যেন স্বস্তি পেল সে।

কপালটা ঘেমে উঠছিল। রুমাল দিয়ে কপালটা মুছে রোজিনার দিকে ব্রতী দৃষ্টিতে তাকাল একবার। তারপর অন্য দিক মুখ ফেরাল।

শায়লা ইতিমধ্যে বারকয়েক কথা বলবার চেষ্টা করেছে, পারেনি। এখন তার কণ্ঠ শোনা গেল।

'হাসু, তুমি, তুমি একটা আস্ত গাধা। তোমার গাড়ির তলায় চাপা পড়ে যেটা মারা গিয়েছিল সেটা মানুষ নয়, ছাগলই।'

দুঃখের হাসি হাসল হাসেম। 'সে কথা ঠিক নয় ভাবি, আমাকে বাঁচাবার জন্যে তুমি মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছ।...আসলে এক বুড়িই মারা গিয়েছিল...।'

'আগে শুনে নাও,' বাধা দিল শায়লা। 'তুমি তো বলা নেই, কওয়া নেই, একদিন পরই পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেলে। কেন গেলে এ ভাবে, বুঝতে পারিনি...তুমি হয়ত জানতেই পারনি যে, এক বুড়ি সন্ধ্যায় ছাগল নিয়ে ফেরবার সময় সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। সে দুর্ঘটনাটা ঘটিয়েছিল টঙ্গীরই এক ছোকরা। চোরাই একটা গাড়ি করে যাওয়ার সময় ঐ দুর্ঘটনাটা ঘটে। পরের দিন সকালেই পুলিসের কাছে এবং পরে আদালতে সে তার আপরাধ স্বীকার করে। বুড়ি মারা যাওয়ার পর ছাগলগুলো ছাড়া পেয়ে চরে বেড়াচ্ছিল। তুমি তারই একটাকে চাপা দিয়েছিলে। পুলিস অবশ্য দুটো মৃত্যুর জন্যেই ছোকরাকে দায়ী করেছিল, অথচ তুমি এতগুলো বছর নাহক নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করে বিবেকের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছ। তুমি নিতান্তই একটা আহাম্মক!'

হাসেম গর্জন করে উঠল, 'রোজিনা একথা জানত না?'

'নিশ্চয়ই জানত,' শায়লা বলল। 'এ তল্লাটের সবাই জানে। এ বাড়িরও সবাই জানে। তুমি রাতে ঢাকায় ফিরে যাবার পর বেশ কয়েকদিন রোজিনা এখানে ছিল। দুর্ঘটনার পরের দিনই তো সে প্রকৃত ঘটনা শুনেছে।'

'অথচ সেইদিনই সে সন্ধ্যায় ফোন করে আমাকে বিদেশে চলে যেতে বলেছে, অন্ততপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছে। দুর্বলচিত্ত

আহাম্মকের মত আমি তার কথা শুনেছি। পরদিনই চলে গেছি পশ্চিম পাকিস্তানে। আর সেই জন্যেই আমি সত্য ঘটনাটা জানতে পারিনি। তখন থেকেই তার মাথায় শয়তান বাসা বেঁধেছিল। অথচ কতই বা তখন তার বয়স হবে। সতেরও পেরোয়নি বোধহয়। গত বছর সে আমার কাছ থেকে দশ হাজার টাকা নিয়েছে গাড়ি কিনবে বলে। ঐ টাকাটাই আমার একমাত্র সঞ্চয় ছিল। আমি জানতাম, এটা ব্ল্যাকমেইল। কিন্তু আমার কিছুই করার উপায় ছিল না। আর গতকাল আমি এসে পৌঁছুবার পর থেকেই সে আমাকে সেই দুর্ঘটনার কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। তুমি…তুমি শয়তান…কুত্তী…খুনে…!' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল হাসেম রোজিনার দিকে। রাগে হাসেম তখন কাঁপছিল।

মহীউদ্দিন সাহেব মন্ত্রমুগ্ধের মত হাসেমের কথা শুনছিলেন। তার বলার ভঙ্গিতে এবং নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতায় হাসেমের একটা কথাও তিনি অবিশ্বাস করতে পারলেন না।

ঘৃণা ভরে তিনি রোজিনার দিকে তাকালেন। হ্যাঁ, এই ভদ্রমহিলাকে তিনিও যে ভয় করতেন না এমন নয়। তাঁর উপরও অনেকবার প্রভাব বিস্তার করেছে রোজিনা। তিনি অসহায়ের মত চুপ করে থেকেছেন। রোজিনার পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

কুয়াশা মহীউদ্দিন সাহেবকে বললেন, 'এবারে আপনার বাকি দায়িত্বটুকু পালন করুন। আমার কাজটুকু তো আমি করেই দিয়েছি।'

'নিশ্চয়ই। আমি এখুনি থানায় ফোন করে দিচ্ছি।'

এতক্ষণে কেঁপে উঠল রোজিনা। তীব্র চিৎকার করে বলল, 'না, না! আমাকে পুলিসের হাতে তুলে দিয়ো না! শায়লা, আমাকে ক্ষমা কর। মাফ কর আমাকে। আমাকে আর একবার বাঁচবার সুযোগ দাও।'

তার কথা কেউ কানে তুলল না।

মহীউদ্দিন সাহেব কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে কুয়াশার দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, ভাই। আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। একথা ঠিক যে, গোড়া থেকেই আপনার সম্পর্কে আমার ভুল ধারণা ছিল। আর সম্ভবত তার সুযোগ নিয়েই মিস হক আমাকে ভুল পথে পরিচালনা করেছেন। আমাকে দিয়েই তিনি আপনার রুম থেকে মুক্তিপণের টাকাভর্তি সুটকেসটা আর মিসেস আহমদের চাবির গোছা আবিষ্কার করিয়েছেন। ব্যাপারটা যে তিনিই এমন চমৎকারভাবে পরিকল্পনা করেছেন তা আমি এতটুকু বুঝতে পারিনি তখন। উহ্, কি সাংঘাতিক রমণী, আমাদের এই রোজিনা হক! যাক, আমাকে মাফ করে দিয়েছেন তো?'

জবাবে কুয়াশা একটু হাসল শুধু।

কুয়াশা ২৩

প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল, ১৯৭০

এক

মেয়েটি কাঁদছিল। কান্নার দমকে দমকে ওর দেহটা বারবার কেঁপে উঠছিল। সোফায় বসেছিল মেয়েটি মাথাটা নত করে। মেঝের উপর একটা সরোদ। তার পাশেই পড়ে আছে সেদিনের সংবাদ-পত্র।

সামনের সোফায় বসে আছে কুয়াশা। সে প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে তোমার শাহানারা, আমাকে খুলে বল। যদি আমি পারি, মানে আমার সাধ্যে কুলায়, তাহলে যতটা সম্ভব তোমাকে সাহায্য করব আমি। অন্তত তোমার সমস্যা আমাকে জানতে দাও।'

আরও অনেকক্ষণ কাঁদল শাহানারা। তারপর আঁচলে চোখ মুছে কুয়াশার দিকে তাকাল। কান্নাভেজা গলায় সে বলল, 'আজকের কাগজ পড়েছেন, মাস্টার সাহেব? আইন আদালতের পাতা?'

সকালে কাগজটা পড়েই বেরিয়েছিল কুয়াশা। সে বলল, 'পড়েছি। কোন্ খবরটা বল তো? অবশ্য আইন আদালতের কলামে খবর আছে একটাই। কুলী হোসেন হত্যাকাণ্ডের খবরটা নাকি?'

মাথা নাড়ল শাহানারা।

পরশু, মানে ১০ মার্চের রাতে কোন এক কুলী হোসেনকে নাসিমুল আজিম নামক এক যুবক গুলি করে খুন করে লাশটার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেহটা ছিন্নভিন্ন করে রেখে পালিয়েছিল। ঘটনার সময় জনৈক পুলিস-পেট্রল নিতান্ত আকস্মিকভাবেই সেখানে গিয়ে পড়ে। নাসিমুল আজিম তাকেও গুলি করে। পুলিস অবশ্য মারা যায়নি। সকালেই নাসিমকে গ্রেফতার করা হয়, ছোকরাকে সে চেনে। বিখ্যাত শিল্পপতি সাইফুল আজিম সাহেবের ভাইপো। আজিম সাহেব তার পুরানো পরিচিতদের অন্যতম। গতকাল জামিনের আবেদন করা হয়েছিল, কিন্তু আবেদন মঞ্জুর হয়নি।

কুয়াশা বলল, 'ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল।'

মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে শাহানারা। সরোদে হাত খুব ভাল। বছরখানেক আগে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তার সরোদ বাজানো শুনে মুগ্ধ হয়েছিল কুয়াশা। অনুষ্ঠান শেষে গায়ে পড়েই আলাপ করেছিল সে মেয়েটার সাথে। কুয়াশা যে সরোদ

বাজানোয় পারদর্শী বুদ্ধিমতী মেয়েটার তা অনুধাবন করতে বিলম্ব হয়নি। সে কুয়াশাকে আমন্ত্রণ করেছিল তার বাসায়। কুয়াশা গিয়েছিল আমন্ত্রণ রক্ষা করতে। তারপর থেকেই শাহানারা তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। কুয়াশাও প্রাণ ঢেলে মনের মত ছাত্রীকে সরোদ বাজানো শিক্ষা দিয়ে আসছে। আশ্চর্য প্রতিভা মেয়েটির। কুয়াশার শিক্ষা আত্মস্থ করছে সে অসীম নৈপুণ্যের সাথে।

সরোদে কুয়াশার অসম্ভব নৈপুণ্য দেখে অবশ্য অবাক মানত শাহানারা। সে মাঝে মাঝে বলত, 'আপনি কেন রেডিও-টেলিভিশনে বাজান না, মাস্টার সাহেব?'

কুয়াশা হাসত। 'ওস্তাদের নিষেধ আছে।'

এটা কিন্তু আপনার ওস্তাদের অন্যায়।'

ওকথা বলতে নেই, শাহানারা।'

শাহানারা কিন্তু খুশি হত না। তার ইচ্ছে হত, দুনিয়াসুদ্ধ লোককে সে তার সরোদ শিক্ষকের কাছে হাজির করবে। তার ইচ্ছেটা বুঝত কুয়াশা। মনে মনে হাসত। শাহানারা এখন পর্যন্ত তার পরিচয় জানে না। জানলে যে আঁতকে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই।

'কে আপনার ওস্তাদ, মাস্টার সাহেব?'

'সেটাও বলতে নিষেধ আছে।'

সপ্তাহে একদিন করে কুয়াশা আসে শাহানারাকে সরোদ শেখাতে। প্রতি মঙ্গলবার। আজকেও এসেছিল। ড্রইংরুমের দরজাটা খোলাই ছিল। জুতোর মচমচ শব্দ করে সে ঢুকল এবং অবাক হয়ে দেখল, সোফাতে মাথা নিচু করে বসে আছে শাহানারা। সরোদটা আর একটা খবরের কাগজ মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। দেহের কাঁপুনি দেখে সে বুঝতে পেরেছিল, কাঁদছে মেয়েটি।

এক বছর ধরে কুয়াশাকে দেখে আসছে শাহানারা। কুয়াশার ব্যক্তিত্ব সে অনুভব করে আসছে এক বছর ধরে। মাস্টার সাহেবের অন্তরে যে একদিকে কোমলতা আর অন্যদিকে কাঠিন্য আছে তা অনুভব করেছে শাহানারা। আর এটাও জানে যে, তার যেকোন আপদে বিপদে মাস্টার সাহেব ঝাঁপিয়ে পড়বে। সে জানে, তার উপর নির্ভর করা যাবে সর্ব অবস্থায়।

'আমি···আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে! এ যে অসম্ভব!'

'কি অসম্ভব?'

'নাসিম খুন করেছে—এটা হতেই পারে না। এটা মিথ্যা,' কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল শাহানারা।

'তুমি ওকে, মানে নাসিমকে কতটা চেন?'

কান্নাভেজা মুখটাতেও একরাশ আবীর ছড়িয়ে পড়ল শাহানারার। সে অস্ফুটকণ্ঠে বলল, 'আমি চিনি···ওকে আমি চিনি। এ হতে পারে না। নাসিম খুন করতে পারে না!' পাগলের মত মাথা নাড়তে লাগল শাহানারা।

কুয়াশা শাহানারাকে সরোদ বাজানো শেখালেও ওর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কখনও কোন খোঁজ-খবর নেয়নি। তাই সে সম্পর্কে তার আদৌ কোন ধারণা ছিল না। এখন সে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। নাসিমের প্রতি শাহানারার টানটা হৃদয়ের।

'স্থির হও তুমি, শাহানারা। এখন পাগলামি করলে তো হবে না। আজকের কাগজে মামলার যেটুকু বিবরণ বেরিয়েছে তাতে তো তাকে হত্যাকারী বলে মনে হয়। কিন্তু এ তো সবে শুরু। সত্যিই নিরপরাধ হলে সে নিশ্চয়ই মুক্তি পাবে।'

'নাসিম নির্দোষ।'

'এটা তো তোমার রায়। আদালতের রায় এখনও বেরোয়নি।'

'তাই বলে ওকে জামিন দেবে না কেন?'

'অভিযোগটা যেমন গুরুতর তাতে জামিন আশা করা যায় না।'

'কিন্তু অভিযোগটা যে মিথ্যে।'

এ সম্পর্কে শাহানারার সাথে আলোচনা করা যে বাতুলতা, তা বুঝতে কুয়াশার অসুবিধা হল না। হৃদয়ের আদালত যুক্তি প্রমাণ বা আইনের ধার ধারে না। তার রায় বড্ড একপেশে। মনে মনে কষ্ট অনুভব করল সে তার প্রিয় ছাত্রীটির জন্যে। চুপ করে রইল সে।

এক সময় শাহানারা তার বিশাল দুটো চোখ কুয়াশার দিকে মেলে ধরে বলল, 'মাস্টার সাহেব, পারেন···আপনি পারেন নাসিমকে এই মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলার কবল থেকে উদ্ধার করতে,' করুণকণ্ঠে আর্তি জানাল সে।

'আমি!'

'হ্যাঁ, আপনি। আমার মন বলছে, আপনিই পারেন ওকে বাঁচাতে।'

কুয়াশা হাসল। সে বলল, 'দেখি, ভয়ের কিছু নেই। যদি সে নির্দোষ হয় তাহলে সে শাস্তি পাবে না। এদেশের আদালতে বিনা অপরাধে কারও শাস্তি হয় বলে শুনিনি। তাছাড়া যতটা জানি নাসিমরা টাকা ঢালবে বিস্তর। দরকার হলে কমনওয়েলথের সবচেয়ে ভাল উকিল নিয়ে আসবে। ওর চাচা সাইফুল আজিম সাহেব দেশের অন্যতম সেরা ধনী। তিনি তো ব্যাচেলার মানুষ। ছোট ভাই ড. খুরশীদ আজিমও নিঃসন্তান। নাসিমই ওঁদের বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। তার জন্যে ওঁরা দরকার হলে আকাশে-বাতাসে আলোড়ন সৃষ্টি করবে। ওঁদের দরকার হল একজন ভাল উকিলের। আমি উকিল নই।'

কুয়াশার কথায় শাহানারা অভিভূত হল না। সে বলল, 'আপনি তো তাহলে ওঁদেরকে চেনেনই। কিন্তু যা ভাবছেন তা হবার নয়। বুড়ো আজিম সাহেব অসুস্থ, শয্যাশায়ী, এখন-তখন অবস্থা। ড. আজিম চট্টগ্রামের কোন গভীর জঙ্গলে গেছেন গবেষণা করতে। তিনি এ জগতের মানুষ নন। দুনিয়ায় কার কি হল তার চাইতে অতীতের মানুষের কোথায় কি হয়েছিল সে ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ প্রবল।'

কুয়াশা তা জানত। ড. আজিম এক খ্যাপাটে এথনোলজিস্ট। মানুষের অতীত গোত্র-পরিচিতি সম্পর্কেই তাঁর আগ্রহ প্রবল, তবে নিজের বংশের একমাত্র নিধির মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কে তিনি যে উদাসীন থাকবেন একথাও ঠিক নয়। শাহানারার কথায় সে প্রতিবাদ করল না। অবশ্য বুড়ো আজিম সাহেবের সাথে দীর্ঘদিন তার যোগাযোগ নেই, তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কেও কুয়াশা ওয়াকেফহাল নয়।

'কিন্তু লোক তো ওদের আরও আছে। ওদের ইণ্ডাস্ট্রির এক্সিকিউটিভরা রয়েছেন না?'

'তারা আর কি করবে? এক আছেন মিসেস আজিম। কিন্তু উনি তো নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। আপনি দয়া করে একটা কাজ করুন না, যদি কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভকে জানা থাকে তাহলে তাকে বলুন না নাসিমের হয়ে সত্য ঘটনা উদ্‌ঘাটন করতে।

'উদঘাটন করতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে নাসিমই এই খুন করেছে, তাহলে?'

'তাহলে, অপরাধ যদি সে করেই থাকে তাহলে অবশ্যই তার শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু আমার মন বলছে, নাসিম নিরপরাধ। আমি···আমি জানি সে নিরপরাধ। আপনি কি আমার জন্যে, মানে নাসিমের জন্যে কিছুই করতে পারেন না? আমার মনে হয়, আপনি নাসিমকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারেন।'

চোখ বুজল কুয়াশা। সে বলল, 'শাহানারা, তোমার জন্যে সত্যি বলতে কি আমি অনেক কিছুই করতে পারি, এবং করবও। নাসিম যদি নিরপরাধ হয়ে থাকে তাহলে প্রমাণ করার জন্যে সর্ব প্রকার চেষ্টাও করতে পারি, তাতে সাফল্য নিশ্চয়ই আসবে। তবু তোমাকে আমি বলব, শহীদ খানের সাথে একবার দেখা কর।'

'শহীদ খান! কে তিনি?'

'উনি একজন সৌখিন গোয়েন্দা। তিনিই তোমাকে সবেচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারবেন।'

'কিন্তু টাকা দিতে হবে যে? আপনি জানেন তো আমাদের অবস্থা। হোটেলের রিসেপশনিস্টের চাকরি করি। ক'টা টাকাই বা পাই। অথচ গোটা সংসার আমাকেই চালাতে হয়,' হতাশা প্রকাশ করল শাহানারা।

'লাগবে না। উনি টাকা-পয়সা নেন না। তাছাড়া একান্তই যদি চায় তাহলে বোল, মাস্টার সাহেব পাঠিয়েছে।'

'আপনাকে চেনেন উনি?' উত্তেজিত হল শাহানারা।

'চেনেন বৈকি।'

'তাহলে আপনিও চলুন। এখনি যাব আমি।'

'আমার একটু অসুবিধা আছে। আমি এখন চলি।'

কুয়শার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে শাহানারা তখুনি চলে গেল শহীদ খানের

সাথে দেখা করতে।

দুই

কথা ছিল রাঙামাটি যাবে শহীদ ও কামাল। মহুয়া ও লীনাও সঙ্গী হবে। ঠিকঠাক সব ব্যবস্থাই। বাঁধা-ছাঁদাও শেষ। টিকেটও কাটা হয়েছে প্লেনের। একই ফ্লাইটের চারটে টিকেট পাওয়া যায়নি। এমন কি এক দিনেরও নয়। ঢাকা চট্টগ্রাম রুটে ভিড় যা বাড়ছে! কামাল আজ তাই সকালের ফ্লাইটে চলে গেছে। লীনা ও মহুয়া যাবে কাল সকালের ফ্লাইটে। শহীদ সেকেণ্ড ফ্লাইটে। কিন্তু পরিকল্পনা যখন করা হয়েছিল তখনই ভাগ্য দেবতা বোধহয় পরিহাস করেছিলেন।

অকস্মাৎ সমস্ত প্রোগ্রাম ভেস্তে গেল।

চট্টগ্রাম থেকে ড. খুরশীদ আজিমের দুরালাপনী আবেদন এর জন্যে দায়ী।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ড্রইংরুমে বসে সিগারেট টানছিল শহীদ। রেকর্ড প্লেয়ারে রবীন্দ্রসঙ্গীত চাপাবে কিনা চিন্তা করছিল লীনা। মহুয়া একটা পুরানো সিনেমা পত্রিকার প্রশ্নোত্তর বিভাগ পড়ছিল মন দিয়ে।

টেলিফোনটা বেজে উঠল এই সময়। বাঁ হাত দিয়ে পত্রিকাটা কোলের উপর চেপে ধরে ডান হাতটা এগিয়ে রিসিভারটা তুলল মহুয়া।

'হ্যালো?'

এটা কি শহীদ খানের বাসা?'

'জ্বি।'

'উনি আছেন কি?'

'ধরুন আপনি। ওঁকে দিচ্ছি,' রিসিভারটা শহীদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ওগো, তোমার ফোন।'

'হ্যালো। শহীদ বলছি।'

'আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছি। আমার নাম খুরশীদ আজিম।' ব্যগ্র একটা কণ্ঠস্বর কানে এল শহীদের। সে কিছু বলবার আগেই আবার শোনা গেল, 'চিনতে পারছেন না নিশ্চয়ই। আজকের কাগজ পড়েছেন? খুন ও জখম করার দায়ে নাসিমুল আজিম নামে এক ইয়ংম্যানকে গ্রেফতার করা হয়েছে কাল সকালে। আদালত জামিন দেয়নি। আজকের কাগজে আছে খবরটা। আমি হচ্ছি, নাসিমের চাচা খুরশীদ আজিম।'

'ও, আপনি তাহলে আজিম কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজের মালিক সাইফুল আজিমের ছোট ভাই ড. খুরশীদ আজিম, এথনোলজিস্ট?'

'জ্বি, হ্যাঁ, জ্বি-হ্যাঁ।'

'তা বলুন, কি ব্যাপার?'

'ঐ মামলার খবরটা পড়েছেন আপনি?' সাগ্রহে শুধালেন ড. আজিম।

খবরটা পড়া ছিল শহীদের। সে জানাল সেকথা।

'আমার বিশ্বাস, নাসিম নিরপরাধ। পুলিস ভুলক্রমে তাকে গ্রেফতার করেছে। অর্থাৎ পুলিসকে ভুল পথে চালানো হয়েছে। আমাদের ইণ্ডাস্ট্রিজের শত্রুর শেষ নেই। তাদেরই কেউ চক্রান্ত করে নাসিমকে ফাঁসাচ্ছে। নাসিমই আমাদের সবকিছুর একমাত্র উত্তরাধিকারী। দাদা ব্যাচেলার, আমি নিঃসন্তান। পিতৃমাতৃহীন নাসিমকে আমরাই মানুষ করেছি। বলতে গেলে আমারই মরহুমা স্ত্রী ওকে স্নেহ দিয়ে বাপ-মায়ের অভাব পূরণ করেছেন। নাসিমকে আমি জানি, ওর দ্বারা এমন পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড আদৌ সম্ভব নয়। এ মামলা সাজানো। নাসিমকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে,' উত্তেজিত শোনাল বক্তার কণ্ঠস্বর।

'আপনি কি নির্দিষ্ট ভাবে কাউকে সন্দেহ করেন?'

'সেটা অবশ্য পারছিনে। এ ব্যাপারে কিছু বরং দাদা বলতে পারেন। কিন্তু তিনি মাস ছয়েক ধরে গুরুতর অসুস্থ। খবরটা আদৌ তাঁর কানে গেছে কিনা বলতে পারছিনে। জানলে উনি মারাত্মক শক পাবেন। তাতে আরও ক্ষতি হতে পারে তাঁর পক্ষে। অতটা ঝুঁকি আমি নিতে চাই না। অথচ আমি এমন একটা সমস্যায় পড়েছি যে, আপাতত কোন অবস্থাতেই ঢাকা যেতে পারছিনে। আপনি যদি দয়া করে আমার নির্দোষ ভাইপোকে বাঁচাতে পারেন তাহলে আমাদের অসামান্য উপকার হয়। টাকার কথা ভাববেন না, যত লাগে আমি দেব।'

'টাকার প্রশ্ন নয়। কথা হচ্ছে ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। সেক্ষেত্রে বরং আমার বদলে একজন ফৌজদারি মামলায় অভিজ্ঞ উকিল নিয়োগ করলে ভাল হয়। তাছাড়া আপনাদের ধারণা যাই হোক, আমার মনে হয়, আপনার ভাইপোর বিরুদ্ধে পুলিসের হাতে অত্যন্ত জোরালো ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে।'

'তা থাক, সে-সব সাজানো। সেগুলো আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া উকিল একটা কেন, এক ডজন লাগাতে পারি। কিন্তু যুক্তি-তর্কের বন্যা বইয়ে দেবার চাইতে তথ্য-প্রমাণ বড় কথা। ফৌজদারী আইনের ফাঁক খুঁজে নাসিমকে বাঁচাতে চাই না, যদি সে যথার্থই অপরাধী হয়। সে যে অপরাধী নয় সেটাই তথ্য-প্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আসল সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই আমরা। তাই আপনাকে আমার দরকার।'

যুক্তিটা উড়িয়ে দিতে পারল না শহীদ। অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে রাজি হয়ে গেল। সে বলল, 'বেশ আমি চেষ্টা করব। দায়িত্ব নিলাম।'

'উহ্, ভাই, আমাকে বাঁচালেন। কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব!'

'সেটা এখন নয়, কাজের শেষে। যদি সাফল্য লাভ করতে পারি তবেই,' হাসল শহীদ।

'টাকা-পয়সার ব্যাপার?'

'ওসব প্রশ্ন এখন তুলবেন না।'

'আমার পক্ষে এখন ঢাকা ফেরা সম্ভব হচ্ছে না। একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রয়োজনে আমাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম অঞ্চলে যেতে হচ্ছে। বৃষ্টি শুরু হবার আগেই ফিরতে হবে। আজকেই আমি সেখানে যাচ্ছি। আমার পক্ষ থেকে যা করার দরকার তা করবেন আমার স্ত্রী··· ।'

'স্ত্রী!'

'জ্বি, ইনি আমার দ্বিতীয় স্ত্রী।'

'ওহ, আচ্ছা।'

'সে হয়ত আজকের ফ্লাইটে অথবা রাতে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পৌছুবে। সকালেই দেখা করবে আপনার সাথে। আপনি এরই মধ্যে দাদার প্রাইভেট সেক্রেটারি মুরাদের সাথে দেখা করতে পারেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় ১০ মার্চের রাতে অর্থাৎ যে রাতে ঐ ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটেছে সেই রাতের মেলেই আমি চট্টগ্রাম এসেছি। যা হোক, এখন আমার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা আপনার মাথায় চাপিয়ে দিলাম।'

'বেশ, এখন রাখি?'

'আচ্ছা, উইশ ইউ এভরি সাকসেস।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখল শহীদ।

মহুয়া কান পেতে ফোনের আলাপন শুনছিল। কাথাবার্তার ধরনে মহুয়ার বুঝতে দেরি হল না যে, রাঙামাটি যাওয়াটা মাঠে মারা যেতে আর বাকি নেই। সে একটু শঙ্কিত হয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কি হল?'

'কেয়া আর হোয়েগা। যাওয়া নেহী হোগা, আপাতত।'

'বিনি পয়সার চাকরি জুটেছে বুঝি বনের মোষ তাড়াবার?'

'স্বভাবতই। আজকের কাগজে একটা খুনের মামলার খবর আছে পড়েছ?'

মাথা নাড়ল মহুয়া। 'নাসিমুল আজিম নামে এক ছোকরা—সেই মামলাটা তো কুলী হোসেন না কে···?'

'হ্যাঁ, চাচা ড. খুরশীদ আজিম চট্টগ্রাম থেকে ফোন করেছিলেন। ওঁর ধারণা, ছোকরা নাকি নির্দোষ। মিথ্যা মামলায় তাকে ফাঁসানো হচ্ছে। তাকে বাঁচাতেই হবে। অগত্যা—। মহুয়া, আমি এখুনি বেরোব। মি. সিম্পসনের অফিসের দিকে যাব।'

'তা আর বেরোবে না! এমন পবিত্র একটা কর্তব্য যখন তোমার স্কন্ধেই ন্যস্ত হয়েছে। তা চা খেয়ে বেরোবে না কি?'

'ঠাকরুন যদি দয়া করেন তাহলে।'

'থাক থাক, আর দেবী বন্দনায় কাজ নেই।'

শহীদের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে তরলকণ্ঠে বলল মহুয়া, 'গফুর সাহেবকে চা

দিতে বলেছি। আপনি কপড়টা বদলে নিন এই ফাঁকে।' শহীদ শোবার ঘরের দিকে এগোল।

মি. সিম্পসন অফিসেই ছিলেন। শহীদকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার শহীদ, হঠাৎ এদিকে? পথ ভুলে নাকি? অনেকদিন তোমার সাক্ষাৎ পাইনি. বস।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল শহীদ। সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'একটা কেসের কানেকশনে আপনার কাছে এসেছি।'

'তাতে আর সন্দেহের কি আছে?' হাল্কা সুরে ললেন মি. সিম্পস্ন, 'নেহায়েত দেশে খুন-খারাবি হয় বলেই তোমার দেখা-সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে মেলে। তা কোন কেস, বল তো?'

'কুলী হোসেন মার্ডার কেস। আজিম ইণ্ডাস্ট্রির হবু মালিক নাসিমুল আজিম যে মামলার আসামী। কাল জামিনের আবেদন না-মঞ্জুর হয়েছে। আজকের কাগজে দেখলাম।'

'কাগজে দেখেই চলে এসেছ একেবারে?'

'না না, তা নয়। আসামীর চাচা ড. আজিম। চেনেন নিশ্চয়ই এথনোলজিস্ট ড. আজিমকে?'

'চিনি বৈকি?'

'উনি চট্টগ্রাম থেকে ট্রাঙ্কল করে খুব করে অনুরোধ জানালেন। ওঁর ধারণা, এটা একটা বানোয়াট মামলা। ওদের শত্রুদের কারসাজি।'

'আমার ভাইপো যদি আসামী হত তাহলে আমিও তাই বলতাম।' হাসলেন মি. সিম্পসন। 'ক্লিয়ার কেস। কোন জটিলতা নেই। কোন রকম চক্রান্তের ছিটেফোঁটা আছে বলেও মনে হয় না। চার্জ-শীটও প্রায় তৈরি হয়ে এল বলে। খুন যে আসামীই করেছে তাতে সন্দেহের আদৌ অবকাশ নেই। তবে হ্যাঁ, আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার তো আর কেড়ে নেওয়া যায় না।'

সিগারেটে টান দিয়ে শহীদ বলল, 'ঘটনা সম্পর্কে একটু আলোকপাত করুন। আর যদি ফাইলটা দেখাবার ব্যবস্থা করেন...।'

'নিশ্চয়ই।'

ঘন্টা টিপতেই একজন কনস্টেবল ঢুকল। মি. সিম্পসন তাকে কুলী হোসেন হত্যা মামলার ফাইলটা এনে দেবার নির্দেশ দিলেন। কনস্টেবল্ চলে গেল।

শহীদের উদ্দেশে মি. সিম্পসন বললেন, 'ঠিক কোন জায়গাতে আসামী কুলী হোসেনকে খুন করেছে তা এখনও জানা যায়নি। জিজ্ঞাসাবাদ এখনও চলছে। লোকটার মাথায় গুলি করা হয়েছে। তারপর যেভাবেই হোক লোকটাকে রাস্তার উপরে ফেলে গাড়ি চালিয়ে গেছে তার উপর দিয়ে। মাথার করোটি পর্যন্ত অনেকটা

বিধ্বস্ত হয়েছে। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে লাশটা। লাশ যাতে সনাক্ত না হয় তার জন্যেই এটা করেছে। অত্যন্ত নৃশংসভাবে খুন হয়েছে কুলী হোসেন।'

'তারপর?'

'নিতান্ত আকস্মিকভাবেই কনস্টেবলটা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। গাড়িটাকে বারবার এগোতে এবং পিছোতে দেখে তার সন্দেহ হয়। গোড়াতে অবশ্য তার ধারণা ছিল, গাড়ির চালক বোধহয় মাতাল হয়েছিল। সে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে চালকের কাণ্ডকারখানা দেখে নম্বরটা টুকে নিয়ে হুইসেল বাজিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটার ভিতর থেকে তাকে গুলি করা হয়। গুলিটা তার ডান হাতের মাংস ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। অন্য দু'জন পুলিস-পেট্রল কাছেই ছিল। তারা এসে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। শেষ রাতের দিকে তার জ্ঞান ফিরে আসে। তার স্টেটমেন্টের উপর ভিত্তি করে গাড়িটাকে খুঁজে বের করা হয়। গাড়ির মালিক নাসিমুল আজিমকেও গ্রেফতার করা হয়।'

শহীদ বলল, 'লাশটাকে এমনভাবে লেপটে-চেপটে যাবার পরও সনাক্ত করা হল কিভাবে?'

'লোকটার বাঁ হাতটা তখনও অক্ষত ছিল। তাতে একটা তাবিজ ছিল। তার ভিতরে উর্দুতে একটা কাগজে লেখা 'কুলী হোসেন'। বুক-পকেটে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া গেছে কুলী হোসেনের নামে। পেশায় লোকটা ছিল ট্যাক্সি-ড্রাইভার। আসলে কয়েকটা ট্যাক্সির মালিক সে। কিন্তু তার বড় পরিচয় হল, সে হচ্ছে এক দুর্দান্ত গুণ্ডাদলের সরদার। পুরানো ঢাকায় তার একাধিক জুয়ার আড্ডা আছে। লোকটার রেকর্ড খুবই খারাপ। কয়েকটা হত্যা মামলারও আসামী সে। কয়েক বছর ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে পুলিস তার টিকিরও সন্ধান পাচ্ছিল না।'

'আশ্চর্য, এমন একটা দুর্দান্ত লোকের সাথে নাসিমের যোগাযোগ ঘটল কি করে!' বিস্ময় প্রকাশ করল শহীদ।

'তা অবশ্য আসামী নিজেই স্বীকার করেছে। আলাপ হয়েছিল জুয়ার টেবিলেই। আসামী নিয়মিত জুয়া খেলত কুলী হোসেনের আড্ডায় এবং সে তিরিশ হাজার টাকা ধার করেছিল তার কাছ থেকে, পুরো টাকাটাই হেরেছে। এসব আসামী নিজেই স্বীকার করেছে। কুলী হোসেন অনেকদিন ধরেই ফেরত চাচ্ছিল টাকাটা এবং সে আসামীকে আগামী ১০ মার্চের মধ্যে অর্থাৎ আগামীকালের মধ্যে টাকাটা শোধ দেবার জন্যে চূড়ান্ত নোটিস দিয়েছিল মাস দুয়েক আগে। না দিলে ঘটনাটা সাইফুল আজিম সাহেবের কানে যাবে বলেও শাসিয়ে দিয়েছিল সে। ওরা ভয়ঙ্কর লোক।'

'কিন্তু এমন আর কি ক্ষতি হত সাইফুল আজিম সাহেবের কানে গেলে?' শহীদ প্রশ্ন করল।

'মারাত্মক ক্ষতি হত সেক্ষেত্রেও।'

'কি রকম?'

'আজিম ইণ্ডাস্ট্রির মালিক হবার সম্ভাবনা আসামীর যতই থাক তাতে ওর আইনতঃ এতটুকু দাবি নেই।'

'কেন?'

'আজিম ইণ্ডাস্ট্রির মালিক ছিলেন নাসিমের দাদু আজিম আহমদ সাহেব। তাঁর জীবদ্দশাতেই নাসিমের বাবা মারা যান। ফলে সম্পত্তিতে নাসিমের কোন মালিকানা নেই।'

'কিন্তু...।'

ইশারা করে তাকে থামালেন মি. সিম্পসন। বললেন, 'অবশ্য সাইফুল আজিম ও ড. আজিম দু'জনই নিঃসন্তান। তাই ওঁরা স্বভাবতই সম্পত্তিটা নাসিমকেই লিখে দেবেন। কিন্তু বুড়ো আজিম সাহেব গোঁড়া পিউরিটান। কোনরকম নোংরামি উনি সইতে পারেন না। জুয়ার কথা শুনলে তাঁর দেহে আগুন ধরে যায়। নাসিম জুয়া খেলছে জানতে পারলে উনি টাকা তো দেবেনই না, উপরন্তু তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন।'

'এসব কথা নাসিম স্বীকার করেছে?'

'জিজ্ঞাসাবাদের মুখে স্বীকার না করে পারেনি।'

শহীদ বলল, 'তারপর?'

'এটুকুই সে স্বীকার করেছে। এর বেশি নয়।'

'কিন্তু আপনার যে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার কথা সেই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন।'

'তোমার লজিক কি বলে?' টিপ্পনী কাটলেন মি. সিম্পসন।

'আপাতত কিছুই বলে না। আমি যেটুকু জেনেছি সেটুকু অতি নগণ্য। কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সুযোগ আমার এখনও আসেনি।'

'কিন্তু পুলিসের ব্যাপারটা স্বতন্ত্র। কনস্টেবলটাকে জখম করা হয়েছে .২২ অটোমেটিকের গুলিতে। লাশের মাথায় যে গুলি পাওয়া গেছে সেটাও .২২ অটোমেটিকের। নাসিমের আগ্নেয়াস্ত্রটাও .২২ অটোমেটিক। সেটা থেকেও দুটো গুলি ব্যবহার করা হয়েছে এবং কেমিক্যাল এনালিসিসে জানা গেছে যে, মোটামুটিভাবে ঐ খুনোখুনির সময় অর্থাৎ ১০ মার্চের রাত দশটা থেকেই ১১ মার্চের রাত দুটো এই সময়ের মধ্যেই অটোমেটিকটা শেষবারের মত ব্যবহার করা হয়েছে। আরও কিছু জানতে চাও?' একটু উত্তেজিত হলেন মি. সিম্পসন।

'বলুন না, আরও কিছু জানা থাকলে?'

'নাসিমের গাড়ির সামনের উইং-এ রক্তের চিহ্ন পাওয়া গেছে।'

'এবং?'

'এবং বলতে ভুলে গেছি, .২২ অটোমেটিকটাতে শুধু মাত্র আসামীরই হাতের ছাপ পাওয়া গেছে।'

'এ সম্পর্কে নাসিমের বক্তব্য কি?'

'একটাই, সে কিছু জানে না। এবসলুটলি নাথিং।'

'কোন অ্যালিবাই আছে তার?'

'ঘটনা যখন ঘটেছে তখন সে নাকি ঘুমোচ্ছিল। আসামী বলেছে, সন্ধায় হোটেল সোনিয়াতে একটা বিদায় সম্বর্ধনা ছিল ড. আজিমের বিদায় উপলক্ষ্যে। আয়োজন করেছিলেন মিসেস আফরোজা রহমান নামে এক ভদ্রমহিলা। উনি ড. আজিমের প্রাক্তন ছাত্রী। ভদ্রমহিলা বিধবা। নাসিমও সেই পার্টিতে ছিল। ড. আজিম পার্টি থেকে সরাসরি স্টেশনে চলে যান। সঙ্গে যান তাঁর স্ত্রী আর বুড়ো আজিম সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি আবু মুরাদ সাহেব। মুরাদ সাহেবও সেই রাতেই ময়মনসিংহ চলে যান। নাসিম গিয়েছিল তার বড় চাচার কাছে। সেখান থেকে সে চলে যায় জুয়ার আড্ডায়। সেখানে কিছুক্ষণ পরেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু বাসায় না গিয়ে ফিরে যায় হোটেল সোনিয়াতে। সেখানে তার অসুস্থতা না কমে বরং আরও বেড়ে যায়। তখন সে বাসায় চলে যায়।'

'তখন ক'টা বেজেছিল?'

'নাসিমের বক্তব্য রাত তখন এগারটা। কিন্তু আহত কনস্টেবল বলেছে যে, তাকে যখন গুলি করা হয় তখন প্রায় বারটা হবে। তার ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এগারটা সাতান্ন মিনিটে, সম্ভবত গুলি খেয়ে পড়ে যাবার ফলেই।'

এতক্ষণ ধরে শহীদ অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিল। কোন কূলকিনারা পাচ্ছিল না। হঠাৎ সে যেন ঘন অন্ধকারের মধ্যে একটু আলোর রেখা দেখতে পেল। তাই একটু ঔৎসুক্য নিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, হোটেল সোনিয়াটা তো আজিম গ্রুপেরই প্রতিষ্ঠান?'

'হ্যাঁ, ছোট আজিম সাহেব অর্থাৎ ড. আজিমই ওটার মালিক। স্ত্রীকে লিখে দিয়েছিলেন ওটা।'

'ভাল কথা, সেই ভদ্রমহিলা মানে মিসেস আফরোজা রহমানের সাথে পুলিস যোগাযোগ করেছিল নাকি?'

'না, তাঁর সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না।'

'সে কি! এটা যে অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে! পুরুষ মানুষ না হয় পালিয়ে বেড়ায়। তা ভদ্রমহিলার এমন গা-ঢাকা দেবার অর্থ কি?'

'সেটা তো বুঝতে পারছিনে। হয়ত আদালতে সাক্ষ্যটাক্ষ্য দিতে হতে পারে এই কথা ভেবে আপাতত সরে পড়েছেন।'

'তার মানে, ভদ্রমহিলা এমন কিছু জানেন যা তিনি প্রকাশ করতে রাজি নন। পাছে পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে তাঁর মুখ থেকে তা বেরিয়ে যায়, এই তাঁর ভয়।'

'আমাদেরও তাই বিশ্বাস।'

'আর একটা কথা মি. সিম্পসন, কুলী হোসেনের আড্ডার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল?'

'পুলিস নাসিমের কাছে ঠিকানা পেয়ে হানা দিয়েছিল, কিন্তু তার আগেই সবাই পালিয়ে গেছে।'

'নাসিমের গাড়ির চাবিটা কোথায় পাওয়া গেছে?'

'শ্রীমানের প্যান্টের পকেটেই চাবিটা ছিল। যে প্যান্ট সে ঘটনার রাতে পরেছিল সেটাতেই।'

আর কোন প্রশ্ন করল না শহীদ। একজন কেরানি অনেক আগেই আকাঙ্ক্ষিত ফাইলটা রেখে গিয়েছিল। সেটায় চোখ বুলিয়ে গেল সে। নতুন তেমন কিছু নেই। তবে একটা ব্যাপার জানা গেল নাসিমের স্টেটমেন্ট থেকে। তা হল, সে তার চাচার সম্মানে দেওয়া পার্টিতে তার টাকার সমস্যার কথাটা মিসেস আফরোজা রহমান ও মিসেস আজিম উভয়কেই বলেছিল এবং তাকে ত্রিরিশ হাজার টাকা পাইয়ে দেবার জন্যে ড. আজিমের কাছে তার হয়ে অনুরোধ করতে বলেছিল।

ফাইলটা রেখে উঠে দাঁড়াল শহীদ।

মি. সিম্পসন জিজ্ঞেস করলেন, 'কি মনে হচ্ছে?'

'এখনও বলবার মত কিছু মনে হচ্ছে না। আপনি নাসিমের সাথে আমার একটা ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করে দিন।'

'বেশ তো, কবে দেখা করতে চাও?'

'সময়টা আপনাকে পরে জানাব। আগে অনুমতিটা নিয়ে নিন।'

'তথাস্তু।'

তিন

বাসায় ফিরল শহীদ সন্ধ্যায়। বারান্দায় মহুয়া দাঁড়িয়েছিল। সে নেমে এসে গাড়ির জানালার কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'অবরোধবাসিনী এক রমণী তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'তার মানে?'

'বোরখাবৃতা এক সুন্দরী তোমার সাক্ষাৎ মানসে অপেক্ষা করছেন। আপাতত ঠাঁই নিয়েছে ড্রইংরুমে। কে জানে, দু'দিন পরে অন্দরমহলে প্রবেশ করবে কিনা।' কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মহুয়া।

শহীদ হেসে বলল, 'কি যাচনা সে বিম্বোষ্ঠির?'

'আপাতত আর্যপুত্রের সাথে চারচোখের মিলন। তার চিত্তহরণ করুন, দেব।'

'কিন্তু আমি তো প্রস্তুত নই, ভদ্রে। উপযুক্ত সজ্জা কোথায়?'

'আপাতত তোমার শ্রীঅঙ্গই তোমার ভূষণ। শুধু প্রয়োজন বাদ্যবৃন্দসহ

সঙ্গীতসুধার।'

'কি সে সঙ্গীত?'

'খোল, অবগুণ্ঠন খোল।'

'বাপস, বল কি, তোমার সামনেও অবগুণ্ঠন ত্যাগ করেনি!'

'তা যদি না করবে তাহলে তার সৌন্দর্য সম্পর্কে আমার ভূয়োদর্শন হবে কি করে? চল এবার তিলোত্তমা দর্শনে।'

লীনার সাথে গল্প করছিল এক সুন্দরী তরুণী। বোরখাবৃতাই, শুধু নেকাবটা সরিয়ে ফেলেছে। বয়স বেশি নয়। বিশে পা দিয়েছে সবেমাত্র। পাতলা লম্বা মুখটা। চোখ, মুখ, নাক, সব মিলিয়ে সুশ্রী। তবে চেহারায় উদ্বেগ ও বিষাদের ছাপ। দৃষ্টি ঈষৎ ভীত।

শহীদকে দেখে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা।

শহীদ বলল, 'বসুন।'

লীনা পরিচয় করিয়ে দিল। 'শাহানারা ইমাম। হোটেল সোনিয়ার রিসেপশনিস্ট। উনিই আমার দাদা শহীদ খান।'

শাহানারা বসল। মহুয়া ও শহীদও বসল।

'কি মনে করে?'

লীনাই জবাব দিল শাহানারার হয়ে, 'সেই একই ঘটনা, দাদা, কুলী হোসেন মার্ডার কেস। উনি আসামী নাসিমকে চেনেন। ওঁর—ওঁর পরিচিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বলতে পার।'

মেয়েটি মুখ খুলল এবার, 'নাসিমের বড় বিপদ! অথচ আমি জানি, সে নির্দোষ। ভাগ্যের পরিহাসে সে আজ খুনের আসামী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে। আপনাকে তাই অনুরোধ জানাতে এসেছিলাম, যদি তার নির্দোষিতা প্রমাণে কোনরকম সাহায্য করতে পারেন। অবশ্য এসে শুনলাম, ড. আজিজ নাকি এর আগেই আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছেন। আর আপনি তাতে রাজিও হয়েছেন। তবু আমার তরফ থেকে আপনাকে আমিও ঐ অনুরোধ জানাতে চাই।'

'বেশ তো, আপনার অনুরোধও আমি পালন করতে চেষ্টা করব সেই সঙ্গে।' হেসে বলল শহীদ।

'আমার মাস্টার সাহেবও বললেন আপনার কাছে আসতে। উনি বলেছিলেন, আপনি রাজি হবেন।'

'মাস্টার সাহেব কে?'

'ওঁকে চেনেন না আপনি! উনি তো বললেন, আপনি ওঁকে চেনেন!'

অবাক হল শাহানারা।

'নাম বললে চিনব আশা করি।'

'মনসুর আলী। আমাকে সরোদ বাজানো শেখান।'

'দাদা!' বিস্ময় প্রকাশ করল মহুয়া। 'দাদা আপনাকে সরোদ শেখান!'

'আপনার ভাই?'

'কুয়াশা।'

'কুয়াশা? তার মানে!' অবাক হল শাহানারা।

হাসল শহীদ। 'আপনি জানেন না তাহলে। কুয়াশার নাম শুনেছেন। পুলিসের নথি-পত্রে বিরাট করে যার নাম লেখা।'

'নাম শুনেছি।'

'তিনিই আপনাকে সরোদ শেখান?'

'সে কি! আ···!' বিস্ময়ে বাকহীন হয়ে গেল শাহানারা।

লীনা হাসছিল। সে বলল, 'আপনি চিনতে পারেননি, এই তো? সেটা অস্বাভাবিক নয়।'

শাহানারার মন থেকে তবু সংশয় দূর হল না। সে ধীরে ধীরে বলল, 'আশ্চর্য! আমার কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। একটা বছর ধরে উনি আমাকে সরোদ শেখাচ্ছেন অথচ উনিই যে কুয়াশা তা কোনদিন আমি কল্পনাও করিনি।'

'আপনি কি এ ব্যাপারে কুয়াশার, মানে আপনার মাস্টার সাহেবের সাথে কোন আলাপ করেছেন?'

'আমি ওঁর সাহায্য চেয়েছিলাম। উনি এমন একজন লোক, বিপদে যাকে ভরসা করা যেতে পারে। উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যতটা সম্ভব তিনি আমার—মানে নাসিমের জন্যে করবেন। তবে আপনার সাথে দেখা করতেও বললেন।'

'অবশ্য, কুয়াশা যদি আপনাকে সাহায্য করতে রাজি হয়ে থাকে তাহলে আমার কোন দরকার নেই। তবু আমার পক্ষে যতটা সম্ভব আমি নিশ্চয়ই করব।'

'আপনি এ ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানেন। বলতে গেলে আমি—কিছুই জানি না। কিন্তু এমন একটা ঘটনা জানি যা বললে আপনি বুঝতে পারবেন যে, নাসিম এই ঘটনার সাথে কোনক্রমেই জড়িত নয়।'

শহীদ বলল, 'ঐ ঘটনার দিন সন্ধ্যায় হোটেল সোনিয়ায় একটা চায়ের পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল, আপনি জানেন?'

'জ্বি। ড. আজিমের বিদায় উপলক্ষ্যে মিসেস আফরোজা রহমান একটা পার্টি দিয়েছিলেন।'

'আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন?'

'মিসেস আজিমের নির্দেশে কিছুক্ষণ থাকতে হয়েছিল। হোটেলটা মিসেস আজিমের। ড. আজিম ওঁকে কিনে দিয়েছেন। সুতরাং কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম। তখন আমার ডিউটি ছিল।' গত সপ্তাহে বিকেল দুটো থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ডিউটি ছিল আমার।'

'তাহলে ওদের ছিটেফোটা কথা-বার্তা শুনেছেন নিশ্চয়ই?'

'কিছু কিছু।'

'আমার তদন্তের অনেকটা সুবিধা হতে পারে তাতে।

'তবে আমার পক্ষ থেকে একটা আবেদন আছে।'

'বলুন?'

'আমি যে এই ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছিলাম তা দয়া করে আজিম সাহেবের পরিবারবর্গের কাউকে বলবেন না। আমার সাথে নাসিমের কোনরকম সম্পর্ক প্রকাশ পেলেও মিসেস আজিম ভীষণ অসন্তুষ্ট হবেন। আমি সামান্য রিসেপশনিস্ট। আমাকে ওঁরা মানুষ বলে গণ্য করেন না।'

'বেশ বেশ। তবে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা চেপে যাওয়া সম্ভব না-ও হতে পারে।'

'তখন যা হয় করবেন। নাসিমের স্বার্থটাকে বড় করে দেখবেন।'

শহীদ সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'এখন আমাকে বলুন মিস শাহানারা, নাসিমের যে অপরাধ নেই, আপনার এই বিশ্বাসের হেতু কি? এটা কি অন্ধ বিশ্বাস? নাকি তার চরিত্র সম্পর্কে এটা আপনার অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা, অথবা অন্য কোন কারণ আছে? যা জানেন বা যা আপনার মনে হবে, কিছুই লুকোবেন না। লুকালে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি নাও হতে পারে।'

মেয়েটা একটু ভাবল। তাঁর চেহারায় দ্বিধার ছাপ দেখা গেল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। লীনা ও মহুয়ার দিকে এক নজর চেয়ে সে বলতে লাগলঃ

'এই খুনোখুনির ঘটনা ঘটে গত ১০ ও ১১ মার্চের মাঝখানের রাতে। সেই রাতের কথাই বলছি। পার্টির এক ফাঁকে নাসিম আমাকে বলেছিল, ডিউটির পরে আমি যেন মোড়ে অপেক্ষা করি। সে আমাকে দশটার দিকে বাসায় পৌঁছে দেবে। আমার সাথে তার নাকি জরুরী আলোচনা আছে। (শাহানারার চেহারাটায় লজ্জার ছায়া পড়ল)। দশটায় আমার ডিউটি শেষ। বিকেলে ডিউটি থাকলে আমাদের পাড়ার এক বিশ্বাসী রিকশাওয়ালা সাধারণত আমাকে বাসায় পৌঁছে দেয়। যথাসময়ে রিকশাওয়ালা এল। আমি তাকে বিদায় দিয়ে মোড়ের উপর অপেক্ষা করতে লাগলাম।'

একটু থামল শাহানারা। তারপর আবার বলতে লাগল, 'নাসিম এল সাড়ে দশটায়। আমি আধঘন্টা অপেক্ষা করার পর, সে কি অস্বস্তিকর প্রতীক্ষা! যাই হোক, সে যখন পৌঁছুল তখন তাকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখাচ্ছিল। সে বলল, তার খুব খারাপ লাগছে। আরও বলল, সে প্রত্যেকটা জিনিস দুটো করে দেখছে, মাথাটা ঘুরছে, গা বমি বমি করছে, ড্রাইভ করতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। হাত কাঁপছে তার। ফলে ওকে সরিয়ে দিয়ে আমিই স্টিয়ারিং ধরলাম। সে সিটের কোণে হেলান দিয়ে বসে রইল। একটু পরেই সে বোধহয় চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল। ওর ভারি দেহটা বারবার ঢলে পড়ছিল আমার গায়ের উপর। ড্রাইভ করতে খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। কি করে যে ভারসাম্য রক্ষা করে ড্রাইভ করে ওর বাসায় পৌঁছেছিলাম তা এখন

আমার ভাবতেও ভয় লাগে। বিশ্বাস করুন, সারাটা রাস্তায় কোথাও আমি কাউকে চাপা দিয়েছি বলে মনে পড়ে না। মানুষ তো দূরের কথা, কুকুর বিড়ালও না। তবু বলা যায় না, হয়ত আমি খেয়াল করিনি। হয়ত কেউ চাপা পড়েছিল। তাহলে খুনের দায়ে নাসিমকে না ধরে আমাকে ধরতে হয়। অবশ্য জানি না, নাসিম পুলিসের কাছে আমার কথা কিছু বলেছে কি না।

'কিছুই বলেনি,' শহীদ জানাল। 'জানালে আপনিও এতক্ষণ ফাটকে থাকতেন হত্যার সহযোগিনী হিসেবে। তাছাড়া আমি পুলিসের ফাইল দেখে এসেছি। আপনার নামের কোন উল্লেখ নেই। যে রাস্তায় পুলিস লাশ পেয়েছে আপনি কি সেই রাস্তা ধরেই গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, তাই গিয়েছি বটে।'

'তখন ক'টা হবে।'

'পৌনে এগার, কিংবা আও দু'চার মিনিট বেশি। ওর বাসায় পৌছেছি সম্ভবত পৌনে এগারটায়।'

'বাসাটা কোথায়?'

'গুলশানে ওর ছোট চাচা মানে ড. আজিমের বাসায় থাকে সে। বড় চাচা সাইফুল আজিম সাহেবের বাসায় সে থাকে না। উনি মেজাজী মানুষ। ওঁকে খুব ভয় পায়। পারতপক্ষে তাঁর ধারেও ঘেঁষে না নাসিম।'

'সাইফুল আজিম সাহেবের বাসাটা কোথায়?'

'সেটাও গুলশানে। তবে দুটো বাড়ি দুই প্রান্তে।'

'নাসিমের বাসায় পৌছে কি করলেন?'

'গেট ভেজানো ছিল। সেটা খুলে গাড়ি পোর্টিকোতে নিয়ে রাখলাম। চাকরদের খোঁজ করলাম। কিন্তু কাউকে পেলাম না। মিসেস আজিমকেও না।'

'মিসেস আজিম তো চট্টগ্রামে গিয়েছেন ড. আজিমের সাথে।'

'সেটা অবশ্য তখন আমি জানতাম না, পরে শুনেছি। যাই হোক, নাসিমের পকেট থেকে চাবি নিয়ে ওর রুমের দরজা খুললাম। অনেক কষ্টে ওকে গাড়ি থেকে বের করে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। জুতো-জামা খুলে দিলাম। মশারী ফেলে বাইরে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে জানালা দিয়ে চাবিটা রুমের মধ্যে ছুঁড়ে দিলাম। অনেকটা হেঁটে এসে বাসে চেপে ফিরে এলাম বাসায়। ঐ অবস্থায় কেউ এক ঘন্টার মধ্যে আবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে এবং স্থির মস্তিষ্কে খুন করে লাশ গাড়ি চাপা দিতে পারে একথা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসলে আমি তাকে একেবারে অচৈতন্য অবস্থায় ফেলে রেখে এসেছি।'

'ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পর সন্দেহজনক কিছু দেখেছিলেন?'

'তেমন কিছু মনে পড়ে না।'

'গাড়িটা রেখেছিলেন পোর্টিকোতে তাই না?' শহীদ চিন্তাজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন

করল।
'গাড়িটা আমি রেখে এসেছিলাম পোর্টিকোতেই কিন্তু পুলিস সেটাকে পেয়েছে গ্যারেজে।'
'ভ. ন কথা, নাসিমের সাথে আপনার পরিচয় কত দিনের?'
'বছরখানেকের হবে। তার আগে বিদেশে প'ড়ত সে।'
'আপনি কতদিন আছেন হোটেল সোনিয়ায়?'
'বছর দেড়েক হবে।'
'মিসেস আফরোজা রহমান অর্থাৎ যে ভদ্রমহিলা সেদিন সন্ধ্যায় পার্টির আয়োজন করেছিলেন তাঁকে আপনি চেনেন?'
'দেখেছি কয়েকবার। মাঝে মাঝে হোটেলে আসেন। মিষ্টি হেসে কথাবার্তা বলেন। বড় নরম মানুষ।'
'উনি ড. আজিমের কি হন?'
'রক্তের সম্পর্ক নেই বোধহয়। ড. আজিমের ছাত্রী ছিলেন একদা। উনি বিধবা। উচ্চশিক্ষিতা মহিলা। স্বামী ছিলেন স্থপতি। খুবই স্নেহ করতেন ড. আজিম তাঁকে। হয়ত তাঁকে বিয়েও করতেন তিনি। কিন্তু মাঝখানটায় মিস জোবায়দার সাথে তাঁর আলাপ হয়ে গেল করাচীতে। তাঁকে একেবারে বিয়ে করে নিয়ে এলেন। এটা অবশ্য ড. আজিমের দ্বিতীয় বিয়ে। প্রথম পত্নী বছর পাঁচেক আগে মারা গেছেন। উনিই নাসিমকে মানুষ করেছেন। নিজে ছিলেন মৃতবৎসা। একটা সন্তানও বাঁচেনি।'
'মিসেস জোবায়দা আজিমের দেশ কোথায়?'
'ঢাকাতেই বাড়ি ওঁদের। তবে থাকতেন করাচী। কি নাকি একটা বড় চাকরি করতেন সেখানে। কেউ বলেন, উনি নাকি সিনেমায় অভিনয় করতেন ছোটখাট। চাকরি-বাকরির কথাটা মিথ্যে।'
'নাসিম নিয়মিত জুয়ো খেলত আপনি তা জানতেন?'
'আগে জানতাম না। সে গ্রেফতার হবার পরে শুনেছি।'
'ওর মুখে কুলী হোসেনের নাম কখনও শুনেছেন?'
'না। এ নাম সে কোনদিন আমার সামনে উচ্চারণ করেনি।'
'ইদানীং কি নাসিমের আচরণে কোন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করছেন?'
শাহানারা একটু ভেবে বলল, 'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যেত। কি যেন ভাবত। আমি জিজ্ঞেস করলে অবশ্য হেসে উড়িয়ে দিত। আবার কখনও বলত, 'পুরুষ মানুষকে কত কি ভাবতে হয়।'
'নাসিম টাকার ব্যাপারে আপনার সাথে কখনও আলোচনা করেছে?'
বিষণ্ণ হাসি হাসল শাহানারা। 'টাকার ব্যাপার নিয়ে আমার সাথে আর কি আলোচনা করবে? আমি তো বলতে গেলে নিজেই ভিখারিণী।'

মহুয়া টিপ্পনী কাটল, 'কিন্তু চেহারাটা তো রাজরানীর মত!'

লজ্জা পেল শাহানারা।

বাইরে পথের দিক থেকে অস্পষ্ট ক্রিং ক্রিং শব্দ শোনা গেল। শাহানারা বলল, 'আমি এবার যেতে চাই, শহীদ সাহেব। রিকশা এসে গেছে আমার।'

ব্যস্ত হল শহীদ। 'তাই তো, আপনাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। আসুন তাহলে। দরকার হলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। ভাল কথা, আপনার ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যান।'

ঠিকানাটা বলল শাহানারা। লীনা ওকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিল।

শহীদ বসে বসে চিন্তা করতে ও সিগারেট ধ্বংস করতে লাগল।

মহুয়াও অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে কাটিয়ে দিল। পরে সে বলল, 'ধ্যান করলেই হবে, নাকি খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি করতে হবে?'

সে জবাব দেবার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল।

শহীদ হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলল, 'হ্যালো?... হ্যাঁ, শহীদ বলছি।'

অপর প্রান্ত থেকে একটা দুর্বল কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আমি আজিম ইণ্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাইফুল আজিম বলছি। দয়া করে আমার একটা উপকার করবেন?'

'বলুন?'

'আপনি মনসুরের আত্মীয়? মনসুর মানে কুয়াশা?'

'জ্বি, হ্যাঁ।' ইতস্তত করে বলল শহীদ। আক্রমণটা কোনদিক থেকে আসবে বুঝতে পারল না সে।

'মনসুরকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। সে যদি ঢাকায় থাকে তাহলে এখুনি তাকে দয়া করে একটা খবর দেবেন?' করুণ মিনতি ভেসে এল ফোনে।

'সে ঢাকাতেই আছে। এখুনি খবর দিচ্ছি আমি।'

'আমার ওর সাথে কথা বলা নিতান্তই দরকার, সামনাসামনি হোক বা টেলিফোনে হোক। আমি গুরুতর অসুস্থ। সে যেন অবশ্যই একবার আমার সাথে যোগাযোগ করে। অত্যন্ত বিপদ আমার।'

'আমি খবর দিচ্ছি এখুনি।'

কুয়াশাকে ফোন করল শহীদ। সৌভাগ্যবশত কুয়াশা বাড়িতেই ছিল। সে প্রশ্ন করল, 'কি ব্যাপার? শাহানারা নামে একটা মেয়ে গিয়েছিল তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ, এসেছিল একটু আগে, চলে গেছে। আসলে তার আগেই আমি ঐ ব্যাপারটাতে জড়িয়ে পড়েছি। দুপুরে ড. খুরশীদ আজিম চট্টগ্রাম থেকে ফোন করেছিলেন। তিনি অনুরোধ করলেন। মি. সিম্পসনের কাছে গিয়েছিলাম খোঁজ-খবর নিতে। ওদের হাতে যে সব প্রমাণ আছে সেগুলো অত্যন্ত কনভিন্সিং।'

'শাহানারা কি বলল?'

'সে আমাকে যে ঘটনা বলল তাতে অবশ্য নাসিমকে নিরপরাধী বলেই মনে হয়। তুমিও শুনেছ নিশ্চয়ই?'

'না তো, আমাকে কিছু বলেনি।'

শাহানারার বর্ণিত ঘটনা বিবৃত করল শহীদ।

কুয়াশা বলল, 'আমিও কথা দিয়েছি শাহানারাকে, নির্দোষিতা প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রমাণ সংগ্রহ করব। ইতিমধ্যেই যে দু'একটা তথ্য সংগ্রহ করেছি তা অত্যন্ত চমকপ্রদ। ব্যাপারটা আসলে অত্যন্ত জটিল, এই জট ছাড়ানোর সাধ্য কোন উকিলের নেই। মূল রহস্যটা না জানতে পারলে উকিল আসামীকে সমর্থন করতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়বে। তুমি কি এগোতে পেরেছ কিছুটা?'

'বলতে গেলে তেমন কিছু নয়। কিন্তু শোন, আসল কথাই বলা হয়নি। আজিম ইণ্ডাস্ট্রিজের খোদ মালিক সাইফুল আজিম সাহেব এই মুহূর্তেই তোমার সাথে আলাপ করতে চান। বুড়োকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত মনে হল।'

'আমিও আশঙ্কা করেছিলাম বুড়ো আমাকে জড়াবেন। ভদ্রলোক অনেক ব্যাপারেই আমার ওপর নির্ভর করেন। এই বিপদে আমার খোঁজ করবেন তিনি এটা স্বাভাবিক,' কুয়াশা বলল।

'তুমি এখুনি ওঁর সাথে ফোনে কথা বল। আমি রাখছি।'

আধঘন্টা পরে কুয়াশা শহীদকে ফোন করল।

'বুড়ো আজিম সাহেব ভয়ঙ্কর চটে গেছেন তাঁর ভাইপোর উপর। তিনি যতটুকু খবর পেয়েছেন তাতে তাঁর ধারণা হয়েছে, খুনটা তাঁর ভাইপোই করেছে। একেবারে খেপে গিয়েছেন ভদ্রলোক। গুরুতর অসুস্থ হলেও ভদ্রলোকের নার্ভ অত্যন্ত সবল। আরও চটে গেছেন ছোকরা জুয়াড়ীদের সাথে গিয়ে জুটেছিল বলে।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু তোমাকে ডেকেছিলেন কেন?'

'সম্পত্তিটা উনি ওয়াকফ করতে চান। আমাকে তার অছি হতে হবে। তাছাড়া নাসিমকে কোন ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি কিনা তাও জানতে চাইলেন।'

'নাসিমকে উনি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চান?'

'হ্যাঁ, ওঁর ধারণা হয়েছে, নাসিম অপরাধী হোক আর না হোক ফাঁসীর দড়ি থেকে রেহাই পাবার সম্ভাবনা নেই। আর মামলা কতদিন চলবে কে জানে। ততদিন উনি না-ও বাঁচতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁর এই কারখানা এসটাব্লিশমেন্ট কে পরিচালনা করবে? পাঁচ ভূতে লুটে খাবে। ড. আজিমের উপর তাঁর এতটুকু বিশ্বাস নেই, মিসেস আজিমের নামও শুনতে পারেন না তিনি।'

'কিন্তু যদি নাসিম নিরপরাধী, প্রতিপন্ন হয়, সেক্ষেত্রে?'

'আমি ওঁকে সেই কথাই বলেছি। নাসিম সম্ভবত নিরপরাধ। আমার তাই দৃঢ় বিশ্বাস। মামলাটা ঠিক পথে চালাতে পারলে ওকে বাঁচানো যাবে। ফলে, তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা উচিত হবে না। অনেক করে বুঝিয়েছি। যুক্তিটা তাঁর

বড় একটা পছন্দ হয়েছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া তাঁর ধারণা, নাসিম যদি খালাসও পায় তবু তাকে সম্পত্তি দেওয়া উচিত নয়, কারণ সে হয়ত পুরো সম্পত্তিটাই জুয়া খেলে উড়িয়ে দেবে।'

'অত বড় সম্পত্তি জুয়া খেলে উড়িয়ে দেওয়া যায়?'

'বোধহয় যায় না। তেমন কোন উদাহরণ আমার জানা নেই। যাই হোক, বুড়ো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে একমাস অপেক্ষা করতে রাজি হয়েছেন।'

'একমাস অনেক সময়। এর মধ্যেই মামলাটা শেষ হয়ে যাবে বলে মনে হয়। পুলিস তো চার্জ-শীট প্রায় তৈরি করেই ফেলেছে।'

'হ্যাঁ, আরও একজন ভাল উকিল নিয়োগ করতে বলেছি। ঠিক হয়েছে, আমার বন্ধু ইমদাদ রিজভী নাসিমের পক্ষ সমর্থন করবেন। উনি খুব ভাল উকিল। সত্যি বলতে কি, তাঁর চাইতে ভাল ক্রিমিন্যাল ল-ইয়ার আমার জানা নেই। এখুনি খবর পাঠাচ্ছি তাঁকে।'

'তাহলে তো ভালই হয়। আমারও ধারণা, খুব একজন ভাল উকিল দরকার আসামীর জন্যে।'

প্রসঙ্গ বদলাল কুয়াশা।

'ড. আজিম কি তোমাকে ঠিকানা দিয়েছেন? কোথায় তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে হবে জানো তুমি?'

'ভদ্রলোক এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের পথে। সেখানে কি সব গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকবেন উনি। কামাল চট্টগ্রাম গেছে গতকাল। ওকে বলেছি, প্লাইউড হোটেলে গিয়ে ড. আজিম ও মিসেস আজিমের খোঁজ করতে। ড. আজিম হয়ত কামাল হোটেলে পৌঁছুবার আগেই বেরিয়ে যাবেন। মিসেস আজিমের সাথে তার দেখা হলেও হতে পারে। অবশ্য কাল সকালের মধ্যেই মিসেস আজিম ঢাকা পৌঁছুবেন,' শহীদ জানাল।

'তোমার কথা বলেছি বুড়ো আজিম সাহেবকে। উনি তোমাকে দেখা করতে বলেছেন। সুস্থ থাকলে নিজেই যেতেন। তবে কাল সকালে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি আবু মুরাদ তোমার সাথে দেখা করতে যাবে। যাক, এবার কাজের কথা শোন। পুলিসের দিক থেকে মামলা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। আসলে যারা খুনটা করেছে তারা এতই ধুরন্ধর যে, তাদেরকে সন্দেহ করার মত কোন সূত্রই রাখেনি। বরং যেসব প্রমাণ রেখে গেছে তার সবটাই নাসিমের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এমন কি পুলিসের মনে সামান্যতম বিভ্রান্তি সৃষ্টিরও কোন সুযোগ রাখেনি। এখন আমি শুধু পুলিস নয় খুনীদের মনেও একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চাই। অর্থাৎ পরিস্থিতিটাকে আরও ঘোলাটে করে তুলতে চাই।'

কুয়াশার কথায় শহীদ নিজেই বিভ্রান্ত হল। সে বলল, 'কিছু বুঝতে পারলাম না।'

'ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাই।'

'কিভাবে?'

'আমি প্রস্তাব করেছি এবং আজিম সাহেব মেনেও নিয়েছেন যে সমস্ত হত্যাকাণ্ডের দায় আজিম সাহেব আমার ঘাড়ে চাপাবেন।'

শহীদ আরও বিভ্রান্ত হল। সে আমতা আমতা করে বলল, 'সেটা আবার কেন করতে যাচ্ছ? মিছেমিছি ঝামেলা আর নাই বা বাড়ালে? শেষটায়...।'

'এইটাই হল বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সেরা পন্থা। তাতে করে আসল খুনী অথবা খুনীরা আরও নিশ্চিন্ত বোধ করবে। এবং কিছুটা অসাবধানও হয়ে পড়বে। সে সুযোগটা আমি নেব।'

'কিন্তু পুলিস? পুলিস কেন আজিম সাহেবের এই উদ্ভট অভিযোগ কানে তুলবে?'

'নিশ্চয়ই মানতে চাইবে না। কিন্তু তারা দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে। অন্তত কুয়াশার প্রশ্নটা জড়িত থাকায় কিছুটা ইতস্তত করবে। নতুন করে তদন্তও শুরু করতে পারে। তাতে অবশ্য পুলিস লাভবান হবে না। কিন্তু নাসিম লাভবান হবে। ঘোলা পানিতে আমরা আসল আসামীদের স্পষ্ট দেখতে পাব।'

'আমার তা মনে হয় না,' শহীদ বলল। 'আজিম সাহেবের অভিযোগের অন্তত কিছু একটা ভিত্তি থাকতে হবে তো? হুট করে আজিম সাহেব বললেই তো আর হবে না? পুলিস এক কথায় নাকচ করে দেবে তাঁর যুক্তি।'

'একেবারে এক কথায় উড়িয়ে দিতে পারবে না। আমি আজিম সাহেবকে ভয় দেখিয়ে দুটো চিঠি দিয়েছি আগের তারিখ দিয়ে। এই যেমন ধর, তার কাছে কিছু টাকা-পয়সা চাই। না দিলে পরিণাম খুব খারাপ হবে, এমন শাসানিও রয়েছে সেই চিঠিতে। আজিম সাহেব পুলিসকে চিঠিগুলো দেখাবেন। বোধহয়, ইতিমধ্যেই মি. সিম্পসনকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তার আগেই পৌঁছুবে আমার চিঠি।'

কুয়াশার পরিকল্পনা শহীদের মনঃপূত হল না। সে বলল, 'আমার মনে হয়, তুমি ভুল পথে এগোচ্ছ।'

জবাবে হাসল কুয়াশা। সে বলল, 'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এটাই উত্তম পন্থা। তাছাড়া আমার আর একটা প্ল্যান আছে যা আমি এখুনি তোমাকে বলতে পারছিনে।'

'বেশ, যা ভাল বোঝ, কর,' ক্ষোভ প্রকাশ করল শহীদ।

চার

সকালেই মিসেস আজিম ফোনে শহীদকে ঢাকায় তাঁর উপস্থিতির খবর দিলেন এবং কখন তার সাথে দেখা করতে আসবেন জানতে চাইলেন। শহীদ জানাল যে,

তাঁর আসবার দরকার নেই। সে নিজেই যাবে মিসেস আজিমের সাথে দেখা করতে। নাসিমের রুমটাও দেখতে চায় সে সেই সঙ্গে।

গফুর এসে খবর দিল, আবু মুরাদ নামে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। তাঁকে সে বসিয়ে রেখেছে ড্রইংরুমে। বাইরে বেরোবার পোশাক পরে ড্রইংরুমে ঢুকল শহীদ। মুরাদ সাহেব সবিনয়ে আত্মপরিচয় দিলেন, 'আমি আবু মুরাদ। সাইফুল আজিম সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি। উনি আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার সাথে দেখা করতে। যদি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি... ।'

ভদ্রলোককে জরীপ করল শহীদ। চল্লিশ বছরের মত বয়স হবে আবু মুরাদ সাহেবের। রংটা শ্যামলা। বলিষ্ঠ গড়ন। চেহারাটা বুদ্ধিদীপ্ত। পরনে ছাই রং-এর চমৎকার একটা সুট। সব মিলিয়ে স্মার্ট লোকটা।

শহীদ বলল, 'আপাতত একটিমাত্র কাজ আপনি করতে পারেন। আমি মিসেস আজিমের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। বাসাটা ঠিক চিনি না। আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন।'

'বেশ, চলুন।'

লনে অপেক্ষা করছিলেন মিসেস আজিম। ওদেরকে সাদরে সম্বর্ধনা জানালেন।

মিসেস আজিম সুন্দরী। দুধে-আলতা গায়ের রং। শিল্পীর তুলিতে আঁকা মুখটা যেন ছুরির ফলার মত ধারালো। বয়স তিরিশ পেরিয়েছে। কিন্তু চোখের কোণে এখনও বিদ্যুতের ঝিলিক। সুঠাম দেহবল্লরী। বঙ্কিম গ্রীবা। মাথা ভর্তি বব ছাঁট কোঁকড়া চুল। দু'চারটে অবাধ্য কুন্তল প্রশস্ত কপালের উপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সাদা সিল্কের একটা শাড়ি পরা আর স্লিভলেস ব্লাউজ। দেহের অনাবৃত অংশগুলো স্বাস্থ্য আর যৌবনের জানানি দিচ্ছে। গলায় একটা মুক্তোর মালা। কানে কোন অলঙ্কার নেই। বাহু দুটোও নিরাভরণ।

রাত জাগার জন্যেই হোক আর অন্য কোন কারণেই হোক মহিলার চোখ দু'টো ঈষৎ লাল।

শহীদ গাড়ি থেকে নামতেই মিসেস আজিম এগিয়ে এলেন, 'শহীদ খান সাহেব!'

'জ্বি, হ্যাঁ,' গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল শহীদ।

'আসুন, শহীদ সাহেব। এস মুরাদ।' তারপর জিভ কেটে বললেন, 'আই অ্যাম সরি, মি. মুরাদ, কিছু মনে করবেন না।'

মুরাদ সাহেব সহজ অবহেলায় উড়িয়ে দিলেন। শ্রাগ করে বললেন, 'নেভার মাইণ্ড, ম্যা'ম।'

বাড়ির সামনের দিকটা একবার পর্যবেক্ষণ করল শহীদ। তারপর মিসেস আজিমের দিকে চেয়ে বলল, 'এই যে লোকটা খুন হয়েছে, মানে কুলী হোসেন না কি যেন নাম, ওকে আগে আপনি চিনতেন নাকি মিসেস আজিম?'

প্রশ্নটার আকস্মিকতায় মিসেস আজিম মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আমি, আমি চিনব কি করে!' একটু বিরক্ত হয়েছেন শহীদের প্রশ্নে। সেটাও বোঝা গেল।

'নেভার মাইণ্ড মাই ফুলিশ কোশ্চেন,' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল শহীদ।

'সত্যি কথা বলতে গেলে,' মিসেস আজিম গ্রীবাভঙ্গি করলেন, 'লোকটার নাম আমি শুনেছিলাম, তবে বেশি দিন আগে নয়। ঐ খুনোখুনির দিনই সন্ধ্যায় এক পার্টিতে। এই যে আসুন, ড্রইংরুমটা এই দিকে।'

বিরাট একটা সুসজ্জিত ড্রইংরুমের মধ্যে ঢুকল তিনজন। সোফাতে বসতে বসতে শহীদ বলল, 'সে পার্টির কথা আমি শুনেছি। মিসেস আফরোজা রহমান আপনার স্বামীর বিদায় উপলক্ষ্যে পার্টি দিয়েছিলেন, তাই না?'

'জ্বি, হ্যাঁ। সেখানে নাসিমের মুখেই কুলী হোসেন নামটা শুনেছিলাম। নাসিম বলেছিল, সে নাকি লোকটার কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা ধার করেছে। ঐদিনই নাকি টাকাটা ফিরিয়ে দেবার লাস্ট ডেট ছিল। কুলী হোসেন নাকি শাসিয়েছে যে, টাকাটা না দিলে পরিণাম খারাপ হতে পারে।'

'কি পরিণাম হতে পারে সে সম্পর্কে কোন আভাস দিয়েছিল নাসিম?'

'নির্দিষ্ট করে কিছু বলেনি। তবে হয়ত ওকে মারপিট করতে পারত অথবা ওর বড় চাচার কানে তুলতে পারত। তবে যাই হোক, দুটোর একটও নিশ্চয় শুভ নয়। দ্বিতীয়টা তো মারাত্মক। আমার ভাসুর যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন যে নাসিমের এমন ধরনের বদভ্যাস আছে তাহলে তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। তাই নাসিম আমাকে অনুরোধ করেছিল, আমি যেন ওর ছোট চাচার কাছ থেকে ওকে টাকাটা নিয়ে দিই।'

'আপনি কি বললেন?'

'আমি ওর চাচাকে বলব বলে কথা দিয়েছিলাম।'

'বলেছিলেন তাঁকে?'

'ট্রেনে বলেছিলাম, উনি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। নাসিম এতটা বখে যাবে এটা তিনি আশা করেননি।'

'উনি টাকা দেবেন কিনা তার কিছু বলেছিলেন?'

'তাঁর মানসিক অবস্থা অনুকূল না দেখে ব্যাপারটা তখনকার মত চাপা দিয়েছিলাম অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে।'

'আচ্ছা ধরুন, টাকাটা যদি নাসিম জোগাড় করতে না পারে তাহলে নাসিম কি করবে, তার কোন আভাস দিয়েছিল?'

মিসেস আজিম জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন। আঙুলের আংটিটা ঘোরাতে লাগলেন একমনে। শহীদ সিগারেট ধরিয়ে টান দিতে দিতে জবাবের অপেক্ষা করতে লাগল। শেষপর্যন্ত জবাব দিলেন তিনি, 'ছেলেমানুষী জবাব একটা

দিয়েছিল বৈকি। বিপদে পড়লে মানুষ অনেক উল্টোপাল্টাও তো বকে।'

'সে জবাবটা কি?' শান্তস্বরে প্রশ্ন করল শহীদ।

তবু একটু ইতস্তত করলেন মিসেস আজিম। তারপর বললেন, 'নাসিম বলেছিল, সে-ও দেখে নেবে। ঢিল মারলে পাটকেল ছুঁড়তে সে-ও জানে। তার গাড়ির গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে সব সময়ই রিভলভার থাকে। দরকার হলে সেটার সদ্ব্যবহার করবে।'

'পার্টিতে একথা কি শুধুমাত্র আপনাকে বলেছিল, না আর কারও কাছে বলতে শুনেছেন?'

'আফরোজাকেও সে ধারের কথাটা বলেছিল। ওর চাচার কাছ থেকে টাকা নিয়ে দেবার জন্যে তাকেও ধরেছিল। তবে রিভলভারের প্রসঙ্গটুকু বলেছিল কিনা জানি না। তবে হ্যাঁ, মুরাদ সাহেবও ছিলেন।'

'আপনিও শুনেছেন তাহলে?' মুরাদকে প্রশ্ন করল শহীদ।

'আমি ধারের ব্যাপারটা আগেই জানতাম। টাকাটা কি করে জোগাড় করা যায় তার বুদ্ধি বাতলে দেবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করেছিল।'

'আপনি কি বলেছিলেন?'

হাসল মুরাদ, 'আমার কাছে ও প্রশ্ন তোলা বাতুলতা। আদার কারবারি আমি।'

চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে একটা চাকর ঢুকল। টিপয়ের উপর ট্রে রেখে সে মিসেস আজিমকে বলল, 'বেগম সাহেবা, আপনার ফোন। বড় সাহেব ডাকছেন।'

মিসেস আজিম উঠে দাঁড়ালেন। 'মাফ করবেন, শহীদ সাহেব। আমি এখুনি আসছি। অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গেছে। ভাইজানকে এখনও আপনার উপস্থিতির খবরটা জানাইনি।'

বেরিয়ে গেলেন মিসেস আজিম। চাকরটা চা তৈরি করে দিয়ে চলে গেল। শহীদ চুপ করে কি যেন ভাবছিল। আবু মুরাদ বলল, 'চা নিন, শহীদ সাহেব।'

'এই যে, ভাই, নিচ্ছি।'

চায়ের কাপে চুমুক দিল শহীদ। তারপর বলল, 'একটা কথা বুঝতে পাললাম না, মুরাদ সাহেব, আপনি তো সাইফুল আজিম সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি, আপনার তো অহোরাত্র সাহেবের কাছেপিঠে থাকার কথা। উনি আপনাকে স্পেয়ার করেন কি করে?'

মুচকি হাসল মুরাদ। সে বলল, 'দেখুন, নামে প্রাইভেট সেক্রেটারি হলেও আমার পাওয়ার আর ফাংশন আলাদা। আসলে আমার কাজটা হল, আজিম সাহেবদের সবাইকে তদারক করা। বলতে পারেন, উঁচুদরের চাকর। ওদের সবরকম ঝঞ্ঝাট আমাকেই পোহাতে হয়। মিসেস আজিমের জন্যে চোরা-বাজারে এলিজাবেথ আর্ডেমের লিপস্টিক সংগ্রহ থেকে শুরু করে কারখানার শ্রমিক ধর্মঘট বানচাল সবই আমাকে করতে হয়। তাছাড়া নানারকম উমেদারী তো

আছেই। ফলে আমার কর্মক্ষেত্রটা ব্যাপক। ক্ষমতাও।'

'তাহলে আপনার চাকরিটা তো চমৎকার! আপনি তো ওদের হাঁড়ির খবরও রাখেন?'

'স্বভাবতই।'

'কতদিন আছেন এই চাকরিতে?'

'মাত্র বছরখানেক। এর আগে আমি ইনস্যুরেন্সে ছিলাম। বড় সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম একটা পলিসি বেচতে। উনি আমাকেই কিনে রাখলেন।'

'আপনি থাকেন কোথায়?'

'ফার্মগেটের কাছে।'

'ঘটনার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?'

'তখন আমি ট্রেনে। জরুরী একটা কাজে আমাকে সেইদিনই রাতের ট্রেনে ময়মনসিংহ যেতে হয়েছিল। সন্ধ্যায় পার্টিতে আমি অবশ্য ছিলাম। সেখান থেকে ড. আজিমকে নিয়ে স্টেশনে গেলাম। ওঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আমি স্টেশনেই রয়ে গেলাম বাহাদুরাবাদের গাড়ির অপেক্ষায়। এসেছি গত রাতে। এই দুর্ঘটনার খবর আমি গতকাল কাগজে পড়েছি। আরও দু'একদিন থাকতাম আমি সেখানে। কিন্তু দেরি করা সমীচীন হবে না বিবেচনা করে চলে এলাম।'

চা শেষ করে আর একটা সিগারেট ধরাল শহীদ। আবু মুরাদকে সিগারেট অফার করল। কিন্তু সে বলল, 'সর্বনাশ, বে-আদবী করলে আমার চাকরি চলে যাবে না!'

ভাবভঙ্গি দেখে হাসি পেল শহীদের।

মিসেস আজিম ফিরে এলেন। তাঁকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। উত্তেজনার কারণ অনুমান করতে শহীদের দেরি হল না। সেই খবরটাই এসে গেছে। গুজবটা চালু করে দেওয়া হয়েছে। মিসেস আজিমই বোধহয় প্রথম বে-সরকারি শ্রোতা। মিসেস আজিম কিছু বলার আগেই উদ্বেগের ভান করে শহীদ প্রশ্ন করল, 'কি হল, মিসেস আজিম! আপনাকে অত্যন্ত উত্তেজিত মনে হচ্ছে যে? কোন দুঃসংবাদ?'

'দুঃসংবাদ না সুসংবাদ বলতে পারছিনে। ভাইজান ফোন করেছিলেন। তিনি বললেন, তাঁর ধারণা খুনটা নাকি কুয়াশা...মানে কুখ্যাত ক্রিমিন্যাল কুয়াশা করেছে। সে নাকি আগেই শাসিয়েছিল ভাইজানকে। কয়েক লাখ টাকা চেয়েছিল ওঁর কাছে। না দিলে ক্ষতি হবে বলে হুমকি দিয়েছিল। উনি গা করেননি। ওসব উটকো হুমকিতে ভয় পাবার লোক উনি নন। তাছাড়া আক্রমণটা যে এইভাবে আসবে তা তিনি ধারণা করেননি। এখন আমারও মনে হচ্ছে উনি ঠিকই ধরেছেন। আমাদের কোন শত্রুই যে চক্রান্ত করেছে, নাসিমের ছোট চাচা গোড়াতেই একথা বলেছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে, ওঁর ধারণা নিতান্ত অমূলক নয়। আপনার কি মনে হয়, মুরাদ সাহেব?'

'রাতে সাহেব আমার কাছেও কথাটা বলেছিলেন। ওঁর কাছে কুয়াশার পাঠানো দুটো চিঠিও আছে। সেগুলো সি. আই. ডি-র বড় সাহেব মি. সিম্পসনকে দেখিয়েছেন,' সোৎসাহে বলল মুরাদ।

কিন্তু শহীদ উৎসাহিত হল না। সে প্রশ্ন করল, 'আপনি নিজে দেখেছেন চিঠিগুলো?'

'না, আমাকে দেখাননি। মি. সিম্পসন বলেছেন, হাতের লেখা কুয়াশারই।'

'আগেও কখনও আজিম সাহেব ঐ ধরনের চিঠির কথা বলেছিলেন নাকি?'

'জ্বি, না, আজিম সাহেব অত্যন্ত চাপা মানুষ। চট্ করে কোন কিছু ফাঁস করেন না।'

'আপনার কি ধারণা, কুয়াশাই এটা করেছে?'

মুরাদ বলল, 'নাসিম যতদূর মনে হয় নির্দোষ। যদি সে নির্দোষ হয়েই থাকে তাহলে তো আমি কুয়াশাকে ছাড়া এমন কোন শত্রুর অস্তিত্ব জানি না যে ওঁদের সর্বনাশ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। সুতরাং...।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে। আবার এমন হওয়াও অস্বাভাবিক নয় যে, কোন তৃতীয় পক্ষের কুলী হোসেনের সাথে শত্রুতা ছিল অথবা নাসিমের সাথে কিংবা আজিম সাহেবের বা তার পরিবারের অন্য কারোর প্রতি অথবা এদের প্রত্যেকের সাথেই তার শত্রুতা ছিল। সে কুলী হোসেনকে খুন করে খুনের দায় নাসিমের ঘাড়ে চাপিয়েছে, এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছে, সবাইকে জব্দ করেছে। সে হয়ত কুয়াশার হুমকির কথাও জানে। সুতরাং খুনের দায়টা আর যার উপরেই চাপুক তার উপর আসবে না এটা নিশ্চিত জেনেই সে ভেবেচিন্তে কুলী হোসেনকে সরিয়ে দিয়েছে। অবশ্য কুয়াশার জড়িত থাকার সম্ভাবনাটাও আমি অস্বীকার করছিনে।'

শহীদের ব্যাখ্যা শুনে মিসেস আজিম বোকার মত চেয়ে রইলেন। কিন্তু মুরাদ বলল, 'আমি ব্যাপারটা অত গভীরভাবে ভেবে দেখিনি। আমার ধারণা, কুয়াশাই আসল অপরাধী। তবে আপনি যে ব্যাখা দিলেন মি. সিম্পসনও ঠিক একই ধরনের কথা বলেছেন।'

'তারমানে, কুয়াশা এই খুনের সাথে জড়িত এ কথা তিনি মানতে চান না?'

'জ্বি, হ্যাঁ।'

মিসেস আজিম বিজ্ঞের মত বললেন, 'পুলিসের চাকরি করেন তো মি. সিম্পসন, বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে। আপনি বরং ঐ লাইনেই খোঁজ নিয়ে দেখুন, শহীদ সাহেব। আমার মনে হয়, নাসিমকে বাঁচাবার সেটাই শ্রেষ্ঠ উপায়।'

শহীদ জবাবে হাসল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি একবার নাসিমের রুমটা দেখতে চাই, মিসেস আজিম? রুমটা কি বন্ধ?'

'এখন খোলাই আছে। রওশন আলী, মানে আমাদের বুড়ো চাকরটার কাছে

ডুপ্লিকেট চাবি আছে প্রত্যেক রুমের। দৈনিকই সকালে রুমটা খোলা হয়। পাশের রুমটাই। চলুন। মুরাদ সাহেব, আপনিও আসুন।'

'চলুন,' উঠে দাঁড়াল মুরাদ।

রুমে ঢুকেই মিসেস আজিম বলল, 'রওশন আলী বলেছিল, পুলিস এসে রুমটা তল্লাশি করে পিস্তল নিয়ে গেছে।

রুমটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করল শহীদ। দামী আসবাবপত্রে সাজানো রুমটা। দেয়ালে টেনিস র‍্যাকেট হাতে এক সুদর্শন যুবকের সহাস্যমূর্তি। সম্ভবত ওটা নাসিমেরই ফটো।

'নাসিম বোধহয় ভাল টেনিস খেলত?' শহীদ প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, ইউনিভার্সিটিতে একবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল নাসিম। খেলা-ধূলোয় ঝোঁক ছিল খুব। শিকারেও।'

বাথরুমের দরজা খুলল শহীদ। এক কোণে বড় একটা ক্লজিট। ব্রাকেটে অনেকগুলো সুট। ড্রয়ার টানল শহীদ, একটা ছাড়া সবগুলোই খোলা। কাপড়চোপড় ঠাসা। ক্লজিটের নিচের তাকে বড় একটা বর্গাকার বাক্স চোখে পড়ল তার। সে জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কি?'

মিসেস আজিমও দেখলেন। 'কি যেন, ঠিক বলতে পারছিনে। মনে হয় কোন মেশিন-টেশিন হবে।'

শহীদ নত হয়ে বের করে আনল প্যাকেটটা। খুলে দেখে বলল, 'এটা তো টেপ-রেকর্ডার। বাক্সটার ভেতরে ছোট আরও একটা প্যাকেট ছিল, সেটা যে কি তা বুঝতে পারল না সে। নেড়েচেড়ে আবার বন্ধ করে রাখল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এগুলো আমি নিয়ে যাব। নাসিম কি গান-টান পছন্দ করত নাকি?'

'না। তেমন নয়। ওর সখ ছিল খেলাধুলা ও শিকারে। এবারও তো ওর ছোট চাচার সাথে শিকারে যাবার কথা ছিল। কিন্তু উনি রাজি হলেন না ভাইজানের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে। খুবই হতাশ হয়েছিল নাসিম। এখন মনে হয়, ওকে নিয়ে গেলেই ভাল হত।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মিসেস আজিম।

প্যাকেটটা হাতে তুলে নিল শহীদ।

'চলুন। আর দেখবার কিছু নেই। আপনাদের চাকরগুলো কোথায়, ডেকে দিন। ওদেরকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করবার আছে। আমি ড্রইংরুমেই বসছি। মুরাদ সাহেব, কয়েক মিনিটের জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন?'

'ঠিক আছে। আমি লনে যাচ্ছি,' চলে গেল মুরাদ।

ড্রইংরুমে গিয়ে বসল শহীদ।

একটু পরেই রওশন আলী এসে সালাম দিয়ে দাঁড়াল। এই লোকটাই একটু আগে চা দিয়ে গিয়েছিল। লোকটার বয়স প্রায় পঞ্চাশ। তবে দেহটা এখনও মজবুত।

শহীদ বলল, 'তোমার নাম রওশন আলী?'

'জ্বি, হুজুর,' ভীতস্বরে বলল রওশন আলী।

'এ বাড়িতে চাকর ক'জন আছে?'

'দু'জন। আমি আর বাবুর্চী জোমারত।'

'তোমার সাহেব, মানে খুরশীদ সাহেব যেরাতে চট্টগ্রাম গেলেন সেরাতে তুমি বাসায় ছিলে না?'

'হুজুর, রাতে আমি এখানে থাকি না। জোমারত একা থাকে। আমি হুজুর, বড় সাহেবের বাসায় থাকি। এ বাড়িতে কাজের লোক না থাকলে তখন এখানে কাজ করি। তবে রাতে ঐ বাড়িতেই ফিরে যাই। সেদিনও গিয়েছিলাম

'ক'টায়?'

'সাড়ে আটটায়। এখানে কোন কাজ ছিল না, তাই চলে গিয়েছিলাম তাড়াতাড়ি।'

'আর জোমারত?'

'ওর তো থাকবার কথা ছিল। কিন্তু ও বড় ফাঁকিবাজ, হুজুর। দায়িত্বজ্ঞান একটুও নেই। আমি চলে যাওয়ার পরই সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। পরে আমি ওকে ধমকেছি। তা ও বললে, দশটার মধ্যে তো ছোট সাহেব ও বেগম সাহেবা এসেই পড়বেন। বাসায় সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পাট বন্ধ ছিল,তাই কোন কাজ ছিল না। বেগম সাহেবা আবার সকালবেলা বকশিশ দিয়েছিলেন দশ টাকা। সুতরাং ওকে পায় কে? বাসাটা যে খালি রইল সেকথা একবারও ভাবল না। অবশ্য ওর থাকা না থাকা সমান। একবার ঘুমোলে হাতি দিয়ে টানলেও উঠবে না।'

একটু অবাক হয়ে বলল, 'বেগম সাহেবা দশটার মধ্যে ফিরবেন মানে! উনি তো চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন?'

'জ্বি, হুজুর, উনি চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। কিন্তু তেনার যাওয়ার কথা ছিল না। হুট করেই চলে গিয়েছিলেন তিনি।'

'জোমারত কোথায় এখন?'

'বাজারে গেছে, হুজুর।'

'সে রাতে ফিরেছিল কখন?'

'সাড়ে বারটার দিকে।'

'সকালে পুলিসকে দরজা খুলে দিয়েছিল কি জোমারতই?'

'জ্বি, হুজুর।'

'আচ্ছা, যাও। তোমাদের বেগম সাহেবাকে পাঠিয়ে দিও।'

মিসেস আজিম এলেন একটু পরেই। শহীদ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'মিসেস আজিম, আপনারা যদি সব কথা স্পষ্ট করে খুলে না বলেন তাহলে আমার পক্ষে

সত্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়?'

মিসেস আজিম হকচকিয়ে গেলেন। একটু উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল, শহীদ সাহেব? কি করেছি আমরা?'

'আপনার কি আগে থেকেই ড. আজিমের সাথে চট্টগ্রাম যাবার কথা ছিল?'

'ওহ্ এই ব্যাপারে? না, তা ছিল না। তা আপনি জানলেন কি করে? রওশন আলী বলেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, সেই বলেছে। কিন্তু কথাটা আপনার আগেই আমাকে বলা উচিত ছিল।'

'আমি, আমি ব্যাপারটাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করিনি। আমি দুঃখিত, আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'

শহীদ একটু লজ্জা পেল। সে বলল, 'আপনার চট্টগ্রাম যাবার ব্যাপারটা ঠিক হল কখন?'

'একেবারে স্টেশনে গিয়ে।'

'টিকেটের ব্যবস্থা? রিজার্ভেশন?'

'অ্যাক্সিডেন্টালি পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং ঝামেলা হল না। তবে কাপড়-চোপড় নিতে পারিনি, সকালে চট্টগ্রাম থেকে কিনে নিয়েছিলাম দরকার মত।'

'হঠাৎ এই রকম ডিসিশনের কারণ?'

'ওটা আমার স্বামীর খেয়াল। আসলে অত্যন্ত খামখেয়ালী লোক উনি। অথচ ভয়ানক জেদী। যখন যা খেয়াল হবে তা না করে ছাড়বেন না,' স্বামীর প্রতি সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুরে কথাগুলো বললেন মিসেস আজিম। একটু থেমে পুনরাবৃত্তি করলেন, 'একেবারে খেয়ালী মানুষ।'

শহীদ বলল, 'এবারে আমি উঠব, মিসেস আজিম,' উঠে দাঁড়াল সে।

মিসেস আজিম বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে।'

দরজার দিকে এগোতে এগোতে সে বলল, 'বলুন?'

'আপনার এই মামলা সম্পর্কে কি ধারণা? মানে, নাসিমকে বাঁচাতে পারবেন তো?' ব্যাকুল শোনাল মিসেস আজিমের কণ্ঠস্বর, 'ওর চাচাকে আমি কথা দিয়ে এসেছি, চেষ্টার ত্রুটি হবে না। যেমন করে হোক আমরা সবাই মিলে নাসিমকে রক্ষা করব। অবশ্য, যদি সে নির্দোষ হয়। তা আপনি— আপনি—আপনার কি মনে হয়? আমাদের বংশের একমাত্র প্রদীপ।'

মিসেস আজিমের ব্যাকুলতা অনুভব করল শহীদ। সে বলল, 'এখন পর্যন্ত বিশেষ কিছুই জানতে পারিনি, মিসেস আজিম। যেটুকু জেনেছি তাতে তো মনে হয়, নাসিম নিরপরাধ। কিন্তু সেটুকু জানাটা যথেষ্ট নয়। আসল হত্যাকারি কে, তা জানতে না পারলে এবং তার প্রমাণ দিতে না পারলে নাসিমকে বাঁচানো যাবে না।'

'আসল অপরাধী তো আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কুয়াশাই।'

'যেই হোক, প্রমাণ তো চাই?'

'তাহলে আপনি এখন প্রধানত কুয়াশার বিরুদ্ধেই প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করবেন বলে আশা করি।'

গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল দু'জন। শহীদ দরজা খুলে সিটের উপর প্যাকেটটা নামাল।

'সে চেষ্টারও ত্রুটি করব না,' শহীদ বলল। 'আমি একটা ঘটনা জানতে পেরেছি। সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা, মানে আপনি, আপনার স্বামী ও মুরাদ সাহেব স্টেশনে যাবার পর নাসিম আপনার ভাসুরকে দেখতে যায়। সেখান থেকে সে যায় জুয়ার আড্ডায়। সেখানে সে অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। কোনরকমে সে গাড়ি নিয়ে হোটেল সোনিয়াতে পৌঁছে। সেখানে অপেক্ষা করছিল তার এক বন্ধু। সেই বন্ধুটিই অসুস্থ নাসিমকে এখানে নিয়ে আসে, এমন কি বিছানাতে শুইয়েও দেয় তাকে। নাসিম তখন একেবারে অচৈতন্য। তখন রাত এগারটা। আর রাত বারটার সময়, মানে মাত্র একঘন্টা পরে কুলী হোসেনের লাশ রাস্তায় ফেলে গাড়ির তলে চাপা দেওয়া হয়। অসুস্থ নাসিমের পক্ষে একঘন্টা পরেই গাড়ি চালিয়ে গিয়ে ঐ কাজটা করা সম্ভব কিনা ভেবে দেখতে হবে। তাছাড়া নাসিমের অসুস্থতাটা যথার্থ, না সেটা ভান ছিল জানতে হবে। আবার সেই বন্ধুটি চেতনাহীন নাসিমকে শুইয়ে দিয়ে গিয়ে তার গাড়িটা নিয়ে ঐ কীর্তি করেছে কিনা কে জানে? অথবা এমনও তো হতে পারে, নাসিম ও তার সেই বন্ধুটি দু'জনই এ ব্যাপারে জড়িত আছে। অসুস্থতার ভানটা নাসিম স্রেফ অ্যালিবাই হিসেবে ব্যবহার করছে, এটাও অসম্ভব নয়। আবার কুয়াশার হুমকির কথাও ভেবে দেখতে হবে। সুতরাং এই মুহূর্তে কিছুই বলতে পারছিনে।'

শহীদের দীর্ঘ বিশ্লেষণে মিসেস আজিম মুগ্ধ হলেন। বিস্ময়ে তাঁর বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল। পরে বললেন, 'রাতে যে বন্ধু ওকে বাসায় নিয়ে এসেছিল সে কে? অবশ্য আমি নাসিমের বন্ধুদের বড় একটা চিনি না।'

'এই মুহূর্তে নামটা আমি বলতে পারছিনে।'

'তার মানে, নামটা আপনি এখনও জানতে পারেননি!'

গাড়িতে চাপল শহীদ। সে বলল, 'জানতে পেরেছি নিশ্চয়ই। কিন্তু বলা সম্ভব নয়। আচ্ছা, চলি এবার। মুরাদ সাহেব, চলি আমি।' শহীদের গাড়িতে গতি সঞ্চারিত হল। গাড়িটা রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

মুরাদ বলল, 'আমিও চলি, ম্যাডাম।'

'আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমার সামান্য কেনাকাটা আছে। যদি অসুবিধা না হয়...,' স্মিতহাস্যে বললেন মিসেস আজিম।

'কিছু মাত্র না,' বিগলিত হল আবু মুরাদ।

'আসুন তাহলে, বসবেন। আমি কাপড়টা পাল্টে আসি।'

পাঁচ

শহীদ সোজা চলে গেল হোটেল সোনিয়ায়। শাহানারাকে একটা কথা বলা দরকার। কুয়াশার ব্যাপারটা তার কানে নিশ্চয়ই পৌঁছেছে। ওর প্রতিক্রিয়াটা কি, সেটাও জানতে হবে। আর মিসেস আফরোজার খোঁজ কোথায় পাওয়া যাবে সে হদিসটাও দিতে পারে হয়ত।

বাইরে গাড়ি রেখে ভিতরে ঢুকল শহীদ। কাউন্টারে একাই ছিল শাহানারা। ফোনে কথা বলছিল। শহীদ ধীরে ধীরে গিয়ে সামনে দাঁড়াল। শাহানারা ওকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে গেল এবং তারপর ওর মুখটা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল।

শহীদ বুঝতে পারল, শাহানারাও বিশ্বাস করেছে গুজবটা। বেশ চমৎকার কাজ দিয়েছে!

রিসিভার নামিয়ে রেখে পেশাদারি ভঙ্গিতে শাহানারা শহীদকে জিজ্ঞেস করল, 'মি., হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?'

হাসল শহীদ।

'আপনি বোধহয় শুনেছেন…?'

'হ্যাঁ, আমারই ভুল হয়েছিল। অবশ্য না জেনেই ভুল করেছি আমি। যে লোকটাকে আমি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলাম সেই আমার সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। সে যে এমন মানুষ তা আমি ভাবতেও পারিনি!' ঘৃণায় শাহানারার মুখটা কুঞ্চিত হয়ে গেল। 'এরপরে আপনাকে বলবার আমার কিছুই নেই। উঃ, এ যে কল্পনাতীত!'

শহীদ মৃদু হেসে বলল, 'পৃথিবীতে অনেক কিছুই ঘটে যা আমরা কল্পনা করতে পারি না। সে যাক, মিসেস আফরোজাকে কোথায় পাওয়া যাবে, বলতে পারেন?'

'আমি সঠিক জানি না। তাছাড়া এ সম্পর্কে আমার আর কোন উৎসাহ নেই। নাসিমের কপালে যা আছে হবে। আমাকে মাফ করুন।'

শহীদ আর যন্ত্রণার্ত মেয়েটাকে ঘাঁটাল না। বেরিয়ে গেল। বাসায় ফিরতেই শহীদ দেখল, ড্রইংরুম আলোকিত করে বসে আছে শ্রীমান কামাল আহমেদ। 'আসতে আজ্ঞা হোক, আসতে আজ্ঞা হোক,' কলরব করে উঠল সে।

'কিরে, কি শিকার করলি?' ঠাট্টা করল শহীদ।

'তুই কি শিকার করলি তাই বল, হাতে কি ওটা?'

'এখনও শিকার পাইনি। টারগেট প্র্যাকটিস করছি মাত্র। পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে।' হাতের প্যাকেটটা নামালো সে।'

মানে, শিকার ধরাশায়ী হবার সময় এসেছে?'

'একেবারে এসে পড়েনি। আসি আসি করছে। ওদিকের খবর কি? আমি তোকে যা করতে বলেছিলাম করেছিস?'

'পারলাম কোথায়? তোর ফোন পেয়েই তো ছুটলাম প্লাইউড হোটেলে। ড. আজিম তখন অলরেডী রওয়ানা হয়ে গেছেন, রিসেপশনে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম। তাঁর সাথে দেখা হল না। মিসেস আজিমকে অবশ্য আমি দেখেছি। ভদ্রমহিলা তখন পি. আই এ-র বুকিং কাউন্টারের সাথে ফোনে ঝগড়া করছিলেন। রণরঙ্গিনী মূর্তি দেখে আর ভদ্রমহিলাকে ঘাঁটালাম না। তবে হ্যাঁ, ভদ্রমহিলা বটে। একেবারে ডাঁশা পেয়ারা!'

'আহ কামাল, এসব কি হচ্ছে?'

'অশ্লীল হয়ে গেল বুঝি? আই উইথড্র। তা তুই ওটা কি বয়ে আনলি? তা তো বললিনে?'

'ভাল কথা, দেখ তো দোস্ত, দ্রব্যটা কি? তুই আবার এসবের কদর বুঝিস।'

ঢাকনাটা খুলল কামাল।

'এটা হচ্ছে, হাই ফাইডালিটি টেপ-রেকর্ডার। স্পীড বাড়ানো কমানো যায়। সেকেণ্ডে প্রায় পৌনে দুই ইঞ্চি টেপও রেকর্ড করা যায়। আবার তিন ইঞ্চিও রেকর্ড করা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে তা লং প্লেয়িং টেপের স্পুলের একদিকে তিন ঘন্টা চলবে।

'তুই তো বিদ্যেটা ভাল করেই রফত করেছিস দেখছি? দেখা তো কিভাবে চলে?'

তার প্লাগে লাগাতে লাগাতে কামাল বলল, 'এটা হচ্ছে লেটেস্ট মডেল। এতে লং প্লেয়িং টেপের একটা দিক ইচ্ছে করলে দেড়ঘন্টাও কাজে লাগানো যায়। আবার তিন ঘন্টার বেশিও কাজে লাগানো যায়।'

'গতির এই তারতম্যের কারণ?'

'কিছুই না। বিশ্বস্ততার ব্যাপার, মানে নির্ভুলতার জন্যে। যাকে বলে ফাইডালিটি। গানের জন্যে সাড়ে সাত ইঞ্চিই যথেষ্ট। আবার যেখানে মানুষের নির্ভুল কণ্ঠ শুনতে চাও সেক্ষেত্রে সেকেণ্ডে পৌনে চার ইঞ্চি টেপ ব্যবহার করলেই চলবে। তবে সেকেণ্ডে পৌনে দুই ইঞ্চি টেপ-রেকর্ড করলেও চমৎকার কাজ দেবে।'

'চমৎকার জিনিসটা তাহলে!'

সুইচ টিপল কামাল।

টেপের স্পুলটা ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল। লিসনিং হেড স্পর্শ করে অন্য স্পুলটাতে জড়িয়ে যেতে লাগল টেপ। চুপ করে অপেক্ষা করলো দু'জন।

বেশ কয়েক মিনিট পার হয়ে যাবার পর কামাল বলল, 'দুত্তোর ছাই, কিছুই নেই।'

'চলুক না, দেখা যাক। সবুরে মেওয়া ফলতেও পারে।'

আরও কিছুক্ষণ পার হয়ে গেল।

বিরক্ত হল কামাল, 'বললুম তো, কিছু নেই।'

শহীদ কিছু বলল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল।

'তবে উল্টোদিকে কিছু থাকতে পারে। দেখব নাকি? এটা হচ্ছে হাফ ট্র্যাক রেকর্ডিং। অর্থাৎ টেপের একদিকে অর্ধেকটা স্পুল ঘুরিয়ে দিয়ে টেপের উল্টোদিকে টেপের অপর অর্ধাংশেও রেকর্ড করা যায়। অর্থাৎ রেকর্ডিং ট্র্যাকটা দুই ভাগে বিভক্ত।'

'উল্টে দিয়ে দেখ না তাহলে? যদি কিছু মেলে?'

মেশিনটা বন্ধ করে দিয়ে স্পুলটা উল্টে দিল কামাল। মেশিনটা চালিয়ে দিল আবার। অনেকক্ষণ কিছুই শোনা গেল না। অবশেষে এক সময় হঠাৎ মেশিন থেকে নারীকণ্ঠ শোনা গেল,'...আর পারি না আমি! অসহনীয় লাগছে আমার...। তুমি কি করে...?' আর শোনা গেল না। নিঃশব্দে ঘুরতে লাগল স্পুল।

কামাল সুইচ অফ করে প্লাগ খুলে ফেলল।

শহীদ তখন টেপের নারী কণ্ঠটার কথা ভাবছিল। কণ্ঠস্বরটা সে চিনতে পারেনি। কিন্তু উচ্চারণ ভঙ্গিটা তার পরিচিত বলে মনে হচ্ছিল।

কামাল বলল, 'কিরে, গলাটা কার, বুঝলি?'

'ঠিক বুঝতে পারছিনে। ঐ বাক্সটা কি, দ্যাখ তো?'

বাক্সটা খুলল কামাল। চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। 'আরে, এ যে দেখছি ওয়াল-স্নুপার!'

'সে আবার কি?'

'অত্যন্ত সেনসিটিভ মাইক। দেয়ালে লাগিয়ে দাও, পাশের রূমে কেউ যদি নিচু গলাতেও কিছু বলে তাও অ্যামপ্লিফায়েড হয়ে টেপে চলে যাবে। টেপ যখন সেকেণ্ড হেডে চলে যাবে তখন ইয়ারফোনে প্রত্যেকটা কথা শুনতে পাবে। টেপে আমরা ঐ রকম স্নুপ করা রেকর্ডই শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। স্নুপিং করে সেটা শুনে নিয়ে ইরেজিং হেড দিয়ে ঘষে মুছে ফেলা হয়েছে। অসাবধানতাবশত সামান্য দু'একটা কথা মুছে যায়নি। ঐটুকুই আমরা শুনেছি।'

শহীদ ভাবতে লাগল। এই রকম স্নুপিং করার কি দরকার হয়েছিল নাসিমের, সে বুঝতে পারল না। হয়ত কোন মেয়েঘটিত ব্যাপার আছে। শাহানারার গলা ওটা নয়। এমনও হতে পারে, কোন কারণবশত সে কোন মহিলার উপর গোয়েন্দাগিরি করছিল। খুনের সাথে এর কোন সম্পর্ক আছে কিনা, কে জানে।

সিগারেটের শেষাংশটা ছাইদানিতে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল শহীদ। 'চল, খাবি আমার সাথে?'

ছয়

করাচীর আনজীবী ইমদাদ রিজভী সাহেব আরও তিনদিন পরে এসে পৌঁছুলেন। ইতিমধ্যে মামলার তারিখ পড়েছে। চার্জ-শীট দাখিল হয়েছে কয়েকদিন আগেই। অতিরিক্ত দায়রা আদালতে চলে গেছে নথি-পত্র।

রিজভী সাহেব অবস্থান করছেন হোটেল সোনিয়াতে। তাঁকে দেখাশোনার জন্যে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আবু মুরাদকে। ব্যস্ততার দরুন শহীদ বিমানবন্দরে রিজভী সাহবকে সম্বর্ধনা জানাতে যেতে পারেনি। সন্ধ্যার পর সে যখন তাঁর সাথে দেখা করতে গেল তখন আগের উকিল নীরেন সেন রিজভী সাহেবকে কাগজ-পত্র বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

আবু মুরাদ শহীদকে নিয়ে গেল রিজভী সাহেবের রূমে। উভয়ের মধ্যে পরিচয়পর্ব শেষ হল। উকিল সাহেবের বিরাটাকায় চেহারা দেখে ছেলেবেলায় দেখা গোরা ফুটবল দলের ক্যাপ্টেনের কথা মনে পড়ল তার। সেই রকমই ধবধবে গৌরবর্ণ, লম্বা-চওড়া। পার্থক্যের মধ্যে, ক্যাপ্টেনকে দেখেই মনে হত, সে রেগে আছে, আর রিজভী সাহেবের চেহারায় কোন নির্দিষ্ট ভাবের চিহ্ন নেই। কেমন যেন একটা ভাবলেশহীন, চরিত্রহীন চেহারা। বয়স আন্দাজ চল্লিশ। দু-একটা চুলে পাক ধরেছে। ব্যাকব্রাশ করা কোঁকড়া চুল। সিঁথি মাথার ঠিক মাঝখানে ভেঙে যাওয়ায় আলো গিয়ে মাথার চামড়ায় পড়ে চকচক করছে। চোখের নিচে একটা বড় আকারের তিল। চিবুকে একগুচ্ছ দাড়ি ঝাঁটার মত দাঁড়িয়ে আছে।

পরিচয়-পর্বের পর রিজভী সাহেব বললেন, 'তাহলে আপনিই সেই বিখ্যাত শহীদ খান? বসুন।'

শহীদ বসল। সেই সন্ধ্যা বেলাতেই রিজভী সাহেব হুইস্কির সরঞ্জামাদি নিয়ে বসেছিলেন। নীরেন সেন সাত্ত্বিক টাইপের লোক। তার বোধহয় অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। কিন্তু উপায় কি?

রিজভী সাহেব শহীদকে প্রশ্ন করলেন, 'কেঁও ভাইসাহাব, এক দফে হোগা?'

'মাফ কিজিয়েগা।'

'বেশ বেশ। মুরাদ সাহেব, এই সাহেবের জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করুন মেহেরবানি করে।'

'জ্বি, হ্যাঁ,' উঠে গেল আবু মুরাদ।

নীরেন সেনও উঠে যাচ্ছিলেন। কেসটা ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। গোড়াতেই রিজভী সাহেবের চোহারাটা দেখে তার তেমন পছন্দ হয়নি। উকিল তো নয়, যেন কুস্তিগীর। পরে অবশ্য বুঝেছেন যে, ভদ্রলোক তার চেয়েও ভাল উকিল। ল' অব এভিডেন্স আর ব্যালিস্টিক সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যেসব প্রশ্ন তাকে রিজভী সাহেব করেছেন তাতে ইতিমধ্যেই তাঁর প্রতি নীরেন সেনের মনে শ্রদ্ধার ভাব এসে গিয়েছিল। তিনি নিজেও উকিল খারাপ নন, সে পরিচয়ও রিজভী সাহেব পেয়েছেন। তিনি খুশিই হয়েছেন নীরেন সেনের সাথে আলাপ করে। ঠিক হয়েছে, রিজভী সাহেবকে তিনিই মামলায় সহায়তা করবেন।

শহীদ বলল, 'নীরেন বাবু, চলে যাচ্ছেন নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার কালকে কোর্টে আর একটা মামলা উঠবে।'

'এই কেসের তারিখ পড়েছে কবে?'

'আগামী সোমবার।'

'কাগজ-পত্র তৈরি?'

'যতদূর সম্ভব।'

'কোনদিক দিয়ে এগোবেন ঠিক করেছেন?'

'আমি নতুন কিছু ভাবিনি। তাছাড়া মামলা তো উনিই কনডাক্ট করবেন, উনিই ঠিক বলতে পারবেন। আমি এখন আসি। দরকার হলে ফোন করবেন আমাকে। নম্বর দিয়ে গেছি রিজভী সাহেবকে।'

চলে গেলেন নীরেন বাবু।

'তারপর,' এক ঢোক হুইস্কি পান করে রিজভী সাহেব খুব নিচু গলায় বললেন, 'প্লীজ ডু ওয়ান থিং, মি. খান। ইস আদমী, আই মীন দ্য স্পেশাল অ্যাটেনডেন্ট, উস্‌কো হটা দো ইধার সে।'

'কার কথা বলছেন?'

'যাকে চা আনতে বললাম। তার সার্ভিসের আমার দরকার নেই। শুনেছি, উনি আজিম সাহেবের অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক। কিন্তু আপাতত আমি ওদের কারও সান্নিধ্য পছন্দ করছি না। কার কি ইন্টারেস্ট আছে, কে জানে! আমার কাছে এখন জরুরী নথি-পত্র আছে। এর যে কোন একটা খোয়া গেলে মক্কেলের ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু মিসেস আজিম আবার স্পেশালি ঐ মুরাদ সাহেবকেই রেখে গেলেন আমাকে অ্যাটেণ্ড করার জন্যে।'

'তা তাঁকেই বলতেন এসব কথা?'

'নেহী, নেহী। বহুত খুবসুরত লেডী! তোমাদের বাংলা ভাষায় বলে, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। অমন হ্যাণ্ডসাম লেডীর ইচ্ছার অমর্যাদা করব, এতটা হৃদয়হীন আমি হতে পারি না। ওসব বিশ্রী কাজ আপনাকেই করতে হবে।'

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল শহীদ রিজভী সাহেবের কথা বলার ভঙ্গিতে। সে বলল, 'ঠিক আছে, ওটা আমিই করব। কেসের অবস্থা কি?'

'সেটা নির্ভর করে আপনার ফাইণ্ডিং-এর উপর। অন্যথায় শুধু টেকনিক্যাল পয়েন্টের উপর দিয়ে এগোতে হবে,' পান-পাত্রে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন তিনি,

'যতদূর মনে হচ্ছে, আসামী নির্দোষ। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ চাই।'

শহীদ একটা সিগারেট ধরাল। তারপর সে তার তদন্তের আনুপূর্বিক বিবরণ দিল। রিজভী সাহেব নীরবে শুনলেন। শেষে বললেন, 'আপনি যেভাবেই হোক মিসেস আফরোজা রহমানের সন্ধান করুন। ভদ্রমহিলা গা-ঢাকা দিয়েছেন নিশ্চয়ই। তার অবশ্যই একটা কারণ আছে। উনি এমন কিছু জানেন যা কোন কারণে প্রকাশ করতে আপত্তি আছে তাঁর। হয়ত তাঁর কাছেই আছে রহস্যের চাবি-কাঠি।'

'আমারও তাই ধারণা। আমি অবশ্য আমার এক বন্ধুকে লাগিয়ে দিয়েছি মিসেস আফরোজার খোঁজ করার জন্যে।'

চা এসে গেল। আবু মুরাদও ফিরে এল।

রিজভী সাহেব তাকে বললেন, 'আরে ভাই মুরাদ সাহাব, মিসেস রহমানের কোন পাত্তা মিলেছে নাকি? উনি নাকি ভেগে গেছেন?'

আবু মুরাদ অবাক হল। সে বলল, 'ভাগবেন কেন উনি! নিশ্চয়ই ওঁকে তার বাসায় পাওয়া যাবে।'

'আরে, না ভাই না। চিড়িয়া উড় গিয়া। আপনি দেখুন তো চেষ্টা করে, তাঁর কোন খোঁজ পান কিনা? দেখুন না একবার বাসায় ফোন করে, যদি ফিরে এসে থাকেন?'

আবু মুরাদ বেরিয়ে গেল। নিচু গলায় আলাপ করতে লাগল শহীদ ও রিজভী সাহেব।

মুরাদ ফিরে এল মিনিট পনের পরে। সে বলল, 'আপনার কথাই ঠিক। মিসেস রহমান নাকি কয়েকদিন আগে কোথায় চলে গেছেন। তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তাঁর খোঁজ জানতে চেষ্টা করবেন দয়া করে। বাই দ্য ওয়ে, আপনি কি সেই লোকটা, মানে কুলী হোসেনকে দেখেছেন কখনও?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন রিজভী সাহেব।

তাঁর দৃষ্টির সামনে একটু সঙ্কুচিত হয়ে গেল আবু মুরাদ। সে বলল, 'লোকটাকে দেখেছি বটে, এই হোটেলেই আসত মাঝে মাঝে। আমাদের এক রিসেপশনিস্ট আছে শাহানারা বেগম নামে। তার সাথে কথা বলতে দেখেছি অনেকদিন।'

শহীদ চমকে উঠল। কিন্তু রিজভী সাহেব উৎসাহিত হলেন, 'তাই নাকি! সে তাহলে চেনে কুলী হোসেনকে?'

'আসল পরিচয় জানে কিনা তা অবশ্য জানি না। এমনও হতে পারে, মিথ্যা পরিচয়ে সে শাহানার সাথে আলাপ করেছে।'

'সেটা অবশ্য সম্ভব। তা আপনাদের সেই রিসেপশনিস্ট মহিলা এখন আছেন

নাকি এখানে?'

'জ্বি, না, সকালে ওর ডিউটি ছিল। তাছাড়া শুনেছি, সে নাকি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে।'

'অলরেডী ছেড়ে দেয়নি তো? তাহলেই হবে। কাল সকালে তাকে পাকড়াও করব।'

ঘড়ি দেখল শহীদ। রাত ন'টা বেজে গেছে। 'এবার আমি উঠি রিজভী সাহেব?' সে বলল।

'আরে উঠবেন তো, যাবেন কোথায়? এখন তো আজিম সাহেবের বাসায় যেতে হবে। রাত সাড়ে ন'টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আপনিও যাবেন আমার সাথে। তাছাড়া···।'

'মুরাদ সাহেব, আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাবেন? আমরা আজিম সাহেবের বাসায় যাচ্ছি।'

'দরকার নেই। সারাটাদিন ডিউটি দিয়েছেন, এখন ঘরে ফিরে বিশ্রাম করুন গে। পথ চেয়ে বসে আছেন নিশ্চয়ই মিসেস,' সহানুভূতির সুরে বললেন রিজভী সাহেব।

'আমার ওসব বালাই নেই,' হাসল মুরাদ।

'অ্যাঁ, তাই নাকি! তাহলে তো আছেন বেশ, সাহেব! বিয়ে না করে ভালই করেছেন। বিয়েটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অভিশাপ।'

দু'বছর আগে ডাক্তাররা যখন সাইফুল আজিম সাহেবকে অন্তত কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন তখন তিনি তাঁর নিজস্ব অফিস মতিঝিল থেকে স্থানান্তরিত করে নিজের বাসভবনে স্থাপন করেছিলেন। পরে চিকিৎসকরা যখন অকপট ভাষাতেই বললেন, তাঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে, বড়জোর ছ'মাস পরমায়ু আছে, তিনি তখন অফিস এনে বসালেন তাঁর শয়নকক্ষে। কিন্তু ডাক্তাররা যাই বলুন, শয্যাশায়ী থেকেই তিনি তাঁর ম্যানেজারের অকৃত্রিম সহায়তায় সাফল্যের সাথেই কোম্পানির কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। অদ্ভুত তাঁর মনোবল, অসামান্য তাঁর কর্মক্ষমতা আর কল্পনাতীত তাঁর জিদ। দেহ জীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মনোবলে তাঁর এতটুকু ভাঙন ধরেনি।

খাস-বেয়ারা সলিম শহীদ ও রিজভী সাহেবকে সাইফুল আজিমের কাছে নিয়ে গেলেন। শয্যাশায়ী শিল্পপতিকে বর্ণহীন মোমের মত লাগছিল। উঁচু কণ্ঠা, তোবড়ানো গাল, গর্তের মধ্যে বসে যাওয়া জ্বলজ্বলে দুটো চোখ, সব কিছুতেই গুরুতর অসুস্থতার লক্ষণ। কিন্তু তাঁর চিবুক আর শুকনো পাতলা ঠোঁটে দৃঢ়তার ছাপ অসুস্থতার চিহ্নকেও ম্লান করে দিয়েছে।

আজিম সাহেব অত্যন্ত দুর্বল কণ্ঠে অভ্যর্থনা জানালেন, 'আসুন।'

বিছানার ঠিক পাশেই দুটো চেয়ার। বোধহয় ওদের জন্যেই রাখা হয়েছে।

শহীদ ও রিজভী সাহেব ঢুকলেন। মিসেস জোবায়দা আজিম একটা চেয়ারে বসেছিলেন। তিনিও হাসিমুখে সম্বর্ধনা জানালেন।

ওরা বসতেই আজিম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'পারবেন আপনারা ছোকরা-টাকে বাঁচাতে?' তাঁর দুর্বল কণ্ঠে ব্যাকুলতা।

শহীদ মুখ খুলতে যাচ্ছিল। তার আগেই আজিম সাহেব বললেন, 'বেশি কথা আমি বলতে পারব না। অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করার সাধ্য আমার নেই। যা বলি শুনুন, বাধা দেবেন না। জোবায়দা, তুমি যাও তো, বউমা।'

'আরও কাছে আসুন, আমার মুখের কাছে।'

শহীদ ও রিজভী সাহেব তাঁদের মুখটা বাড়িয়ে দিলেন আজিম সাহেবের মুখের খুব কাছে।

'আমি জেদী মানুষ, এক কথার মানুষ। আমি একসময় বলেছিলাম, নাসিম যদি কখনও জুয়া বা স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে তাহলে ওকে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করব,' তিনি থামলেন। তাঁর শক্তি যেন ফুরিয়ে আসছিল। পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করলেন তিনি। 'আই ডু নাউ উইথড্র দ্যাট,...ওকে বাঁচাতে হবে। ও আমাদের বংশের একমাত্র সন্তান, বংশের প্রদীপ...হি মাস্ট বি সেভড। মি. রিজভী, টাকার জন্যে ভাববেন না। ব্ল্যাংক চেক দেব আমি,' থামলেন তিনি। ধীরে ধীরে তাঁর চোখ দুটো বুজে এল। ঠোঁট দুটো আবার একটু নড়ে উঠল। '...কুয়াশার সাথে কথা বলবেন।'

রিজভী সাহেব শহীদকে ইশারা করলেন, 'চলুন, লেটস গো।'

পরদিন শহীদ ও রিজভী সাহেব গেলেন নাসিমের সাথে দেখা করতে। মাঝারি গড়ন, স্বাস্থ্যবান সুদর্শন যুবক নাসিম। চেহারাটা করুণ, হয়ত দুর্ভাবনায়। ভঙ্গিটাও কেমন যেন অলস। রিজভী সাহেব ও শহীদকে দেখে সে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না। ভবিতব্যকে যেন সে মেনেই নিয়েছে, এমন একটা হতাশা তার চোখেমুখে যে ছাপটা ফেলেছে তা অপসৃত হল না। ধীর, ক্লান্ত পদক্ষেপে সে তার জন্যে নির্দিষ্ট চেয়ারটাতে বসল।

দু'জন মিলে জরীপ করল নাসিমকে।

হতাশার সুরে সে বলল, 'আপনারা কি মনে করেন যে, এই গোলমাল থেকে আমাকে উদ্ধার করা সম্ভব আদৌ! আমার তো মনে হয় না।'

রিজভী সাহেব জবাব দিলেন, 'ইয়ংম্যান, এত বিচলিত হচ্ছ কেন? এত হতাশ হবার কি আছে? ঘটনার রাতে কি কি ঘটেছিল তা সত্য করে আমাকে বল তাহলে তোমাকে অবশ্যই বাঁচাতে পারব।'

নাসিম তার বাঁ হাতের চেটো দিয়ে কপালটা ধীরে ধীরে মুছল। তারপর বলল,

'তা যদি আমি নিজেই জানতাম...!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

রিজভী সাহেব তাঁর ঝাঁটার মত দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'বাজে কথা বোলো না। আমাদের সময় কম। ঠাট্টার সময় এটা নয়।'

তাঁর দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসি হাসল নাসিম।

শহীদ বলল, 'দ্যাখো, আমরা সবাই তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। যদি যথার্থই বাঁচতে চাও তাহলে তুমি কতটা কি জানো তা আমাদের জানা দরকার। মিথ্যে কথা বললে অথবা কোন কথা চেপে গেলে তোমার কল্যাণ হবে না। উনি তোমার উকিল, পুলিস নন।'

'কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানি না।'

'আমার কথার জবাব দাও,' ধমক দিলেন রিজভী সাহেব। 'কুলী হোসেনের সাথে তোমার পরিচয় কত দিনের?'

'বছর খানেকের।'

'কোথায় আলাপ হয়েছিল প্রথমে?'

'আমাদের হোটেলে আসত সে।'

'ওর আড্ডায় তুমি জুয়া খেলেছ?'

'জ্বি, হ্যাঁ।'

'ত্রিশ হাজার টাকা ধার করেছ ওর কাছ থেকে এবং হেরেছ?'

'হ্যাঁ। আড্ডার লোকগুলোর হাতের প্যাঁচে···।'

'সেটা আমি জানতে চাইনি। টাকাটা শোধ দিয়েছ?'

'দিতে পারিনি।'

'এই ঘটনা কতদিনের?'

'মাস তিনেক হবে। তবে একদিনের নয়,. একসঙ্গে তো আর অত টাকা ধার নিইনি।'

'ফেরত দিয়েছ কত টাকা?'

'এক পয়সাও না। সে একসঙ্গে সব টাকা চেয়েছিল। ১০ মার্চের মধ্যে টাকাটা শোধ দিতে বলেছিল। অন্যথায় পরিণাম খারাপ হবে বলে শাসিয়েছিল।'

'কি ধরনের পরিণাম হবে তার কোন আভাস দিয়েছিল?'

'কুলী হোসেন বলেছিল যে, সে আমার চাচাকে জানাবে। তাছাড়া আমাকে খুন করতেও তার বাধবে না। খুন নাকি সে অনেক করেছে।'

'১০ মার্চ সন্ধ্যায় হোটেল সোনিয়ার পার্টিতে তুমি কি তোমার ছোট চাচী ও মিসেস আফরোজা রহমানের কাছে টাকার ব্যাপারটা তুলেছিলে এবং ড. আজিমের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে দেবার জন্যে ওদের অনুরোধ করেছিলে?'

'করেছিলাম।'

'জবাব কি পেয়েছিলে?'

'ছোট চাচী বলেছিলেন, তিনি চাচাকে বলবেন, চাচা নিশ্চয়ই রাজি হবেন। বলতে গেলে তিনি আমাকে ভালরকম আশ্বাসই দিয়েছিলেন।'

'আর মিসেস রহমান?'

'উনি উল্টো আমাকে বকেছিলেন।'

'পার্টি শেষ হয়ে গেলে তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

'বড় চাচার বাসায়। সেখান থেকে গিয়েছিলাম কুলী হোসেনের আড্ডায়। ওর দেখা পাইনি। দিন সাতেক আগে ওর সাথে শেষ দেখা হয়েছিল। ভেবেছিলাম, টাকাটার জন্য সেদিন সে নিজেই আড্ডায় থাকবে। কিন্তু এল না। ওর অপেক্ষায় খেলতেও বসেছিলাম। খেলতে বসে দু'পেগ হুইস্কি পান করেছিলাম। দ্বিতীয় পেগটা খাবার পর থেকেই আমার কেমন যেন অসুস্থ মনে হতে লাগল। ক্রমেই অসুস্থতা বাড়তে লাগল। সব জিনিসই যেন দুটো করে দেখতে লাগলাম। কেমন যেন বমি বমি ভাব লাগছিল, মাথাটাও স্থির রাখতে পারছিলাম না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম।'

'তোমার কি মনে হয়, মদের সাথে আর কোন দ্রব্য খাইয়েছিল?'

'এখন তো আমার তাই মনে হচ্ছে। তবে তখন তা মনে হয়নি।'

'তারপর কি করলে?'

'সোজা বাসায় চলে গেলাম।'

'মিথ্যা কথা বোলো না!' গর্জন করে উঠলেন রিজভী সাহেব।

নাসিম মাথা নত করল।

'সত্যি কথাটা বল।'

কোন জবাব দিল না নাসিম।

'তুমি হোটেল সোনিয়াতে গিয়েছিলে। সেখান থেকে এক ইয়ং লেডী তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেয়। ঠিক না?'

মাথা নাড়ল নাসিম।

'তুমি যখন জুয়োর আড্ডা থেকে বেরোও তখন ক'টা বাজে?'

'দশটার বেশি হবে।'

'জুয়োর আড্ডায় তোমার পরিচিতদের মধ্যে কাউকে দেখেছিলে?'

'আমার দু'একজন বন্ধু আগে যেত। আমার অবস্থা দেখে ওরা সরে পড়েছে। তবে মুরাদকে মাঝে মাঝে দেখতাম।'

'কাকে?'

'মুরাদকে। আবু মুরাদ। চাচার প্রাইভেট সেক্রেটারি।'

'সে কি!' শহীদ বিস্ময় প্রকাশ করল। 'সে নাকি কুলী হোসেনকে চেনেই না!'

'তোমার কি মনে হয়, সেই তোমাকে মাদক দ্রব্য খাইয়েছিল?' রিজভী সাহেব প্রশ্ন করলেন।

'তা হবে কি করে? সে তো তখন স্টেশনে, ওর ময়মনসিংহ যাবার কথা ছিল।'

'হুঁ, তাহলে কাকে সন্দেহ কর?'

'কুলী হোসেনকে সন্দেহ হয়। হয়ত সেই কাউকে বলে দিয়েছিল।'

'মুরাদ ছাড়া আর কোন পরিচিত লোককে তুমি জুয়ার আড্ডায় দেখনি?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নাসিমের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন রিজভী সাহেব।

ইতস্তত করল নাসিম কিছুক্ষণ। তারপর দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলল, 'ন্-না। আর কাউকে দেখিনি।'

শহীদ বুঝল, মিথ্যে বলছে নাসিম। তাহলে কে সে? শাহানারা?

'একথা কি ঠিক যে, কুলী হোসেন বাড়াবাড়ি করলে তুমিও তাকে দেখে নেবে বলে পার্টিতে তোমার চাচীর কাছে বলেছিলে, আর এই জন্যেই নাকি তুমি তোমার গাড়ির গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে সবসময় রিভলভার রেখে দিতে?'

'বলেছিলাম বটে একথা,' স্বীকার করল নাসিম।

'আর একটা কথা—তোমার জানা নেই বোধহয় যে, মিসেস আফরোজা গা-ঢাকা দিয়েছেন?'

'সে কি! কেন?' বিস্ময় প্রকাশ করল নাসিম।

'সেটাই আমরা জানতে চাই। তোমার কোন আইডিয়া আছে?'

'কিছুমাত্র না।'

'তোমার বাথরুমের কুজিটে যে টেপ-রেকর্ডার আর ওয়াল-স্নুপার পাওয়া গেছে সেগুলো কি তোমারই?'

'কি পাওয়া গেছে?'

'টেপ-রেকর্ডার ও ওয়াল-স্নুপার।'

'আমার কুজিটে টেপ-রেকর্ডার!' আকাশ থেকে পড়ল যেন নাসিম। 'না, আমার টেপ-রেকর্ডার নেই। কখনও ছিল না। তাছাড়া ওয়াল-স্নুপার শব্দটাই শুধু আমি শুনেছি, এখন পর্যন্ত দেখিনি জিনিসটা।'

'অথচ সেগুলো তোমার কুজিটেই পাওয়া গেছে।'

'আমি দুঃখিত। এ সম্পর্কে কিছুই আমি বলতে পারছি না। ওগুলো আমার নয়, শুধুমাত্র সেইটুকুই আমি জানি।'

ইন্টারভিউ-এর সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। রিজভী সাহেব ঘড়ি দেখে বললেন, 'মিসেস রহমান সম্পর্কে তোমার কিছু জানা আছে?'

'তেমন কিছু জানি না। ভদ্রমহিলা পশ্চিম বাংলার লোক। বাবা ছিলেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কর্মচারী। করাচীতে পোস্টিং ছিল। সেখানেই ওর বিয়ে হয়। বিয়ের পর জানা গেল, তার স্বামী ভদ্রলোক একটা ক্রিমিন্যাল। জেল-পলাতক আসামী। বিয়ের এক সপ্তাহ পরে পালিয়ে যান তিনি। ভদ্রলোক এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন

বলে শুনেছি, মিসেস রহমান ঢাকা চলে আসেন। সেই থেকেই বিধবা বলে পরিচয় দিচ্ছেন তিনি। ছোট চাচা ওঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মিসেস রহমানের আইনত তালাক নেওয়া হয়নি বলেই তিনি রাজি হননি। পরে চাচা করাচীতে বিয়ে করেন।'

ওয়ার্ডার এসে বলল, 'সময় শেষ হয়ে গেছে। উঠতে হবে এবার।'

সাত

মিসেস রহমানের খোঁজ শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। মীরপুরে তাঁর এক দূর সম্পর্কের মামার বাসায় আছেন উনি। খবর পেয়েই তাঁর সাথে দেখা করতে গেল শহীদ। কামালও তার সঙ্গী হল।

বড় সড়কের উপর গাড়ি থেকে নামল দু'জন, ডাইনে কাঁচা রাস্তা ধরে এগোতে লাগল। এদিকটা মোটামুটি ফাঁকা। সরকারের দখল করা জমি। ইটের পাঁজা। প্রায় একশ'গজ দূরে একটা নতুন অসমাপ্ত একতলা বাড়ি। তার সামনে একটা ছোটখাট বাগান।

কামাল বলল, 'এই বাড়িটাই। মিসেস রহমানের মাতুলালয় এটা। এখানে বনবাসে এসেছেন তিনি।'

বারান্দায় এক বৃদ্ধ সংবাদ-পত্র পড়ছিলেন।

শহীদ ডাকল, 'শুনছেন?'

ভদ্রলোক চোখ তুলে তাকালেন এবং দু'জন ভদ্রলোককে গেটের কাছে দেখতে পেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন।

'কাকে চাই?'

'মিসেস রহমান থাকেন এই বাড়িতে? মিসেস আফরোজা রহমান?'

আশঙ্কায় ভদ্রলোকের মুখটা মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ওদের দু'জনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, 'কোত্থেকে আসছেন আপনারা?'

'পুলিস ডিপার্টমেন্ট থেকে।'

'পুলিস আপনারা?'

'মিসেস রহমান এখানে আছেন, আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরিছি,' শহীদ বলল ভদ্রলোকের প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে।

ভদ্রলোক কাঁপাকাঁপা গলায় বললেন, 'অ্যারেস্ট করতে এসেছেন আফরোজাকে? কিন্তু মেয়ে তো আমাদের নির্দোষ!'

'সে বিচার আদালত করবে। তাছাড়া আমরা ওঁকে অ্যারেস্ট করতে আসিনি। কয়েকটা কথা জানতে এসেছি।'

ভদ্রলোক শহীদকে বিশ্বাস করলেন বলে মনে হল না। নিতান্ত অনিচ্ছায়

বললেন, 'আসুন আপনারা।'

শহীদ ও কামালকে ড্রইংরুমে বসিয়ে ভদ্রলোক ভিতরে চলে গেলেন। মিনিট দশেক অপেক্ষা করবার পরে মিসেস আফরোজা রহমান এসে ঢুকলেন। ওরা দু'জন উঠে দাঁড়াল।

মূর্তিমতী বিষাদ যেন এসে দাঁড়িয়ে আছে ওদের সামনে। মহিলা সুন্দরীই। তিরিশের মত বয়স হবে। ক্লান্ত বিষণ্ন চেহারা। মাথা ভর্তি তৈলহীন অবিন্যস্ত চুল। বড় বড় চোখ দুটো ফোলা ফোলা, সম্ভবত অত্যন্ত কান্নাকাটির ফলেই। এমন একটা মূর্তি দেখতে হবে তা ওরা কল্পনাই করেনি। এই বিষণ্নতা নকল নয়। একে প্রশ্ন করা যে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেবার সামিল তা-ও ওরা বুঝতে পারল। কিন্তু কেন এই কান্না? কেন তাঁর এই বেদনা? ভদ্রমহিলা কেন অন্তর্ধান হয়েছেন, কেনই বা লোকচক্ষুর আড়ালে চোখের পানি ফেলেছেন?

ছোট্ট একটা আদাব দিলেন মিসেস রহমান। তারপর অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'বসুন। পুলিসের পক্ষ থেকে এসেছেন, তা কারণটা জানতে পারি কি?'

তিনজনই বসল।

শহীদ একটু ইতস্তত করে বলল, 'প্রথমেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমার মিথ্যা ভাষণের জন্য। আমি পুলিসের লোক নই। আমার নাম শহীদ খান, আমি একজন সৌখিন গোয়েন্দা। ইনি আমার বন্ধু, কামাল। আপনার সাথে আমাদের দেখা করা অত্যন্ত প্রয়োজন বলেই মিথ্যা পরিচয় দিতে হয়েছিল। তাছাড়া আরও একটা কারণে ক্ষমা চাইব। আমার মনে হচ্ছে, যে বিশ্রী দায়িত্ব পালন করতে আমি এসেছি তা আপনার পক্ষে সুখকর হবে না। হয়ত বেদনাদায়ক হবে। অথচ উপায় নেই।'

'কুলী হোসেন হত্যা-মামলার কানেক্শনে এসেছেন আপনারা! বলুন, যা জিজ্ঞেস করার আছে।' ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ভদ্রমহিলা। 'কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানি না।'

মিসেস রহমানের চোখের দিকে তাকাল শহীদ, 'তাহলে আপনি এমনভাবে গা-ঢাকা দিয়েছেন কেন? কোন সাক্ষী যদি পালিয়ে যায় তাহলে আমাদের কাজ হল, পলায়নের কারণটা নির্ণয় করা।'

মিসেস রহমান কোন জবাব দিলেন না। শাড়ির আঁচল আঙুলে জড়াতে লাগলেন তিনি।

'আমাদের উকিলের ধারণা, কুলি হোসেন হত্যা মামলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হচ্ছেন আপনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নাসিম নির্দোষ। অথচ তার নির্দোষিতা প্রমাণ বহুলাংশে আপনার উপর নির্ভর করছে।'

'কিন্তু আমি যে কিছুই জানি না! বললেন মিসেস রহমান। তাঁর কণ্ঠে অসহায়তার সুর।

শহীদ স্থির দৃষ্টিতে মিসেস রহমানের দিকে তাকাল। তারপর অতি নিচু গলায় অথচ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলল, 'দেখুন মিসেস রহমান, আপনার সন্ধান যখন আমরা পেয়েছি তখন আদালতে আপনাকে আমরা সাক্ষী মানবই এবং তখন উকিলের জেরার কাছে আপনি টিকতে পারবেন না।'

ভদ্রমহিলার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখা দিল। মুখটা মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

'আমাকে, আমাকে আদালতে দাঁড়াতে হবে!'

'হ্যাঁ, সাক্ষীর কাঠগড়ায়।'

'না না!' অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলেন ভদ্রমহিলা। 'প্লীজ, শহীদ সাহেব, এতটা নিষ্ঠুর হবেন না। আপনারা কি বুঝতে পারছেন না যে কাঠগড়ায় দাঁড়াবার ভয়েই আমি আত্মগোপন করে আছি?'

'কিন্তু তাতে করে যে নির্দোষ একটা লোকের ফাঁসী হয়ে যেতে পারে। সেটা কি আপনার কাম্য?'

শহীদের প্রশ্নের জবাব দিলেন না মিসেস রহমান। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে করুণকণ্ঠে আবেদন জানালেন, 'প্লীজ, আমাকে মাফ করুন।'

'তা হয় না, মিসেস রহমান। একটা নির্দোষ লোকের জীবন শুধু আপনার খামখেয়ালীতে ধ্বংস হয়ে যাবে, এটা হতে পারে না।'

'আমি যদি বলি যে, নাসিমই খুন করেছে, তাহলে?' ফোঁস করে উঠলেন মিসেস রহমান।

'সেটা যদি সত্যি হয় তাহলে তাই বলবেন। কিন্তু সত্য ঘটনা আপনি জানেন।'

'মাফ করবেন, আমি কিছুই বলতে পারব না। দরকার হলে আদালতেই যা বলবার বলব।'

'বেশ, তবে সেই ভাল। তবে আমাদের কাছে আগে সত্যটা প্রকাশ করলে অনেক হেনস্তা, অনেক হয়রানি থেকে রক্ষা পেতেন। আমরা এখন গিয়ে পুলিসকে আপনার ঠিকানা দেব। আয় কামাল, ওঠ্।'

উঠে দাঁড়াল শহীদ। কামালও উঠে দাঁড়াল।

মিসেস রহমান গমনোদ্যত অতিথিদের ডাকল. 'শুনুন।'

'বলুন?' দাঁড়াল শহীদ।

'বসুন আপনারা।'

'দ্যাটস্ লাইক এ গুড গার্ল।' বসল শহীদ। 'বস কামাল। বলুন, মিসেস রহমান?'

'আমি একজনকে রক্ষার জন্যে আত্মগোপন করে রয়েছি।' আমতা আমতা করে বলল মিসেস রহমান।

'কে সে? কুলী হোসেন?'

মিসেস রহমান প্রশ্নটা শুনে হকচকিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'তিনি তো মারাই গেলেন।' তাঁর চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল।

'তাহলে কে? ড. আজিম?'

মুহূর্তের জন্যে মনে হল, মিসেস রহমান অস্বীকার করবেন। তারপর তিনি মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ,তাঁকেই।'

'বেশ, তাহলে আসল ঘটনাটা খুলে বলুন?'

'আমি খুব ভাল মিথ্যাবাদী নই, শহীদ সাহেব। অনেকবার মিথ্যা বলতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু বলতে পারিনি।'

'তা বুঝতে পারছি।'

'কিন্তু মিথ্যে পরিচয় দিয়ে সমাজে তো নির্বিঘ্নে বসবাস করে আসছেন।'

মুহূর্তের মধ্যে ক্রোধে লাল হয়ে উঠল মিসেস রহমানের মুখ। তিনি তীব্রকণ্ঠে বললেন, 'ওকথা বলবার কোন অধিকার আপনার নেই, শহীদ সাহেব।'

শহীদ প্রতিবাদ করল না। 'কুলী হোসেন আপনার স্বামী ছিলেন?' পাল্টা আক্রমণ চালাল সে।

বিস্ময়ে ও ক্রোধে মিসেস রহমান বাক্‌হীন হয়ে গেলেন। কি যেন বলতে গেলেন। কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। তাঁর মুখটা ধীরে ধীরে মোমের মত সাদা হয়ে গেল।

'জবাব দিন?' কঠোর শোনাল শহীদের কণ্ঠস্বর।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন মিসেস রহমান। আঁচলে মুখ লুকালেন তিনি।

শহীদ সিগারেটের প্যাকেট বের করল। কামালকে সিগারেট দিয়ে নিজে একটা সিগারেট ধরাল।

কাঁদছেন মিসেস রহমান। কাঁদতে দাও ওঁকে। একটু শান্ত হোক। আবেগের প্রাবল্যের অবসান হোক। দুর্বল মুহূর্তে সমস্ত সত্য তাঁর মুখ দিয়ে আপনাআপনি বেরিয়ে আসবে।

নীরবে সিগারেট টানতে লাগল শহীদ।

কয়েক মিনিট পরে মিসেস রহমান আত্মস্থ হলেন। আঁচলে মুখ মুছে বললেন, 'ওর সাথে আমার বিয়ে হয়েছিল।'

'তালাক হয়নি?'

'না।'

'আর সেই জন্যেই আপনি ড. আজিমকে বিয়ে করেননি?'

'জ্বি, হ্যাঁ।'

'আপনি তালাক চেয়েছিলেন?'

'না। মেয়েদের বিয়ে একবারই হয়, শহীদ সাহেব।

'কিন্তু সে যে ক্রিমিন্যাল!' অবাক হয়ে গেল শহীদ।

কি বিচিত্র রমণী মন! কামালও অবাক হয়ে মিসেস রহমানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সিগারেটে টান দিতে ভুলে গেল সে।

'হোক ক্রিমিন্যাল, কিন্তু সে তো আমার স্বামী। পৃথিবীর সবাই যদি তাকে ঘৃণা করে তাহলেও আমি তাকে ক্ষমা করব।'

'ওহ্, তাহলে এই জন্যেই আপনি নাসিমের নির্দোষিতা প্রমাণে এগিয়ে যেতে চান না? এই জন্যেই আপনি গা-ঢাকা দিয়েছেন?' শহীদ কঠিনস্বরে বলল।

মিসেস রহমান মাথা নাড়লেন।

'না, তা নয়। আমি একজনকে বাঁচাতে চাই, তাই আমি লুকিয়ে আছি।'

'ড. আজিমকে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কেন?'

'সবই বলব। আপনাদের কাছে কোনকিছুই লুকোব না। আপনারা বাধা দেবেন না আমাকে। আমার মত করে বলতে দিন। কিন্তু সকলের আগে একটা কথা আপনাদের জানানো দরকার।'

'বলুন?'

'নাসিম সেরাতে যাকে খুন করেছে বলে বলা হচ্ছে তিনি, অবাক হবেন না আপনারা, কুলী হোসেন নন।'

ভীষণভাবে চমকে উঠল শহীদ ও কামাল।

'হোয়াট,' কামাল চিৎকার করে উঠল।

'কি বলছেন আপনি!' আকাশ থেকে যেন পড়ল শহীদ।

'ঠিকই বলছি আমি। ও লাশটা আমার স্বামীর নয়, অন্য কারও।'

শহীদের বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। সে বলল, 'লাশটা কুলী হোসেনের নয়! অন্য লোকের? এ আপনি কি বলছেন! লাশ যে যথারীতি সনাক্ত করা হয়েছে,' অবিশ্বাসের সুর তার কণ্ঠে।

কান্নার চেয়েও করুণ হাসি হাসলেন মিসেস আফরোজা রহমান। 'বললুম তো, আমাকে বাধা দেবেন না। আপনারা ভাল করে তদন্ত করলেই আমার বক্তব্যের সত্যতা প্রকাশিত হবে।'

'তাহলে কার লাশ ওটা?'

'তা আমি বলতে পারছিনে। যতদূর মনে হয়, তাদের গ্যাংয়ের কোন লোক হবে। লোকটা যে কে, সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার।'

'কুলী হোসেন তাহলে কবে মারা গেছে?'

'ঐ ঘটনার পাঁচ সাতদিন আগে।'

'কিভাবে?'

'তাকেও খুন করা হয়েছে।'

'কেন, সে সম্পর্কে কোন ধারণা আছে?'

'পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছিল সে। অপরাধী জীবনের উপর তার ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। জীবনটাকে তার দুর্বিষহ, যন্ত্রণা-পীড়িত বলে মনে হচ্ছিল। আপনারা কুয়াশার নাম শুনেছেন?'

'শুনেছি।'

'আমি যা করতে পারিনি উনি সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছিলেন।'

'যেমন?'

'ওকে ভাল হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনিই। অথচ লোকে জানে, কুয়াশাও একটা ক্রিমিন্যাল। এটা কতবড় মিথ্যা!'

'তারপর?'

'কুয়াশা বলেছিলেন, সরকার যাতে ওকে ক্ষমা করেন তার জন্যে উনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।'

'তাহলে সেটাই আপনার স্বামীর মৃত্যুর কারণ? কিন্তু কে তাকে হত্যা করেছে, সে সম্পর্কে কোন ধারণা আছে আপনার?'

'সঠিক ধারণা নেই। তবে সম্ভবত ওদের দলপতির নির্দেশেই এটা হয়ে থাকবে।'

'দলপতিকে চেনেন? মানে, কুলী হোসেন সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলেছিল?'

'না, এ ব্যাপারে সে খুব চাপা ছিল। তাছাড়া ও প্রসঙ্গ তুললেই সে খুব ভয় পেতো। তার নাম তো দূরের কথা, তার প্রসঙ্গও কখনও তুলত না। লোকে জানত, সে-ই দলপতি। কিন্তু আসলে দলপতি ছিল অন্য লোক।'

'আপনার সাথে নিয়মিত দেখাশোনা হত আপনার স্বামীর?'

'ছয়মাস আগে আমি ওকে আবিষ্কার করি। ওর সাথে আমার ছাড়াছাড়ি হয়েছিল ছয় বছর আগে। নতুন করে ওকে দেখতে পাবার পর থেকে প্রায়ই দেখা হত। তখন থেকেই সে তার পঙ্কিল জীবন থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে হাঁসফাঁস করছিল। কিন্তু তার পরিণাম কি হবে তা সে জানত। তাই আমার শত উৎসাহতেও সে সাহস পেত না। শেষটায় কুয়াশা ভরসা দিয়েছিলেন ওকে।'

'আপনার স্বামীর মৃত্যুর খবর কুয়াশা জানে?'

'উনিই আমাকে খবরটা দিয়েছিলেন।'

অনেকক্ষণ তিনজনই চুপ করে রইল।

সমস্ত ব্যাপারটায় অদ্ভুত রকমের গোলযোগ পাকিয়ে গেছে। শহীদ জট অনেকটা ছাড়িয়ে এনেছিল কিন্তু মিসেস রহমানের কাছে যে অচিন্তনীয় কাহিনী সে শুনল তাতে করে সমস্ত ব্যাপারটা আরও প্রহেলিকাময় বলে মনে হতে লাগল তার

কাছে।

নীরবতা ভঙ্গ করে সে বলল, 'কিন্তু তাতে করে আসল সমস্যার তো সমাধান হচ্ছে না?'

কামাল বলল, 'কেন নয়? লোকটা যদি কুলী হোসেন না হয়ে অন্য কেউ হয় তাহলে নাসিমের হত্যার কোন মোটিভই থাকতে পারে না। সুতরাং তাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করা কঠিন হবে না।'

শহীদ হেসে বলল, 'ব্যাপরটা অত সহজ নয়। সে ক্ষেত্রেও মোটিভ থাকতে পারে নাসিমের। কারণ নিহত লোকটা কুলী হোসেন না হয়ে তার কোন এজেন্ট হলেও মোটিভ একই থাকে। তাছাড়া লাশটা যে কুলী হোসেনের তা প্রমাণের জন্যে সরকার পক্ষের কৌসুলী চেষ্টার ত্রুটি করবে না। সে যাক, এখন ১০ মার্চের ঘটনা সম্পর্কে আপনি কি জানেন, সেটাই আমাদের বলুন, মিসেস রহমান।'

মিসেস রহমান জবাব দিলেন না। তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শহীদ। একটু পরে অধৈর্য হয়ে বলল, 'ড. আজিমের বিদায় উপলক্ষে আপনি যে পার্টি দিয়েছিলেন তাতে নাসিম আপনার কাছে ত্রিশ হাজার টাকা চেয়েছিল?'

'আমার কাছে চায়নি। বলেছিল, আমি যেন ওর চাচাকে টাকাটার কথা বলি।'

'আপনি কি জবাব দিয়েছিলেন?'

'আমি ভর্ৎসনা করেছিলাম। ভেবেছিলাম, এতে ওর শিক্ষা হবে। ভবিষ্যতে আর ওসব নোংরামির মধ্যে যাবে না। কিন্তু পরিণাম যে সত্যি এমন হবে, ভাবতে পারিনি।'

'পরিণাম সম্পর্কে আভাস কিছু দিয়েছিল নাসিম?'

'তা দিয়েছিল। বলেছিল টাকাটা না পেলে কুলী হোসেন ওর চাচার কানে ব্যাপারটা তুলতে পারে, তাছাড়া খুনোখুনি করাটাও বিচিত্র নয়। সাংঘাতিক লোক ওরা। তবে সেও প্রস্তুত আছে। দরকার হলে সে দেখে নেবে।'

'আর তার জন্যেই সে গাড়ির গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে রিভলভার রাখে, একথা সে বলেছিল?'

'হ্যাঁ, বলেছিল।'

'তখন আর কে কে ছিল সেখানে?'

'আমি ছিলাম আর ছিল জোবায়দা অর্থাৎ মিসেস আজিম।'

'আর কেউ?'

'স্মরণ হচ্ছে না। হয়ত আর কেউ ছিল না। আবু মুরাদ থাকলেও থাকতে পারে।'

'তারপর?'

'তারপর, ...দেখুন শহীদ সাহেব, আমি এখন এমন একটা ঘটনা বলব যা আপনাদের বিশ্বাসযোগ্য মনে না-ও হতে পারে। কিন্তু পরে যদি ঠিকমত খোঁজ

নেন তাহলে হয়ত আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হতেও পারে। এবং অনেকটা ঐ ঘটনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে ১০ মার্চের রাতের হত্যা-রহস্যের সমাধান। তবে রহস্যের সবটা আমারও জানা নেই। গোটা ব্যাপারটাই গোলমেলে।'

'বলুন?'

'জোবায়দার সাথে আপনাদের আলাপ হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'ওর সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কি?'

'এটা বড় কঠিন প্রশ্ন,' শহীদ বলল। 'মাত্র একবার তাঁর সাথে আমার কিছুক্ষণ কথা হয়েছে। একবার আলাপ করে কোন ইমপ্রেশন সৃষ্টি হলে তা শেষপর্যন্ত নির্ভুল না হওয়াই স্বাভাবিক।'

'তা বটে,' স্বীকার করলেন মিসেস রহমান। 'যাকে আপনারা এখন মিসেস আজিম বলে জানেন, সে ছিল লাহোরের চলচ্চিত্র জগতের একস্ট্রা। অপূর্ব রূপসী হলেও অভিনয় ক্ষমতা না থাকায় বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি সে। লাহোরেই ওর সাথে আলাপ হয় খুরশীদের বছর দুয়েক আগে এবং সে তাকে একেবারে বিয়ে করে নিয়ে আসে। মেয়েটার মধ্যে আছে অদ্ভুত একটা আকর্ষণী শক্তি যা দিয়ে সে সহজেই মুগ্ধ করতে পেরেছিল খুরশীদের মত খেয়ালী লোককেও,' একটু হাসলেন মিসেস রহমান।

'কিন্তু ইদানীং তার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছিল খুরশীদের মনে। অথচ জোবায়দা তাকে এমনভাবে বশীভূত করেছিল যে, সে তার কবলমুক্ত হতে পারছিল না। তাছাড়া স্রেফ সন্দেহের বশে কারও কোন ক্ষতি করার মত মনোবৃত্তিও তার ছিল না। এদিকে ভিতরে ভিতরে তার সন্দেহ প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং তার ক্ষুব্ধ স্বামী প্রতিশোধের জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হাতে কোন প্রমাণ ছিল না তার। সে তালাক দেবে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু কারণ তো একটা চাই? স্ত্রী যদি যথার্থই অবিশ্বাসিনী হয় তাহলে তাকে একলাখ টাকা দেন মোহর আর খোরপোষ দিতে সে রাজি নয়। এই অবস্থায় সে নিজেই স্ত্রীর সতীত্ব পরীক্ষা করবে বলে স্থির করে। তাছাড়া স্ত্রী কার আসক্ত তাও সে জানতে চেয়েছিল। প্ল্যানও ঠিক করে ফেলেছিল। সেই অনুযায়ী খুরশীদ ১০ মার্চে চট্টগ্রামের গভীর জঙ্গলে কি একটা গবেষণা কাজে যাবে বলে ঘোষণা করল। সন্ধ্যায় আমি পার্টি দিলাম। সেখান থেকে খুরশীদ, মুরাদ ও জোবায়দা চলে গেল স্টেশনে। মুরাদও ঐ রাতেই ময়মনসিংহ চলে গেল।'

একটু থামলেন মিসেস রহমান। তারপর দম নিয়ে বললেন, 'খুরশীদকে ট্রেনে তুলে দিয়ে জোবায়দা একটা ট্যাক্সিতে চাপল। ওদিকে পিছনের দরজা দিয়ে নামল খুরশীদ। আগেই এক বন্ধুর কাছ থেকে পুরানো একটা গাড়ি ধার করে স্টেশনে নিয়ে রেখে দিয়েছিলাম আমি ওর জন্যে। সেই গাড়িতে চড়ে খুরশীদ জোবায়দাকে

অনুসরণ করল।'

'অর্থাৎ ট্রেনে দু'জনের একজনও রইল না, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

'আমি আগেই ওর পরিকল্পনা জানতাম। বারবার নিষেধ করেছিলাম, শোনেনি।'

'মিসেস আজিম কি করলেন?'

'পুরানো শহরের একটা হোটেলে গিয়ে উঠল জোবায়দা। হোটেলটার নাম সম্ভবত জারকা।'

'হ্যাঁ, ইমামগঞ্জে ঐ নামে একটা হোটেল আছে শুনেছি,' কামাল বলল।

'তারপর?'

তার প্রেমিক ছিল সেখানেই।

'ড. আজিম কোথায় ছিলেন?'

'পাশের রুমটা খালি ছিল। সেখানে সে তার থাকবার ব্যবস্থা করে ফেলল। রুমে ঢুকেই দেয়ালে একটা সুপার লাগিয়ে দিল সে। আর ছিল তার সঙ্গে একটা টেপ-রেকর্ডার। ওদের সমস্ত কথাই রেকর্ড হতে লাগল। ইয়ারফোনে সমস্তটাই সে শুনল।'

'আপনি সাথে ছিলেন?'

'আমি!' আঁতকে উঠলেন মিসেস আফরোজা রহমান।

'মাফ করবেন, কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?'

'আমাকে সে পরে জানিয়েছে।'

'চট্টগ্রাম থেকে?'

'না, আগে শুনুন। কিছুক্ষণ পরে জোবায়দা চলে গেল। বলে গেল, সে ঘন্টাখানেক পরে ফিরে আসবে। নাসিমকে জানিয়ে আসবে যে, সে তার মামার বাসায় যাচ্ছে।'

'তারপর?'

'সেখানেই খুরশীদ জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করে বসল। সে ভাবল যে, সে পাশের রুমে গিয়ে লোকটাকে মোকাবেলা করে তাকে বেকায়দায় ফেলে একটা বিবৃতি আদায় করবে এবং তার ভিত্তিতে সে জোবায়দাকে তালাক দেবে। তাছাড়া লোকটা কে, তাও জানতে ইচ্ছে হয়েছিল তার। কুলী হোসেন নামটা সে হোটেলের রেজিস্টারে দেখেছে। কিন্তু তার সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না খুরশীদের। কুলী হোসেনের রুমটায় তখন ম্লান নীল বাতি জ্বলছিল। খুরশীদ রুমে ঢুকতেই লোকটা তার চোখের উপর অত্যন্ত শক্তিশালী ফ্লাশলাইট জ্বালিয়ে দিল। তীব্র আলোয় খুরশীদ মুহূর্তের জন্যে একেবারে অন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু লোকটা তাকে চিনতে

পারল। বুঝতে পারল, ক্রুদ্ধ স্বামী তার উপর প্রতিশোধ নিতে এসেছে। খুরশীদের দৃষ্টি স্বাভাবিক হবার আগেই সে খুরশীদের দিকে একটা চেয়ার ছুঁড়ে মারল এবং ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। খুরশীদ পকেট থেকে রিভলভার বের করে লোকটাকে ভয় দেখাতে লাগল। রিভলভারটা নাসিমের। সেটা সে নাসিমের গাড়ি থেকে আগেই সরিয়েছিল। নাসিম জানত না। লোকটা রিভলভারটা ওর কাছ থেকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল এবং ধস্তাধস্তির ফাঁকে একটা গুলি বেরিয়ে গেল সেটা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে পড়ে গেল লোকটা। পরিস্থিতি অনুধাবন করতে দেরি হল না খুরশীদের। গুলির শব্দ শুনে যদি কেউ এগিয়ে আসে তাহলে সে ধরা পড়বেই। সুতরাং সে হোটেল থেকে দ্রুত বেরিয়ে সোজা চলে এল আমার বাসায়। ঘটনাটা আমাকে খুলে বলল এবং সেই রাতেই সে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ভৈরব চলে গেল। সেখান থেকে অন্য একটা ট্রেনে চট্টগ্রাম পৌঁছুল। যাবার সময় বারবার করে আমাকে বলে গেল, পরদিন সকালেই যেন জোবায়দা বোরখা পরে চট্টগ্রাম যায়। তার বিশ্বাস, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে হয়ত জোবায়দা রাজি হবে তার প্রস্তাবে। দু'জনই দু'জনকে অ্যালিবাই দেবে,' একটু হাসলেন মিসেস রহমান। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'স্বভাবতই জোবায়দা হোটেলে ফিরে গিয়ে তার প্রেমিককে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে ফিরে আসে। ওর মামা বলতে ঢাকা শহরে আর কেউ নেই। রাতেই সে বাসায় ফিরবে জানতুম। অনেকবার ফোন করলাম তাকে, পেলাম রাত একটায়। তাকে তার স্বামীর অভিপ্রায় জানালাম। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সে পরদিন খুব সকালে একটা ট্যাক্সি করে চট্টগ্রাম চলে গেল বোরখা পরে।'

'তারপর!'

'এর বেশি আমি কিছু জানি না। সাতদিন আগে মৃত কুলী হোসেন বেঁচে উঠল কি করে, আর হোটেলে নিহত লোকটার মৃতদেহ রাস্তায় কি করে গড়াগড়ি খেল তা আমার জানা নেই। তবে ওকাজটা যে খুরশীদ করেনি, তা আমি জানি।'

'ড. আজিম চট্টগ্রাম থেকে কোন খবর পাঠিয়েছেন?'

'কয়েকদিন আগে একটা টেলিগ্রাম করেছিলেন। তাতে শুধু একটাই কথা লেখা ছিলঃ জোবায়দা আর আমার মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেছে।'

'আর কিছুই নয়? নাসিম সম্পর্কে কোন কিছু?'

'না।'

'ফোন করেছিলেন?'

'তাও করেনি।'

'তাহলে কি ধরে নেব যে, নাসিমের যদি ফাঁসি হয় তাহলেও ড. আজিম নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন?'

'অবশ্যই নয়। দরকার হলে সে সত্য কথাই বলবে। অন্তত ওদের বংশের

একমাত্র দুলালকে বাঁচাবার জন্যে সে সব কিছুই করতে রাজি আছে। তাছাড়া এটা তো সত্যি কথাই যে, সে আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই খুন করেছিল লোকটাকে, আর ইচ্ছাকৃত ভাবেও সে খুন করেনি। আদালতে সেই কথাই সে বলবে।'

'তাতে খুব লাভ হবে না। বিশেষ করে মৃতদেহটা ঐভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করাতে তার কেসটা ঢিলে হয়ে গেছে।'

'কিন্তু বিশ্বাস করুন, ওটুকুতে তার সত্যিই কোন ভূমিকা ছিল না।'

শহীদ ভাবছিল—আসল রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে হাজারটা রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে গেছে, অনেক চমকপ্রদ কাহিনী জানতে পারা গেছে, অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা কানে এসেছে কিন্তু মূল রহস্যটা এখনও আগের মতই অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

বিজ্ঞের মত কামাল বলল, 'আমার কি মনে হয় জানিস, শহীদ? নিহত প্রণয়ীর লাশটা জোবায়দা নিজেই রাস্তায় এনে গাড়ি-চাপা দিয়েছে।'

মিসেস রহমান বললেন, 'জোবায়দা কেন এ কাজ করতে যাবে?'

'কারণ,' কামাল বলল, 'কেউ না কেউ হয়ত লোকটার সাথে জোবায়দার গোপন সম্পর্কের কথা জানত। ফলে, লাশ যথাযথভাবে সনাক্ত হলে তার উপর সন্দেহ হবার অবকাশ থাকে। সে ঝুঁকি জোবায়দা নিতে পারে না। সুতরাং লাশটাকে বিকৃত করে সত্য পরিচয় মুছে ফেলে মিথ্যা পরিচয় দানের ব্যবস্থা করে তার নিজের জড়িত থাকার প্রমাণ নষ্ট করা তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কুলী হোসেনের সাথে নাসিমের টাকা-পয়সার ব্যাপারটা সে শুনেছিল। কুলী হোসেনের হুমকি আর নাসিমের পাল্টা হুমকিও সে শুনেছে। সুতরাং সে লাশটাকে কুলী হোসেনের লাশ বলেই চালিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে আর নাসিমকে জড়াবার জন্যে তার গাড়িটা ব্যবহার করেছে। আর এটাও তো ঠিক যে, যে এই কাজটা করেছে সে নাসিমের অতি ঘনিষ্ঠ। অন্যথায় নাসিমের রুমে ঢুকে তার গাড়ির চাবি সংগ্রহ করা বাইরের কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে জোবায়দা ছাড়া এটা আর কে করতে পারে?'

মিসেস রহমান সবটা মন দিয়ে শুনে বললেন, 'আপনার ব্যাখ্যায় যুক্তি আছে মানি, তবু জোবায়দা এতটা করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হতে চায় না।'

কামাল হাসল, 'অথচ আপনি যে ঘটনার বিবরণ দিলেন তা আপনার নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। তবু আপনি জানেন যে, তার সবটা সত্য এবং আমরাও, অন্তত আমি, পুরোটাই বিশ্বাস করেছি। আমি যা বললাম, তা হল আপনার বর্ণিত ঘটনার সম্ভাব্য লজিক্যাল পরিণতি।'

মিসেস রহমান কি যেন বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন।

'তোর কি ধারণা, শহীদ?'

এতক্ষণ ধরে সে-ও ভাবছিল কথাটা। কামালের ব্যাখ্যার মধ্যে যুক্তি আছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে পুরো ঘটনাটার ব্যাখ্যা নেই। মৃতদেহের বুক-পকেটে কুলী

হোসেনের ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া গিয়েছিল। বাঁ হাতের তাবিজের ভিতরে তার নাম পাওয়া গিয়েছিল। এটা হয়ত নকল হতে পারে, কিন্তু লাইসেন্সটা নকল নয়। তাছাড়া আসল হোক বা নকল হোক ঘটনার পর মুহূর্তেই জোবায়দার পক্ষে সেগুলো জোগাড় করা সম্ভব হল কি করে? নিশ্চয়ই সেটা তখনি হোক আর আগে হোক কেউ তাকে দিয়েছিল। সেই লোকটাই বা কে? আর সর্বোপরি নিহত লোকটার আসল পরিচয় কি? সেই লোকটাই কি কুলী হোসেনের গ্যাং-এর প্রকৃত দলপতি? আরও একটা প্রশ্ন, ঐ বিশেষ রাতেই নাসিমকে মাদক দ্রব্য খাওয়ানো হল কেন? কে খাওয়াল তাকে? সবক'টা প্রশ্ন একই সূত্রে আবদ্ধ। এর একটার যথার্থ জবাব পাওয়া গেলে অন্যগুলোরও জবাব সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে।

সে জবাব দিল, 'এইমুহূর্তে আমি কিছু বলতে পারছি না। আরও একটু খোঁজ খবর নিতে হবে আমাকে।'

ফেরার পথে নীরবে সে গাড়ি চালিয়ে যেতে লাগল। কামালও চুপ করে বসে রইল। হঠাৎ কেমন যেন একটা অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করল শহীদ।

কামাল জিজ্ঞেস করল, 'কি হল রে?'

'উহ্, আমি একটা আস্ত অপদার্থ! ছিঃ ছিঃ অকারণে অন্ধকারে হাতড়ে মরছি! শোন, তুই আজ রাতেই চলে যাবি চট্টগ্রামে। যেভাবেই হোক, যেখান থেকেই হোক, ড. খুরশীদ আজিমকে পাকড়াও করে নিয়ে আসবি। পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার আমার বন্ধু। তাকেও আমি আজকেই খবর পাঠাব। আনতেই হবে তাঁকে।'

'জো হুকুম, জাহাঁপনা।'

আট

আদালতকক্ষে সেদিন ভিড় হয়েছিল বেশ। আসামী নাসিম কাঠগড়ায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পেশকার নথি-পত্র এগিয়ে দিল অতিরিক্ত দায়রা জজ কাসেম এলাহী সাহেবের টেবিলে। উকিলরা জায়গা মত গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। শহীদ এখনও আদালতে পৌঁছেনি। রিজভী সাহেব তাকে জরুরী কাজে পাঠিয়েছেন।

আদালতের নির্দেশে সরকারী কৌসুলী মামলার অভিযোগের বিবরণ পেশ করলেন এবং সাক্ষীদের ডাক দেবার আবেদন জানালেন। প্রথম সাক্ষী ড. আহমদ মীর। তিনি মৃতদেহের ময়না তদন্ত করেছেন। তিনি জানালেন যে, মাথায় বুলেট ঢুকে কুলী হোসেন মারা গেছে। বুলেট বিদ্ধ ক্ষতস্থানের বর্ণনাও তিনি দিলেন এবং মৃতদেহ থেকে প্রাপ্ত বুলেটটাও প্রমাণ হিসাবে দেখানো হল। অন্যান্য এক্সিবিটও রাখা ও সনাক্ত করা হল।

রিজভী সাহেব জেরা করলেন না। নীরেন সেন ফিসফিস করে কি যেন তাঁকে

বলল। তিনি মাথা নাড়লেন।

একটি .২২ অটোমেটিক আদালতে দেখানো হল এবং লাইসেন্স ও নম্বর ইত্যাদি দ্বারা প্রমাণ করা হল যে, ওটা নাসিমেরই সম্পত্তি।

আদালত রিজভী সাহেবকে জেরা করার সুযোগ দিলেন। কিন্তু এবারও তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন।

দ্বিতীয় সাক্ষী হচ্ছেন ব্যালিস্টিক এক্সপার্ট মমতাজ শেখ। তিনি জানালেন যে, তিনি অটোমেটিকটার গুলি পরীক্ষা করেছেন এবং সেটাকে মৃতব্যক্তির মাথায় ও আহত কনস্টেবলের হাতে পাওয়া দুটো বুলেটের সাথে মিলিয়ে দেখেছেন এবং বুলেট দুটো যে আদালতে প্রদর্শিত অটোমেটিক থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এবারও জেরা করলেন না রিজভী সাহেব।

মহামান্য দায়রা জজ একটু বিস্মিত হলেন। তিনি রিজভী সাহেবকে তাঁর দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আসামীর কৌসুলী হিসেবে তার পক্ষ সমর্থন করার জন্যেই আপনি এখানে এসেছেন এবং আদালতে আসামীর পক্ষ যাতে যথাযথভাবে সমর্থিত হয় সেটা দেখাই আপনার কর্তব্য।'

রিজভী সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। তিনি সবিনয়ে বললেন, 'আমার জিজ্ঞাসা করার কিছু নেই, ধর্মাবতার। প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই জেরা করব।'

তৃতীয় সাক্ষী আবু মুরাদ। তাঁকে যথারীতি ডাকা হল, শপথ নিলেন তিনি। নাম, ঠিকানা, বয়স, পেশা ইত্যাদি প্রশ্ন করা হল।

নাটকীয় ভঙ্গিতে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন সহকারি পাবলিক প্রসিকিউটর এনাম আহমদ। পোকায় কাটা কালো কোটটার বোতাম দুটো লাগিয়ে চশমাটা খুলে হাতে নিয়ে ভ্রূকুটি করে মুরাদ সাহেবের দিকে তাকালেন তিনি। তারপর হাতটা তুলে আসামীর দিকে ইশারা করে বললেন, 'আপনি আসামী নাসিমুল আজিমকে চেনেন?'

'চিনি, নিশ্চয়ই চিনি।'

'কতদিন হল?'

'বছর খানেক।'

'গত ১০ মার্চ আপনি কোথায় কাজ করতেন?'

'আজিম ইণ্ডাস্ট্রির মালিক আজিম সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে।'

'১০ ও ১১ মার্চের মাঝখানের রাতে আপনি কোথায় ছিলেন? কি কি কাজ করেছেন?'

'সন্ধ্যায় একটা পার্টি ছিল হোটেল সোনিয়ায়। সেটায় অ্যাটেণ্ড করে ড. খুরশীদ আজিমের অর্থাৎ আসামীর চাচার সাথে ঢাকা স্টেশনে গিয়েছিলাম। মিসেস আজিমও সঙ্গে ছিলেন। ড. আজিম গেলেন চট্টগ্রামে আর আমি ময়মনসিংহে।'

'কোন্ ট্রেন আগে ছেড়েছিল?'
'চট্টগ্রামের ট্রেন।'
'ড. আজিমকে ট্রেনে তুলে দিয়েছিলেন?'
'হ্যাঁ।'
'উনি কি একাই গিয়েছিলেন?'
'না। ওঁর স্ত্রী ছিলেন সাথে। সেটা অবশ্য আগে ঠিক ছিল না। আমি তা জানতামও না। পরে শুনলাম, উনিও চলে গেছেন।'
'হোটেল সোনিয়াতে সেদিন কিসের পার্টি ছিল?'
'ড. আজিমের বিদায় উপলক্ষে তাঁর একবন্ধু মিসেস আফরোজা রহমান পার্টি দিয়েছিলেন।'
'আপনি ছিলেন সে পার্টিতে?'
'জ্বি, হ্যাঁ।'
'ময়মনসিংহ থেকে ফিরলেন কবে?'
'তিনদিন পরে, অর্থাৎ ১৪ মার্চ।'
'আসামীর সাথে সর্বশেষ দেখা হয়েছে আপনার কবে?'
'১০ মার্চের রাতে পার্টিতে।'
'কোনও কথা হয়েছিল?'
'হ্যাঁ। সে বলেছিল, কুলী হোসেন নামে একটা লোকের কাছ থেকে সে ত্রিশ হাজার টাকা ধার নিয়ে জুয়া খেলেছিল। সবটাই সে হেরে গিয়েছিল। সেদিনই টাকাটা ফিরিয়ে দেবার লাস্ট ডেট ছিল অথচ সে টাকা জোগাড় করতে পারেনি। কুলী হোসেন হয়ত ক্ষতি করতে পারে, সেইরকমই শাসিয়েছে নাকি লোকটা। হয়ত ওর চাচার কানে কথাটা তুলবে। এমন কি খুনোখুনি করাটাও বিচিত্র নয়।'
'এটা কি আপনি আগেও শুনেছিলেন?'
'আগেও আমাকে বলেছিল সে। আমি কিছু করতে পারি কিনা জানতে চেয়েছিল।'
'ঐ কথাগুলো কি পার্টিতে আর কারও কাছে বলতে শুনেছেন?'
'মিসেস আফরোজা ও মিসেস আজিমের কাছেও বলেছিল।'
'আপনার সামনেই?'
'আমি একটু দূরে ছিলাম। তবে শুনতে অসুবিধা হয়নি।'
'ওঁরা কি বললেন?'
'সহানুভূতি না দেখিয়ে উল্টো ভর্ৎসনা করেছিলেন।'
'আসামী তখন কিছু বলেছিল?'
'বলেছিল যে, তার কাছেও রিভলভার আছে। সে দেখে নেবে। একটা লোক নাকি তার পিছনে পিছনে ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'লোকটা কে?'

'কুলী হোসেনের এক সাগরেদ বলে জানিয়েছিল আমাকে।'

'আর কিছু বলেছিল?'

'না। তবে মনে হয়েছিল...'

'আপনার কি মনে হয়েছিল তা আদালত জানতে চায় না।'

শহীদ এই সময় আদালতের মধ্যে ঢুকল, তার হাতে একটা কাগজের প্যাকেট। সে ঢুকতেই নীরেন সেন তার দিকে এগিয়ে এলেন। শহীদ নিঃশব্দে তার হাতের প্যাকেটটা তুলে দিয়ে বেরিয়ে গেল। নীরেন সেন রিজভী সাহেবের হাতে প্যাকেটটা তুলে দিল। দ্রুত হাতে প্যাকেটটা খুললেন তিনি। প্রাপ্ত কাগজ-পত্রগুলো নাড়াচাড়া করে তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। পিছন দিকে তিনি শহীদের খোঁজ করলেন। কিন্তু শহীদ তার আগেই বেরিয়ে গিয়েছে।

'আমার জেরা এখানেই শেষ,' বললেন এনাম আহমদ।

'আসামীর পক্ষের কৌসুলী জেরা করবেন নিশ্চয়ই?'

'নিশ্চয়ই।'

'আচ্ছা মি. মুরাদ, আপনি সাধারণত ট্রেনে কোন্ শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন?'

'ইন্টারক্লাসে যাতায়াত করি।'

'ঠিক বলছেন?'

'জ্বি, হ্যাঁ।'

'সর্বশেষ ময়মনসিংহ গিয়েছিলেন কোন্ ক্লাসে?'

'ইন্টার ক্লাসে।'

'আপনার হয়ত জানা নেই যে পি. ই. রেলওয়ে ইন্টার ক্লাস নামক ক্লাসটা তুলে দিয়েছেন?'

'ও, জ্বি, হ্যাঁ। ওটা এখন সেকেণ্ড ক্লাস হয়েছে। তবে দীর্ঘদিনের অভ্যাস তো।'

'আপনার ট্রেন ছেড়েছিল ক'টায়।'

'সাড়ে দশটায়।'

'১০ মার্চ সন্ধ্যায় আপনি কি ইমামগঞ্জের জারকা হোটেলে গিয়েছিলেন?'

'নিশ্চয় না।'

'আপনি কুলী হোসেনকে চেনেন?'

'নাম শুনেছি, চোখেও দেখেছি। তবে আলাপ করার সৌভাগ্য আমার হয়নি।'

'ড. আজিমের সঙ্গে আপনার শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল কবে?'

'যে রাতে তাঁকে ট্রেনে তুলে দিলাম।'

'তারপর আর দেখা হয়নি?'

'না।'

'টেলিফোনে আলাপ হয়েছে অথবা চিঠিপত্র পেয়েছেন?'

'ফোনে আলাপ হয়েছিল যেদিন আমি ময়মনসিংহ থেকে ফিরে এলাম সেইদিন। উনি তখন কয়েক ঘন্টার জন্যে চট্টগ্রাম ফিরেছিলেন। চিঠি-পত্র অবশ্য পাইনি।'

আবু মুরাদের ভাবভঙ্গির মধ্যে এমন দৃঢ়তা ছিল যাতে তার কথাগুলোকে আদালতকক্ষের অনেকের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছিল। জজ সাহেব গভীর মনযোগ দিয়ে তার কথা শুনছিলেন।

'আমার আর প্রশ্ন নেই।'

কাঠগড়া থেকে নেমে গেল আবু মরাদ।

রিজভী সাহেব বললেন, 'ইওর অনার, ইনভেস্টিগেটিং অফিসার খালেকদাদ সাহেব সাক্ষীকে আমি প্রশ্ন করতে চাই।'

এনাম আহমদ সাহেব বোধহয় আপত্তি প্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু জজ সাহেব অনুমতি দিলেন।

খালেকদাদ সাহেব কাঠগড়ায় উঠলেন। শপথ নিলেন। নাম, পরিচয়, বয়স, পেশা জানালেন।

'আপনি খালেকদাদ সাহেব?' রিজভী সাহেব প্রশ্ন করলেন। 'আপনি কি করেন?'

'আমি রমনা থানার পুলিস অফিসার।'

'গত ১০ মার্চ রাত ন'টার পর থেকে কোথায় ছিলেন?'

'ডিউটিতে ছিলাম।'

'গুলিতে কনস্টেবল আহত হয়েছে, এই খবর পেয়েছিলেন ক'টায়?'

'রাত সাড়ে বারটায়।'

'কিভাবে?'

'টেলিফোনে।'

'তখুনি রওয়ানা হলেন?'

'জ্বি, হ্যাঁ।'

'গিয়ে কি দেখলেন?'

'দেখলাম, রাস্তার উপর একটা মানুষের মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে। মাথাটারও একটা দিক ভেঙে গেছে।'

'কনস্টেবলকে কি অবস্থায় দেখলেন?'

'তাকে আগেই হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল।'

'আপনি কি করলেন?'

'মুদ্দাফরাশ ডেকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লাশটা গাড়িতে তুলে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।'

'লাশ সনাক্ত করেছেন কে?'

'কুলী হোসেনের জুয়ার আড্ডার কয়েকজন লোক। শাখাপুর হোটেলের কর্মচারীরা।'

'কিভাবে সনাক্ত হল?'

'লোকটার গলায় একটা তাবিজ ছিল। সেটা অবশ্য ভেঙে চেপ্টে গিয়েছিল। ভাঙা তাবিজটার মধ্যে একটা কাগজে উর্দুতে তার নাম লেখা ছিল—কুলী হোসেন।'

'উর্দু পড়তে পারেন আপনি?'

'কিছু কিছু।'

'অন্য কোন পরিচয় চিহ্ন ছিল?'

'বুক পকেটে ঠিকানা ছিল, ড্রাইভিং লাইসেন্সও ছিল। শাখাপুর হোটেলে থাকত সে। সেখানে যোগাযোগ করলাম। তারা বলল, ঐ নামে একজন লোক তাদের হোটেলের বোর্ডার। তারা তার কাপড়চোপড় সনাক্ত করল। তাবিজটাও।'

'আর কি বলল?'

'বলল যে, গত কয়েকদিন ভদ্রলোক হোটেলে ফেরেননি।'

'ক'দিন?'

'দিন সাতেক।'

'টাকা-পয়সা দিত?'

'মাসিক ভাড়ায় থাকত সেখানে কুলী হোসেন।'

'আসামীকে গ্রেফতার করছে কে?'

'আমিই করেছি।'

'রিভলভারটা কোথায় পেয়েছেন?'

'আসামীর গাড়ির গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে।'

'আসামীর গাড়ির সন্ধান পেলেন কি করে?'

'আহত কনস্টেবলটা গাড়ির নাম্বার টুকে নিয়েছিল। তার কাছ থেকে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার নিয়ে ঐ গাড়িটা কার তা ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট থেকে জেনে নিয়ে আসামীর বাসায় যাই।'

'গাড়িটা কোথায় ছিল?'

'আসামীর বাড়ির গ্যারেজে।'

'দরজা খুলে দিয়েছিল কে?'

'গ্যারেজের?'

'না, বাসার।'

'একটা চাকর।'

'গ্যারেজের দরজা?'

'আসামী নিজেই।'
'আসামীকে গিয়ে কি অবস্থায় দেখেছেন?'
'চাকরটা বলল যে, আসামী তখন গোছল করছিল।'
'গ্যারেজে গাড়ি ক'টা ছিল?'
'একটাই।'
'কি অবস্থায় ছিল?'
'গাড়ির সামনের উইং-এ রক্তের দাগ ছিল পর্যাপ্ত।'
'আসামীকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন?'
'করেছিলাম।'
'সে কি জবাব দিয়েছে?'
'সে বলেছে, এ সম্পর্কে সে কিছুই জানে না।'
'আমার আর প্রশ্ন নেই, ইওর অনার,' রিজভী সাহেব বললেন।
'আপনি কোন প্রশ্ন করবেন?' এনাম আহমদ সাহেবকে প্রশ্ন করলেন জজ সাহেব।
'জ্বি, ইওর অনার,' উঠে দাঁড়ালেন সহকারী সরকারি কৌসুলী।
'করুন তাহলে।'
'খালেকদাদ সাহেব, আপনিই তো আসামীর বাসায় গিয়েছিলেন?'
'জ্বি, হ্যাঁ।'
'তখন ক'টা বাজে?'
'সাতটা হবে।'
'আসামী তখন গোসল করছিল?'
'জ্বি, হ্যাঁ।'
'গোসল শেষে আপনার সাথে সে যখন দেখা করতে এল তখন তাকে দেখে আপনার কি মনে হয়েছিল?'
'আপত্তিকর প্রশ্ন, অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন, ইওর অনার। ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের কি মনে হয়েছিল, তাতে কিছু আসে যায় না,' শীরেন সেন উঠে দাঁড়িয়ে বলল।
'প্রশ্নটা আমি বাতিল করছি।'
'আমার আর কোন জিজ্ঞাস্য নেই।'
পরের সাক্ষী কনস্টেবল নিজামুদ্দৌলা। সে এসে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াল। শপথ গ্রহণ ও নাম ঠিকানা ইত্যাদি দেবার পর সরকারি কৌসুলী তাকে জেরা করা শুরু করলেন।
'১০ মার্চ রাতে আপনার ডিউটি ছিল?'
'জ্বি, স্যার। পেট্রল ডিউটি ছিল আমার।'
'একা?'

'না স্যার, আরও দু'জন ছিল।'
'আপনার সঙ্গেই ছিল তারা?'
'ওরা অন্য দুটো গলিতে ঢুকেছিল।'
'আপনি সেই রাতে রিভলভারের গুলিতে আহত হয়েছিলেন?'
'জ্বি, হ্যাঁ।'
'ঘটনাটা কি করে ঘটেছিল, খুলে বলুন।'
'আমি একটা গলির ভিতর থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠলাম। একটা গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াতেই রাস্তার আলোতে দেখলাম, একটা গাড়ি একবার সামনে ও একবার পিছনে যাওয়া আসা করছে। আমি ভাবলাম···।'
'আপনি কি ভাবলেন তার দরকার নেই। কি করলেন তাই বলুন?'
'আমি গাড়িটার নম্বর টুকে নিলাম।'
'নম্বরটা বলুন?'
নম্বর বলল কনস্টেবল।
'গাড়িটা কি রং-এর?'
'সাদা রং-এর।'
'কি গাড়ি?'
'তা বলতে পারব না। সব রকম গাড়ি আমি চিনি না।'
'রাস্তায় কি স্পষ্ট আলো ছিল?'
'স্পষ্টই। রাস্তার বাতিটা বেশি দূরে ছিল না।'
'গাড়িটার বাতি জ্বলছিল নিশ্চয়ই?'
'জ্বি, না।'
'গাড়ির ভিতরে যে ছিল তাকে দেখতে পেয়েছিলেন?'
'জ্বি, না।'
'যখন নম্বর লিখছিলেন তখন গাড়িটার কতটা দূরে ছিলেন আপনি?'
'হাত পনের দূরে। একটা গাছের আড়ালে। সেখানেই দাঁড়িয়ে আমি নম্বরটা লিখেছিলাম।'
'তারপর কি করলেন?'
'বাঁশি বাজালুম।'
'তারপর?'
'তারপর অকস্মাৎ আমার হাতে প্রচণ্ড বেদনা অনুভব করলাম। চিৎকার করে উঠেছিলাম আমি যন্ত্রণায়।'
'তারপর?'
'আর কিছু মনে নেই।'
'পথে আর লোক ছিল না?'

'তখন ছিল না। জায়গাটা নিরিবিলি। বাড়ি-ঘর বেশ অনেকটা দূরে দুরে।'
'আসামীকে আপনি আগে কখনও দেখেছেন?'
'জ্বি, না।'
'গাড়ির ভিতরে যখন ছিল তখন?'
'জ্বি, না।'
'আমার জেরা এখানেই শেষ, ইওর অনার।'
'মি. রিজভী, এনি কোশ্চেন?'
'জ্বি, ইওর অনার।'
'করুন।'
'নিজামুদ্দৌলা সাহেব, আমার একটাই প্রশ্ন আছে। আমার লার্নেড ফ্রেণ্ড প্রশ্নটা কেন করলেন না, ঠিক বুঝতে পারছি না। যখন আপনি গাড়ির নম্বর টুকেছিলেন তখন ক'টা বাজে?'
'নির্দিষ্ট করে বলতে পারব না। তবে তখন পৌনে বারটার বেশি হবে। তার কিছুক্ষণ আগেই আমি ঘড়ি দেখেছিলাম। তবে, ঠিক কতক্ষণ আগে, বলতে পারব না।'
'তাহলে রাত পৌনে বারটা থেকে বারটার মধ্যেই ঘটনাটা ঘটেছিল, বলতে পারি?'
'জ্বি, হ্যাঁ।'
'আপনার ঘড়িটা কোথায়?'
'আমি জখম হয়ে পড়ে যাওয়াতে ঘড়িটার ব্যালান্স স্টাফ ভেঙে গিয়েছিল। ওটা এক্সিবিট হিসেবে এখানে, মানে, আদালতে আছে।'
'ঘড়িটা ক'টার সময় ভেঙেছিল?'
'নিজে আমি নির্দিষ্ট করে তা বলতে পারব না। পরে ইনভেস্টিগেটিং অফিসার বলেছিলেন, ঘড়িটা বন্ধ হয়েছিল এগারটা পঞ্চান্ন মিনিটে।'
'তারমানে, ঘটনাটা তখনি ঘটেছিল, একথা বলা যায়?'
'জ্বি, হ্যাঁ। তা বলা যায়।'
'আর কোন প্রশ্ন নেই।'
পরের সাক্ষী মিসেস আফরোজা রহমান। কিন্তু তখন একটা বেজে গেছে। এক ঘন্টার জন্যে আদালতের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হল।
নীরেন সেনের চেম্বার আদালতের কাছেই একটা গলির মধ্যে। বিরতির সময় শহীদ ও রিজভী সাহেবকে নিয়ে নীরেন সেন সেখানেই চলে গেলেন। মিসেস রহমানও ওদের সঙ্গে গেলেন।
শহীদের জন্যে এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল সেখানে। সে বিস্ময়ের কারণ শাহানারা। শহীদ তাকে দেখে বিস্মিত হল. আর শাহানারা পেল লজ্জা। বেচারি

মাথাই তুলতে পারল না। শহীদও তার অবস্থাটা বুঝে তাকে এড়িয়ে গেল।

রিজভী সাহেব শাহানারাকে দেখে হাসলেন, 'কি খবর, ইয়ং লেডী?'

'খবর তো আপনার কাছে, রিজভী সাহেব। বলুন, কি হল?'

'হতে এখনও দেরি আছে। সবে তো শুরু।'

নীরেন সেন ব্যস্তভাবে সকলের বসবার ব্যবস্থা করলেন।

মিসেস রহমানকে এতক্ষণ শাহানারা খেয়াল করেনি। রিজভী সাহেবের সাথে কথার ফাঁকে তাঁকে দেখে তার মুখটা শুকিয়ে গেল।

রিজভী সাহেবের চোখে পড়েছিল ব্যাপারটা। তিনি বললেন, 'দেখুন মিসেস রহমান, ঢাকায় আসার পর থেকেই একটার পর একটা অবিশ্বাস্য কিছু ঘটছে এবং আমার কানে এসে পৌছুচ্ছে। তার মধ্যে একটা হল ১০ মার্চের রাতের ঘটনা সম্পর্কে আপনার বিবৃতি। তেমনি আর একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা এবারে আমি আপনার কাছে পেশ করতে চাই।'

শহীদ ফোনে চট্টগ্রামের লাইন ধরতে চেষ্টা করছিল। রিজভী সাহেবের কথা তারও কানে পৌছুল। সে কৌতূহলে রিজভী সাহেবের দিকে তাকাল।

রিজভী সাহেব শাহানারাকে দেখিয়ে বললেন, 'এই ইয়ং লেডীকে আপনি চেনেন?'

'চিনব না কেন! ও তো হোটেল সোনিয়ায় কাজ করে। রিসেপশনিস্ট।'

'কিন্তু আরও একটা পরিচয় তার আছে,' রহস্যজনক হাসি হাসলেন রিজভী সাহেব।

'কি সেটা?' কৌতূহল প্রকাশ করলেন মিসেস রহমান।

'এই তরুণী নাসিমের বাগদত্তা।'

'ওহ, তাই নাকি! এ তো সুখবর! সত্যি, আই লাইক হার ভেরি মাচ।'

লজ্জায় অধোবদন হল শাহানারা।

'কিন্তু এটাই শেষ বিস্ময় নয়। আরও একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে। শাহানারার বড় এক ভাই ছিল। সে রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। আজ পর্যন্ত তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি জানা গেছে, তার সেই ভাইটিই আপনার হতভাগা স্বামী কুলী হোসেন।'

সবাই ভীষণভাবে চমকাল। নীরেন সেনও বিস্মিত হলেন, শাহানারাও অবাক হল। মিসেস রহমান অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন শাহানারার দিকে। এই মেয়েটি যে তাঁর নিকট-আত্মীয় তা তিনি কোনদিন কল্পনাও করেননি। অবশ্য ওকে তিনি স্নেহের দৃষ্টিতেই দেখেছেন। অন্যদিকে কুলী হোসেন যে তার নিরুদ্দিষ্ট ভাই শাহানারা সম্প্রতি তা জানতে পারলেও মিসেস রহমান যে তারই ভ্রাতৃবধূ এটা সে কখনও কল্পনাও করেনি। সে-ও অবাক হয়ে চেয়ে রইল মিসেস রহমানের দিকে। তারপর তার চোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝরতে লাগল।

মিসেস রহমান উঠে গিয়ে শাহানারার পিঠে হাত রেখে দাঁড়ালেন। 'ছিঃ কাঁদে না, শাহানারা।' জবাবে শাহানারার আবেগ আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। মিসেস রহমানের বুকে মুখ লুকিয়ে সে ফোঁপাতে লাগল। উদগত অশ্রু জোর করে দমন করে মিসেস রহমান তার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন।

বিব্রত নীরেন সেন হাত কচলাতে লাগলেন।

শহীদ প্রশ্ন করল, 'কিন্তু এই গোপন খবর আপনি কোত্থেকে সংগ্রহ করলেন, রিজভী সাহেব?'

উত্তরে রিজভী সাহেব হেসে বললেন, 'ইউ ক্যান ওয়েল ইম্যাজিন মাই সোর্স।'

'সবই ভাল,' নীরেন সেন বলল। 'তবে জানেন তো, স্যার, কথায় বলে, সব ভাল তার শেষ ভাল যার।'

'জানি বৈকি? সে তো নির্ভর করছে আপনার দক্ষতার উপর। আসলে আপনিই তো ভরসা। কাজ যা কিছু করবার, আপনিই করছেন। বলতে গেলে আমি তো আপনাকে সামান্য সাহায্য করছি মাত্র।'

'হেঃ হেঃ হেঃ হে, কি যে বলেন, স্যার!' বিনয়ে বিগলিত হলেন নীরেন সেন।

নীরেন সেনের মুহুরী নাস্তার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু শহীদ ও নীরেন সেন ছাড়া আর কেউ তা স্পর্শ করল না। মিসেস রহমান ও শাহানারার আহার করার মত মানসিক অবস্থা ছিল না। রিজভী সাহেব বললেন, 'আমার একটু শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন। ওসব বাঙালী খাদ্যে এখন পোষাবে না,' ব্রিফকেস থেকে বিয়ারের বোতল বের করে বললেন, 'এর চাইতে ভাল নাস্তা এখন আর আমি করতে পারি না। ডোন্ট মাইণ্ড, লেডীজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন।'

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে শহীদ চট্টগ্রামের লাইন ধরতে চেষ্টা করছিল। অবশেষে পাওয়া গেল লাইন।

'হ্যালো, শহীদ বলছি, কামাল...পাওয়া যায়নি এখনও?...বিকেলে?...আচ্ছা, ঠিক আছে,' রিসিভার রেখে দিয়ে শহীদ রিজভী সাহেবকে বলল, 'এখনও পাওয়া যায়নি ড. আজিমকে।'

নীরেন সেন ঘড়ি দেখে বলল, 'স্যার, সময় হয়ে গেল। চলুন, যাওয়া যাক।'

'হ্যাঁ, চলুন।'

মিসেস রহমানও উঠলেন। শাহানারা চোখ-মুখ মুছে বলল, 'চল ভাবি, আদালত থেকে কিন্তু সোজা আমাদের বাসায় যেতে হবে।'

মাথা নাড়লেন মিসেস রহমান।

হাঁটতে হাঁটতে শহীদ রিজভী সাহেবকে বলল, 'আচ্ছা, রিজভী সাহেব, লোকটা খুন হবার পর ড. আজিম মিসেস রহমানের কাছে যে ঘটনা বিবৃত করেছিলেন আদলতে তা প্রকাশ করলে নাসিমের সুবিধা হয় না? এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আকস্মিকভাবেই তার রিভলভার থেকে গুলি বেরিয়ে গিয়েছিল।'

'তাতে কোনই লাভ নেই। সেটা হচ্ছে হিয়ার-সে এভিডেন্স। আদালতে ওর কোন দাম নেই। ড. আজিম নিজে যদি এই মামলার আসামী হতেন তাহলে ওটাকেই একটা জোরালো যুক্তি হিসাবে দাঁড় করানো যেত। তাছাড়া ওদিকটায় আমি যেতে চাই না। আমার লাইন আলাদা। কিন্তু সেক্ষেত্রেও সরকারি কৌসুলী হিয়ার-সে এভিডেন্সের প্রশ্ন তুলে আমাকে অসুবিধায় ফেলতে পারে।'

কাঁটায় কাঁটায় দুটোতে আদালত আবার বসল। জজ সাহেব এসে আসন নিলেন। আসামীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হল। উকিলরা আসন নিলেন। মিসেস আফরোজা রহমানকে ডাকা হল। তিনি শপথ নিলেন। নাম, বয়স ইত্যাদি বললেন।

সরকারি কৌসুলী গলা খাঁকারি দিলেন।

'মিসেস রহমান, আপনি কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামীকে চেনেন?'

'চিনি।'

'কতদিনের পরিচয় ওর সাথে?'

'এক বছর হবে। এর আগে আসামী বিদেশে ছিল।'

'তার সাথে সর্বশেষ দেখা আপনার কবে?'

'গত ১০ মার্চ সন্ধ্যায়।'

'কোথায়?'

'হোটেল সোনিয়ায়।'

'নির্দিষ্ট কোন উপলক্ষে?'

'জ্বি, হ্যাঁ।'

'কি সেটা?'

'আসামীর চাচা ড. আজিমের চট্টগ্রাম গমন উপলক্ষে আমি একটা বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলাম হোটেল সোনিয়ায়। তাতে ওকেও দাওয়াত করেছিলাম।'

'ঐ অনুষ্ঠানে বহুলোক ছিল নিশ্চয়ই?'

'না কয়েকজন মাত্র।'

'বেশ। মিসেস রহমান, অনুষ্ঠানে আসামীর সাথে আপনার কোন কথা হয়েছিল?'

'হয়েছিল।'

'কি সম্পর্কে?'

'সে বলেছিল, কুলী হোসেন নামে একটা লোকের নিকট থেকে সে ত্রিশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিল। সমস্তটাই সে জুয়াতে হেরেছে। এখন কুলী হোসেন তার কাছে টাকাটা ফেরত চাইছে। খুব চাপ দিচ্ছে। ঐদিনই টাকাটা ফিরিয়ে দেবার লাস্ট ডেট ছিল। দিতে না পারলে সে ক্ষতি করতে পারে।'

'কি ধরনের ক্ষতি করতে পারে তা কিছু বলেছিল?'

'বলেছিল, টাকাটা না দিতে পারলে কুলী হোসেন হয়ত ব্যাপারটা তার বড় চাচার গোচরে আনবে, অথবা হয়ত মারপিট করবে।'

'আসামীর বড় চাচার কানে গেলে কি কোন ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল?'

'আমি সঠিক জানি না। তবে শুনেছি উনি গোঁড়া পিউরিটান টাইপের লোক। যদি জানেন, নাসিম কোন নোংরামিতে জড়িত আছে, তিনি হয়ত তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারেন।'

'কিভাবে? সম্পত্তিতে আসামীর কি কোন অধিকার নেই?'

'যতদূর জানি, নেই।'

'ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করবেন?'

'ইওর অনার,' উঠে দাঁড়ালেন রিভজী সাহেব। 'প্রশ্নগুলো অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং এ প্রশ্নে আমার আপত্তি আছে।'

'ইওর অনার, প্রশ্নগুলো অপ্রাঙ্গিক নয়। কুলী হোসেনকে যে আসামীর খুন করার মোটিভ ছিল তা এই প্রশ্নের জবাবের ভিত্তিতেই আমি প্রতিষ্ঠা করতে চাই।'

'আপত্তি বাতিল। আপনি জবাব দিন,' জজ সাহেব বললেন।

'বলুন আপনি মিসেস রহমান, আমার প্রশ্ন ছিল, মি. আজিম অর্থাৎ আসামীর বড় চাচা কিভাবে ওকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারেন?'

'আমি যতদূর শুনেছি, আসামীর মানে নাসিমের বাবা নাসিমের দাদুর জীবদ্দশায় মারা যান। ফলে সম্পত্তির উপর আসামীর কোন দাবি নেই। তবে সে-ই বংশের একমাত্র সন্তান বলে স্বভাবতই তার বড় চাচা সম্পত্তিটা তাকেই লিখে দিয়ে যাবেন আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু সবাই জানে, নাসিম অসৎ পথে গেলে তাকে তিনি এক পয়সাও দেবেন না।'

'কিন্তু আসামীর ছোট চাচা ড. আজিমও তো নিঃসন্তান, অন্তত তিনি তো তাঁর সম্পত্তি নাসিমকে দিয়ে যেতে পারেন?'

'তা হয়ত পারেন, তবে...।'

'বলুন?'

'তাঁর স্ত্রী বর্তমান। সম্পত্তিটা তাঁকেও লিখে দেওয়া বিচিত্র নয়। তাছাড়া বড় ভাই-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার সাহস তাঁর তেমন নেই।'

'আসামী আর কিছু বলেছিল?'

'বলেছিল, কুলী হোসেন বাড়াবাড়ি করলে সে-ও দেখে নেবে।'

'কিভাবে?'

'বলেছিল যে, সে তার গাড়ির গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে সব সময়ই একটা রিভলভার রেখে দেয়। দরকার হলে সেটা সে ব্যবহার করবে।'

'একথাটা কি কুলী হোসেনের হুমকি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিল আসামী?'

মিসেস রহমান ঢোক গিলে বললেন, 'হ্যাঁ।'

'আসামী কি আপনার কাছে ধার শোধ করার টাকা চেয়েছিল?'

'ওর ছোট চাচা, মানে ড. আজিমের কাছ থেকে ওর অবস্থা জানিয়ে টাকাটা নিয়ে দিতে অনুরোধ করেছিল।'

'আপনাকে যখন এই কথাগুলো বলে তখন আর কে কে কাছে ছিল?'

'মিসেস আজিম ছিলেন, আর আবু মুরাদ সাহেব কাছেই ছিলেন। উনি শুনেছেন কিনা আমি সঠিক বলতে পারব না।'

'কথাগুলো কি একা আপনার উদ্দেশ্যেই বলেছিল?'

'না, দু'জনের উদ্দেশ্যেই বলেছিল।'

'আপনি কি জবাব দিয়েছিলেন।'

'আমি ওকে বকেছিলাম।'

'কেন?'

'ওসব কাজে আমার প্রশ্রয় নেই বলে।'

'মিসেস আজিম কি বলেছিলেন?'

'তিনিও আমার মত বকেছিলেন। তবে টাকাটা তার চাচার কাছ থেকে নিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন, বলেছিলেন।'

'আপনাদের অনুষ্ঠান শেষ হয় ক'টায়?'

'সাড়ে সাতটার দিকে।'

'তারপর?'

'ড. আজিম, মিসেস আজিম ও আবু মুরাদ স্টেশনে চলে যান।'

'আসামী?'

'সে-ও চলে গিয়েছিল। কিন্তু কোথায়, তা আমি জানি না।'

'পুলিস কয়েকদিন আপনাকে খোঁজ করে পায়নি। তাদের বিশ্বাস, আপনি গা-ঢাকা দিয়েছিলেন।'

'অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, ইওর অনার,' রিজভী সাহেব বললেন।

'নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক নয়,' জোর গলায় জবাব দিলেন এলাহী সাহেব।

'প্রশ্নটা বাতিল করে দেওয়া হল।'

'আমার কোন জিজ্ঞাস্য নেই।'

'জেরা করবেন?' জজ সাহেব আসামী পক্ষের কৌসুলীকে জিজ্ঞাসা করলেন।

রিজভী সাহেব গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালেন।

'মিসেস রহমান, বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আসামীর চাচা ড. আজিমের সাথে আপনার কোন কথা হয়েছিল?'

'অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক প্রশ্ন।'

'আমার এই প্রশ্নের জবাব চাই, ইওর অনার। আমার মনে হয়, পুরো আলাপ

আলোচনাটাকে একটা ইউনিট হিসেবে দেখতে হবে।'

'নিশ্চয়ই নয়,' সরকারি কৌসুলী জবাব দিলেন। 'আমার লার্নেড ফ্রেণ্ড যদি আসামীর সাথে সাক্ষীর আলোচনা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করতেন তাহলে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না।'

'আমার মনে হয় সরকারি কৌসুলী ঠিকই বলেছেন রিজভী সাহেব, আমি তাঁর আপত্তি গ্রাহ্য করলাম। সাক্ষীকে আপনি প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে চুলচেরা জেরা করতে পারেন। তাতে আমার আপত্তি থাকবে না।'

'আমার আর কোন প্রশ্ন নেই,' রিজভী সাহেব জানালেন।

পরবর্তী সাক্ষী মিসেস জোবায়দা আজিম।

তিনি এসে দাঁড়াতেই আদালতে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। তাঁর অসামান্য সৌন্দর্য, দৃপ্তভঙ্গী অথচ তাঁর দুটো বিষাদ মলিন বড় বড় চোখ সবাইকে মুগ্ধ করল। একটা গুঞ্জন উঠল মুহূর্তের জন্যে।

শপথ গ্রহণ করে নাম বয়স, ঠিকানা দিলেন তিনি। স্পষ্ট সুরেলা বাকভঙ্গীতে যে ঋজুতার পরিচয় দিলেন তিনি তাতে তাঁর প্রতি আদালত-কক্ষের উপস্থিত সকলের মধ্যে একটা শ্রদ্ধার ভাব এসে গেল। এবং তার প্রকাশ ঘটল সহকারী সরকারি কৌসুলীর প্রশ্নের মধ্যে দিয়েই। বিনয়ে বিগলিত হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'মিসেস আজিম, গত ১০ মার্চের সন্ধ্যার ঘটনাগুলো নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার?'

'জ্বি, হ্যাঁ, মনে আছে,' মাথাটা একটু কাত করে জবাব দিলেন তিনি।

'সেদিন আসামী নাসিমের সাথে আপনার কোন কথা হয়েছিল?'

'কখন?'

'সন্ধ্যায়, হোটেল সোনিয়ায়?'

'হয়েছিল।'

'সেখানে একটা পার্টি দেওয়া হয়েছিল আপনার স্বামীর বিদায় উপলক্ষে?'

'জ্বি, হ্যাঁ।'

'সেই রাতেই আপনার স্বামী ট্রেনে করে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন?'

'জ্বি, হ্যাঁ।'

'আপনিও কি গিয়েছিলেন?'

'জ্বি, হ্যাঁ, তবে আমার যাবার কথা ছিল না, একদম শেষ মুহূর্তে আমার যাবার কথা ঠিক হল। উনি আমাকে সঙ্গে যেতে বললেন,' মৃদুস্বরে বললেন মিসেস আজিম।

'তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা শুধু আলোচনার স্থান ও কাল নির্ণয় করছি। যাক, হোটেল সোনিয়ায় আসামীর সাথে আপনার আলোচনার সময় কে কে ছিলেন?'

'আমি মিসেস আফরোজা রহমান অর্থাৎ হোস্ট আর সম্ভবত আবু মুরাদ।'

'আসামী কি বলেছিল আপনাদের কাছে?'

'বলেছিল, সে জনৈক কুলী হোসেনের কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা ধার করে জুয়া খেলে হেরেছে। আজকের মধ্যে টাকাটা ফেরত না দিলে কুলী হোসেন ওর বড় চাচাকে বলে দেবে অথবা মারবে বলে শাসিয়েছে।'

'সে কি আপনার কাছে টাকাটা চেয়েছিল?'

'আমার স্বামীর কাছ থেকে নিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ করেছিল। বলেছিল, উনি যাবার আগেই যেন একটা ব্যবস্থা করি।'

'আপনি কি বলেছিলেন?'

'যথাসাধ্য চেষ্টা করব বলে আশ্বাস দিয়েছিলাম।'

'টাকাটা না দিতে পারলে কুলী হোসেন যদি তার ক্ষতি করে তাহলে আসামী কি করবে, তা কি বলেছিল সে?'

মিসেস আজিম চুপ করে রইলেন।

সরকারি কৌসুলী জবাবের জন্যে অপেক্ষা করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'মিসেস আজিম আপনি বোধহয় আমার প্রশ্নটা ঠিক মত বুঝতে পারেননি। আমার প্রশ্নটা হলঃ টাকাটা কুলী হোসেন ফিরে না পেলে সে যদি আসামীর কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করে তাহলে আসামী পাল্টা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কিনা, সে সম্পর্কে আপনাদের কাছে কিছু বলেছিল?'

অস্পষ্টভাবে মাথা নাড়লেন মিসেস আজিম।

'স্পষ্ট করে জবাব দিন।'

'বলেছিল।'

'কি বলেছিল?'

ক্ষীণ কণ্ঠে মিসেস আজিম বললেন, 'নাসিম বলেছিল, কুলী হোসেন বেশি বাড়াবাড়ি করলে সে-ও দেখে নেবে। দরকার হলে তার সাথে মোকাবেলা করবে। তার জন্যে সে প্রস্তুত হয়েই আছে। গাড়িতে রিভলভার রেখে দিয়েছে সে।'

'আপনি এবার প্রশ্ন করতে পারেন,' বিজয়ীর ভঙ্গিতে রিজভী সাহেবের উদ্দেশ্যে বললেন সরকার পক্ষের কৌসুলী।

'আপনি কি ড. আজিমের কাছে নাসিমের প্রার্থিত টাকাটার কথা বলেছিলেন?' রিজভী সাহেব মিসেস আজিমকে প্রশ্ন করলেন।

'পরে বলেছিলাম।'

'কতটা পরে?'

'ট্রেনে বলেছিলাম।'

'তারমানে, আপনি বলতে চাইছেন যে, আপনি আপনার স্বামীর সাথে ট্রেনে ছিলেন?'

'অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন প্রশ্ন, ইওর অনার। এসব যথার্থ জেরা

নয়। সাক্ষী তাঁর স্বামীর সাথে কি আলোচনা করেছিলেন তা আমাদের এই মামলার আওতাভুক্ত নয়। আসামীর সাথে সাক্ষীর আলোচনা সম্পর্কে উনি হাজারটা প্রশ্ন করলেও আমাদের কিছুই বলবার নেই। কিন্তু আসামীর সাথে আলোচনা করে সাক্ষী তাঁর স্বামীর সাথে কি আলোচনা করলেন সে সম্পর্কিত প্রশ্ন অবান্তর। ওটা শোনা কথা—হিয়ার-সে ছাড়া আর কিছুই নয়,' সরকারি কৌসুলী আপত্তি তুললেন।

'আপত্তি মেনে নিলাম,' বিচারক বললেন।

বিচারকের প্রতি সামান্য মাথা নুইয়ে রিজভী সাহেব মিসেস আজিমকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি যথার্থই আপনার স্বামীর সাথে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন?'

আবার গর্জন করে উঠলেন সারকারি কৌশলী, 'অপ্রাসঙ্গিক, অর্থহীন প্রশ্ন, ইওর অনার। যথার্থ জেরা নয়।'

কিন্তু বিচারক তার গর্জন কানে তুললেন না। তিনি বললেন, 'আমি প্রশ্নটা গ্রাহ্য করছি। আসামী পক্ষকে জেরার পূর্ণ সুযোগ আমি দিতে চাই। সাক্ষী তাঁর স্বামীর সাথে কি আলাপ করেছিলেন সেটা আমাদের দেখবার বিষয় না হলেও আসামীর সাথে সাক্ষীর আলোচনার পর সাক্ষীর আচরণ পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের অঙ্গ হতেও পারে। মিসেস আজিম, আপনি প্রশ্নটার উত্তর দিন।'

মিসেস আজিম বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'আমার প্রশ্ন ছিল, আপনি আপনার স্বামীর সাথে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন?'

'নিশ্চয়ই গিয়েছিলাম,' দৃঢ়স্বরে বললেন তিনি।

'ঐদিন সন্ধ্যায় আপনি হোটেল জারকাতে গিয়েছিলেন কি?'

'ইওর অনার,' সরকারি কৌসুলী ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'আসামী পক্ষের উকিলের অসৎ উদ্দেশ্য এখন স্পষ্ট বোঝা গেছে। সমস্তটা মিলিয়ে একটা জগাখিচুড়ি পাকাতে চাচ্ছেন তিনি। ওঁর প্রশ্ন সাক্ষীর চরিত্রের উপর জঘন্য আক্রমণ। তাছাড়া প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিকও বটে। আসামীর সাথে সাক্ষীর যেটুকু আলাপ হয়েছে উনি তো সেটুকু সম্পর্কেই সাক্ষ্য দিয়েছেন।'

'সাক্ষী তো বলেছেন, তিনি তাঁর স্বামীর সাথে ট্রেনে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। সুতরাং এ সম্পর্কে প্রশ্ন অবান্তর বলে মনে হচ্ছে না। আদালত আসামী পক্ষকে সর্বপ্রকার সুযোগ দিতে চায়। আপনি প্রশ্নের জবাব দিন,' জজ সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন।

'আপনি কি ঐদিন সন্ধ্যায় হোটেল জারকায় গিয়েছিলেন?'

'নিশ্চয়ই না,' মিসেস আজিম সক্রোধে বললেন। তাঁর গৌরবর্ণ মুখটা রাগে রক্তবর্ণ ধারণ করল। 'ঐ ধরনের কোন প্রশ্ন করার অধিকার আপনার নাই। এটা আমার মর্যাদার পক্ষে হানিকর। আমি যে সেখানে যেতে পারি না, আপনার মত ভদ্রলোকের তা জানা উচিত।'

নিঃশব্দে হাসলেন রিজভী সাহেব।

'আপনার স্বামী চট্টগ্রাম থেকে শহীদ খান নামে এক ভদ্রলোকের কাছে ফোন করেছিলেন। সে ঘটনা আপনার মনে আছে?'

'মনে আছে।'

'তার পরেই আপনি ঢাকা ফিরে আসেন?'

'দুপুরে ফোনে কথা হয়েছিল, রাতে আমি ঢাকার ট্রেনে উঠি।'

'তার আগের দিন কি আসামীর জামিনের আবেদন নাকচ হয়ে গিয়েছিল?'

'জ্বি, হ্যাঁ।'

'ফিরে আসার পর শহীদ খানের সাথে আপনার দেখা হয়েছিল?'

সরকারি কৌসুলী রাগে গরগর করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন।

'ইওর অনার, এঁর প্রত্যেকটা প্রশ্নই অবান্তর। কোথাকার কোন শহীদ খানের সাথে কে কবে ফোনে কথা বলেছিল তা দিয়ে আমার বিজ্ঞ বন্ধু কি প্রমাণ করতে চান, আমি তার কিছুই বুঝতে পারছিনে। আমার নতুন বন্ধু মূল বিষয় বিস্মৃত হয়ে বারবার শুধুমাত্র অবান্তর প্রশ্নের অবতারণা করছেন। আমি আপত্তি জানাচ্ছি।'

'আমি আপত্তি অগ্রাহ্য করছি। আমি নিজেও বুঝতে পারছি, আসামী পক্ষের কৌসুলী মূল বিষয় থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। তবে প্রশ্নগুলোকে একেবারে অবান্তর বলে উড়িয়েও দিতে পারছিনে। উনি নিশ্চয়ই একটা নির্দিষ্ট বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রশ্নগুলোর অবতারণা করছেন। মিসেস আজিম, আপনি ওঁর প্রশ্নের জবাব দিন।'

'আপনার স্বামী যখন শহীদ খানকে ফোন করেন তখন আপনি কোথায় ছিলেন?'

'চট্টগ্রামেই ছিলাম।'

'ঠিক কোন জায়গাটাতে ছিলেন?'

'হোটেল প্লাইউডে। সেখান থেকেই ফোন করেছিলেন উনি।'

'ড. আজিম যখন ফোন করেন তখন আপনি কি তাঁর কাছেই ছিলেন?'

'তাঁর পাশেই ছিলাম।'

'তাহলে, মিসেস আজিম, আপনি মহামান্য আদালতের দিকে তাকিয়ে দয়া করে বুঝিয়ে দিন, আপনি কি করে একটা লাশের সাথে চট্টগ্রাম গেলেন, কি করে চট্টগ্রামের প্লাইউড হোটেলে একটা মৃতদেহের সাথে অবস্থান করলেন এবং সেই মৃত ব্যক্তিটা যখন ফোন করল তখন কি করে তা আপনি জানতে পারলেন?'

সমস্ত আদালত মুহূর্তে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

মিসেস আজিমও চমকে উঠলেন। কিন্তু মহূর্তের মধ্যেই তিনি আত্ম-সচেতন হয়ে বলে উঠলেন, 'তার মানে! এসব কি বলছেন আপনি?'

বিস্মিত সরকারি কৌসুলীও ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে অসহায়ের মত রিজভী সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন রিজভী সাহেব। শহীদের আনা কাগজের প্যাকেটটা খুলে তিনি বললেন, 'আমার প্রশ্ন অত্যন্ত সরল। তা হলঃ 'কুলী হোসেন বলে যে লোকটা মারা গেছে বলে জানা গেছে তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ আর আপনার স্বামীর বুড়ো আঙুলের ছাপ অবিকল এক। আমার কাছে করোনারের রেকর্ড থেকে নেওয়া লাশের ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপের সার্টিফায়েড কপি আর আপনার স্বামীর ড্রাইভিং লাইসেন্সের দরখাস্তের সার্টিফায়েড কপি আছে,' হাতের কাগজগুলো দেখিয়ে তিনি বললেন, 'এই হচ্ছে সেই কপিগুলো। '১০ মার্চ রাতে যে লোকটা .২২ অটোমেটিকের গুলিতে মারা গেছে সে লোকটা কুলী হোসেন নয়, সে লোকটা হচ্ছেন আপনার স্বামী ড. খুরশীদ আজিম। এখন দয়া করে আপনি ব্যাখ্যা করুন, কি করে আপনি একটা লাশের সাথে অবস্থান করলেন দু'তিন দিন!'

মিসেস আজিম দ্বিতীয়বারও ভড়কালেন না। তিনি দৃঢ়স্বরে বললেন, "আমি আমার স্বামীর কাছেই ছিলাম।'

আদালতে মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। বিচারক নিজেও বিস্মিত হয়েছিলেন। হাতুড়ি পিটিয়ে আদালত-কক্ষের গুঞ্জন থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'রিজভী সাহেব, আমার কাছে দিন তো আঙুলের ছাপগুলো?'

রিজভী সাহেব সবিনয়ে তাঁর হাতের কাগজগুলো বিচারকের হাতে তুলে দিলেন।

আদালত-কক্ষে আবার নীরবতা নেমে এল। শহীদ মিসেস আজিমের দিকে তাকাল। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মিসেস আজিমের মুখ।

অনেকক্ষণ ধরে দুটো প্রিন্ট মনযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলেন জজ সাহেব। তারপর সরকারি কৌসুলীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সরকার পক্ষের কৌসুলী কি এই প্রমাণগুলো স্বচক্ষে দেখতে চান?'

'না, ইওর অনার। এসব নাটকীয়তায় আমাদের বিশ্বাস নেই। ওতে আমরা সহজে মুগ্ধ হই না।'

'কিন্তু এটাতে মুগ্ধ হবেন। কারণ ছাপ দুটো অবিকল এক।'

'তাহলে ছাপ দুটো তৈরির মধ্যে কোন কৌশল থাকতে বাধ্য,' জোর গলায় বললেন সরকারি পক্ষের উকিল।

জজ সাহেব বললেন, 'আমরা মামলার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল পর্যায়ে এসে পড়েছি। সমস্ত পরিস্থিতিটা আমার নিজের কাছেই অত্যন্ত জটিল বলে মনে হচ্ছে। আমি বিশ মিনিটের জন্যে আদালত মুলতবী রাখছি। এই সময়ে আমি উভয় পক্ষের কৌসুলীর সাথে আমার চেম্বারে আলোচনা করব। আসুন আপনারা দু'জন।'

জজ সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

নয়

জজ সাহেবের চেম্বারে রিজভী সাহেব তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করছিলেন। তিনি বললেন, 'ইওর অনার, আমার বক্তব্য অতি সরল। কুলী হোসেনের কাছ থেকে নাসিম ত্রিশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিল সেটা ঠিকই। ১০ মার্চ ফেরত দেবার লাস্ট ডেট ছিল একথাও ঠিক। কিন্তু সেইদিনই যে অন্য একটা দুর্ঘটনা ঘটবে তা কেউ ভাবেনি। কুলী হোসেন গত ৩ মার্চ মারা গেছে। তাকেও খুন করা হয়েছে। কে করেছে তা এখনও জানা যায়নি। এমন কি তার মৃত্যুর ঘটনাটা পর্যন্ত এখনও প্রকাশ পায়নি। তাছাড়া কুলী হোসেন নিজে তার দলের সরদার ছিল না। ছিল অন্য একজন। তার নাম···,' রিজভী সাহেব থামলেন। 'আবু মুরাদ। অবাক হবেন না, ইওর অনার। সে-ই কুলী হোসেনকে খুন করেছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পুলিস খোঁজ নিয়ে দেখতে পারে। ঘটনার দিন কুলী হোসেনের নামেই সে জারকা হোটেলে একটা রুম ভাড়া নেয়। এটা আমি আদালতে প্রমাণ করতে পারতাম, যদি সাক্ষ্যদানের আইনের এখতিয়ার ব্যাপকতর হত। আমি এটাও প্রমাণ করতে পারতাম যে, মিসেস আজিম ট্রেনে চাপেননি। তিনি স্বামীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে নিজে একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেল জারকায় চলে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বামী ড. আজিমও গোপনে তাঁকে অনুসরণ করে সেই হোটেলে গিয়েছিলেন। কারণ ভদ্রমহিলা আবু মুরাদের সাথে গুপ্ত-প্রেমে মত্ত ছিলেন।'

'কিন্তু আবু মুরাদ তো ময়মনসিংহ গিয়েছিল?'

'যায়নি, ইওর অনার। যাবার কথা ছিল, তা ঠিক। হোটেলে যখন আবু মুরাদ ও মিসেস আজিম প্রমোদে মত্ত ছিলেন তখন ড. আজিম পাশের রুমটা ভাড়া নেন এবং ওখান থেকে ওয়াল-স্নুপার লাগিয়ে টেপ-রেকর্ডার মারফত ওদের আলাপ-বিলাপ শোনেন। কিছুক্ষণ পরে মিসেস আজিম বাসায় চলে যান। পরিকল্পনাটা ছিল, তিনি বাসায় যেয়ে নাসিমকে বলে আসবেন যে, রাতে তিনি তাঁর এক মামার বাসায় থাকবেন,' মি. রিজভী একটু থামলেন।

'তিনি চলে যাওয়ার পর ড. আজিম তাঁর স্ত্রীর লীলা-সঙ্গীটির পরিচয় জানতে পাশের রুমে যান। রুমটাতে ম্লান আলো জ্বলছিল। আবু মুরাদ মিসেস আজিমের প্রত্যাবর্তনের জন্যে অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ করে সে ড. আজিমকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠল। কিন্তু আবু মুরাদ অভিজ্ঞ। সে পাকা অপরাধী। যে-কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা সে করতে জানে। সে জানত যে ড. আজিম তাকে চিনতে পারেননি, চেনবার সুযোগও সে দিতে রাজি নয়। সুতরাং সে অত্যন্ত শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইট ড. আজিমের চোখের দিকে জ্বালিয়ে তাঁর চোখ দুটো ধাঁধিয়ে দিল। পরক্ষণেই একটা চেয়ার ছুঁড়ল এবং তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে ভেবেছিল যে, ড.

আজিমকে বেকায়দায় ফেলে সে নিজের পরিচয় গোপন রেখেই পালিয়ে যেতে পারবে। ড. আজিম তাঁর পকেট থেকে রিভলভার বের করলেন। ধস্তাধস্তির সময় এক ফাঁকে রিভলভাঁর থেকে একটা গুলি বেরিয়ে গেল। আবু মুরাদের উপস্থিত বুদ্ধি অপরিসীম। সে সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে শুয়ে পড়ল। মারাত্মকভাবে আহত হবার ভান করে পড়ে রইল সে। ভয়ে দিশেহারা হয়ে ড. আজিম চলে গেলেন মিসেস রহমানের বাসায়। তাঁকে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বললেন। ঐ মুহূর্তে কি করা উচিত তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তবে এর ফলে যে বিশ্রী কেলেংকারীর সৃষ্টি হবে তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এবং তা যেকোন মূল্যে পরিহারের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ভাবলেন, তিনি যে ট্রেন থেকে নেমে এসেছেন একথা এক মিসেস রহমান ছাড়া আর কেউ জানেন না। তিনি স্টেশনে ফোন করে জানতে পারলেন যে, সাড়ে ন'টায় একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন ভৈরবে যাবে। তিনি সেই ট্রেনে ভৈরবে গিয়ে সেখান থেকে ট্রেনে চট্টগ্রাম চলে যাবেন বলে স্থির করলেন।'

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে মি. রিজভী বলে চললেন, 'ইতিমধ্যে হোটেলের কক্ষে তখন আবু মুরাদ উঠে দাঁড়িয়েছে। এবং টেলিফোনে মিসেস আজিমকে খবরটা দিয়েছে। মিসেস আজিম সবটা শুনে বুঝলেন, ড. আজিমকে অবশ্যই এখন মিসেস রহমানের বাসায় পাওয়া যাবে। সুতরাং দু'জন পরামর্শ করে দুটো ভিন্ন দিক থেকে মিসেস রহমানের বাসার দিকে রওয়ানা দিলেন। দু'জনের সাক্ষাৎ কোথায় হোল বলতে পারব না। কিন্তু ড. আজিম যখন মিসেস রহমানের বাসা থেকে বেরিয়ে স্টেশনে যাচ্ছিলেন সম্ভবত তখনই পথে অথবা তিনি স্টেশনে পৌঁছুবার পর দু'জন মিলে তাঁকে খুন করে। আবু মুরাদ জানত, নাসিম তখন তারই আড্ডায় জুয়া খেলছে। সুতরাং সে ড. আজিমের লাশটা সাময়িকভাবে কোথাও লুকিয়ে রেখে আড্ডায় চলে যায় এবং নাসিমের হুইস্কির বোতলে কড়া মাদক দ্রব্য মিশিয়ে দেয়। নাসিম অসুস্থ হয়ে তার এক বন্ধুর সাহায্যে বাসায় চলে যায়। পরে আবু মুরাদ নাসিমের গাড়ি নিয়ে তাতে লাশটা তুলে রাস্তার উপর ফেলে তার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে যায়। তার আগেই মৃতদেহের বাঁ হাতে কুলী হোসেনের তাবিজ ও পকেটে তার ড্রাইভিং লাইসেন্স রেখে দেয়।'

'আপনি এগুলোকে সত্য বলে জানেন?'

'এর প্রত্যেকটি ঘটনা সত্য!'

'একেবারে পানির মত স্বচ্ছ!' ব্যঙ্গ করলেন সরকারি কৌসুলী।

তাঁর কথায় কান না দিয়ে রিজভী সাহেব বললেন, 'চট্টগ্রামে রওয়ানা দেবার সময় ড. আজিম মিসেস আজিমকে পরদিন সকালেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে বোরখা পরে চট্টগ্রাম যেতে বলবার জন্যে মিসেস রহমানকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, নিজের ইজ্জত রক্ষার জন্যে মিসেস আজিম এতে অমত করবেন না। পরে চট্টগ্রামে দু'জন বোঝাপড়া করে নেবেন এবং দরকার হলে একে অন্যকে

অ্যালিবি দেবেন। তদনুযায়ী মিসেস রহমান কয়েকবার মিসেস আজিমকে ফোন করেন। মিসেস আজিমকে পাওয়া যায় রাত একটায়। তাঁকে তাঁর স্বামীর অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। মিসেস আজিম বুঝতে পারলেন, এটা তাঁর পক্ষে সুবিধাই হবে। চমৎকার অ্যালিবাই হবে তাঁর। পরদিন সকালেই বোরখা পরে চট্টগ্রাম চলে যান তিনি। কিন্তু একা নন, সঙ্গে ছিল আবু মুরাদ। মিসেস রহমান আশা করেছিলেন যে, ড. আজিম নিশ্চয়ই চট্টগ্রাম থেকে তাঁকে ফোন করবেন। কিন্তু তিনি কোন ফোন পাননি। কোন চিঠিও নয়, পেলেন একটা টেলিগ্রাম। ড. আজিম পাঠিয়েছেন টেলিগ্রামটা। তাতে লেখা ছিল যে, তাঁদের দু'জনের মধ্যে মতৈক্য হয়ে গেছে। চট্টগ্রাম থেকে কেন যে ফোন করা হয়নি অথবা কোন চিঠি লেখা হয়নি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ইওর অনার। অথচ শহীদ খান ড. আজিমের কণ্ঠস্বরের সাথে পরিচিত ছিল না বলে তার কাছে আবু মুরাদ ড. আজিমের পরিচয় দিয়েই ফোন করেছিল।'

'সবই তো বুঝলাম। অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব আপনি প্রমাণ করবেন কেমন করে?'

'সবটা প্রমাণ করার সাধ্য আমার নেই, তবে অনেকখানিই আমি প্রমাণ করতে পারি। তাছাড়া আমি প্রমাণ করতে যাচ্ছিও না, প্রমাণ করবে পুলিস। আপনার কাছে তাই আমার আবেদন, হোটেল জারকার রেজিস্টারে আবু মুরাদের যে সই আছে—অবশ্য কুলী হোসেন নামে, সেটা আবু মুরাদের হস্তাক্ষরের সাথে তুলনা করলেই অনেক কিছু জানা যাবে। কুলী হোসেনের আড্ডায় নতুন করে খোঁজ নিলেও জানা যাবে যে, সে কয়েকদিন আগেই মারা গিয়েছে। তাছাড়া ড. আজিম যে মারা গেছেন, খোঁজ নিলে তাও জানা যাবে।'

'বেশ,.তাহলে আসামীকে খালাসের আর নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছি। আপনারা যান।'

রিজভী সাহেব আদালত-কক্ষের ভিতর দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। শহীদ, শাহানারা ও মিসেস রহমান তাঁর দিকে এগিয়ে এল। অপরিচিত একটা লোকও এগিয়ে গেল রিজভী সাহেবের দিকে। ওদেরকে এড়িয়ে রিজভী সাহেব অপরিচিত লোকটার দিকে এগিয়ে গেলেন। লোকটা ফিসফিস করে কিছু একটা বলতেই রিজভী সাহেব নীরেন সেনকে বললেন, 'নীরেন বাবু, আমাকে এখুনি ভাই যেতে হচ্ছে। আপনি সামলাবেন বাকিটা। শহীদ সাহেব, আমি ঘুরে আসছি।' বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন তিনি। সামনেই একটা হোণ্ডা। তার এঞ্জিনটা চালুই ছিল। লাফ দিয়ে তিনি হোণ্ডায় চড়ে বসলেন। একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল তাঁর হোণ্ডাটা।

নীরেন বাবু অবাক হয়ে বললেন, 'আরে, এ কি ব্যাপার! উনি চললেন কোথায়!'

শাহানারাও অবাক হয়ে বলল, 'হঠাৎ করে চলে গেলেন যে রিজভী সাহেব!'

মিসেস রহমানের চোখেও প্রশ্ন।

শহীদ হেসে বলল, 'বুঝতে পারলেন না? কুয়াশা চলে গেল। ওর কাজ শেষ।'

ভিড়ের মধ্যে সেই অপরিচিত লোকটাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

কুয়াশা ২৪

প্রথম প্রকাশঃ মে ১৯৭০

এক

শীতকাল।

দিনটি ছিল পয়লা ডিসেম্বর। তারিখটা মনে গেঁথে রাখবার মত। উনিশশো ছেষট্টিসাল। সোমবার।

সময় তখন কাঁটায় কাঁটায় দশটা।

জিন্নাহ্ অ্যাভিনিউ। ইস্টার্ন ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের হেড অফিসের সামনে কুচকুচে কালো একটা মরিস গাড়ি এসে থামল।

ব্যাঙ্কের বন্দুকধারী পাঠান দারোয়ান সরাসরি তাকাল গাড়িটার দিকে। গাড়ির ড্রাইভিং সিটে হালকা নীল রঙের কোট পরে বসে রয়েছেন এক ভদ্রলোক। মাথায় হ্যাট । মাথা নিচু করে ভদ্রলোক কি যেন ভাবছেন বসে বসে। অনড়, অচঞ্চল। টান টান হল পাঠানের চওড়া বুক। তীক্ষ্ণ হল একটু চোখের দৃষ্টি।

এদিকে দারোয়ান একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল না। গাড়িটা ব্যাঙ্কের সামনে এসে থামতেই রাস্তার দু'দিক থেকে দুটো লোক পরস্পরের দিকে নির্বিকার মুখে এগিয়ে এল । দু'জনাই অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল দারোয়ানের চোখের আড়ালে। গাড়িটা এসে দাঁড়াতেই দু'জন দু'জনার দিকে এগিয়ে আসছে। সরাসরি এগিয়ে এসে ঠিক ব্যাঙ্কের সাত-আট হাত দূরে দু'জন দু'জনকে ধাক্কা মারল। ব্যস শুরু হয়ে গেল তুমুল ঝগড়া। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তর্ক-বিতর্ক শুরু হল। দু'জনেই প্রচণ্ড রেগেছে। একজন বলছে, আমাকে ধাক্কা দিলে কেন, মিয়া? অন্যজন বলছে,লে বাবা, আমাকে ব্যাটা ধাক্কা মেরে আবার কৈফিয়ত চাইছে!

দু'জনারই পেটা স্বাস্থ্য। লুঙ্গি পরিহিত উভয়েই। তর্ক-বিতর্ক হতে হতে শার্টের কলার ধরাধরিতে পৌঁছুল। তামাসা দেখার জন্যে দু'একজন করে পথচারী দাঁড়াচ্ছে। হঠাৎ একজন ঘুসি বসিয়ে দিল অন্যজনকে। অন্যজন আচমকা লাথি কষে দিল আক্রমণকারীর পেটে। মারামারি শুরু হল, সেই সাথে গালাগালি। হুঙ্কার ছাড়ল দু'জনেই পরস্পরকে আঘাত করার জন্যে। তড়াক তড়াক করে লাফ মেরে পজিশন নিচ্ছে। হাতের মাস্‌ল্ ফুলিয়ে দেখাতে দেখাতে একজন বলছে, আয়, বেল্লিক, তোকে জন্মের মত ভেলকি দেখিয়ে দিই। অন্যজন বলছে, আবে রাখ, তোর মত কত ভেলকিবাজকে ভেলকি দেখিয়ে দিলাম আমি!

পরক্ষণে লাফিয়ে পড়ল একে অপরের উপর। ভিড় ইতিমধ্যে জম-জমাট হয়ে উঠেছে ফুটপাতের উপর। কে জিতবে,কে হারবে, তা না দেখে কেউ নড়বে বলে মনে হয় না।

এতে হৈ চৈ, এত শোরগোল চোখের সামনে, কিন্তু কালো চকচকে মরিসে মাথা নিচু করে বসে থাকা ভদ্রলোক একবারও চোখ তুলে তাকাচ্ছেন না সেদিকে। ওদিকে যুদ্ধরত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আড়চোখে দেখে নিল ইস্টার্ন ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের গেটের কাছে দাঁড়ানো বন্দুকধারী দারোয়ানটাকে। তাদের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে দারোয়ান। দুই যোদ্ধা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যেন। হাঁপাচ্ছে। পরস্পরের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। আবার আক্রমণ করার জন্যে দু'জন এগোল দু'জনার দিকে। ব্যাঙ্কের দারোয়ান এবার অধৈর্য হয়ে পড়ল। ব্যাঙ্কের একেবারে কাছে এই মারামারি চলতে দেয়া যায় না আর। বন্দুক বাগিয়ে পাঠান এগিয়ে গেল জটলার দিকে। দারোয়ানকে এগিয়ে আসতে দেখে দুই যোদ্ধা হঠাৎ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে একসাথে বলে উঠল, 'ওই যে, খান বাবা আসছে! খান বাবা, তুমি মা বাপ! বিচার কর তুমি!'

দারোয়ান পাঠান হলে হবে কি, তাকে মা-বাপ বলে বিচারকের সম্মানে ভূষিত করা হল তা সে বেশ বুঝতে পারল। বাংলা সে ভাল বোঝে না, কিন্তু প্রশংসা বোঝে। বুক আরও উঁচু করে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল সে।

এদিকে দুই যোদ্ধা সমস্বরে চিৎকার করে উঠতেই কালো গাড়িটায় বসা ভদ্রলোক মাথা তুলে দ্রুত চোখে দেখে নিলেন ব্যাঙ্কের গেট। ঝুঁকে পড়ে বিরাট বিরাট দুই-দুটো সুটকেস দু'হাতে ধরে গাড়ি থেকে নেমে এলেন তিনি। মাথা নিচু করে সিধে পা চালালেন ব্যাঙ্কের গেটের দিকে। হালকা নীল রঙয়ের দামী সুট ভদ্রলোকের পরনে। মাথায় হ্যাট। হাতে গ্লাভস্। চোখে নীল চশমা,পায়ে ক্রেপ-সোল জুতো। নিঃশব্দ পায়ে গেট দিয়ে ব্যাঙ্কের ভিতরে ঢুকে পড়লেন ভদ্রলোক।

মথা নিচু করে ব্যাঙ্কের ভিতরে ঢুকলেন ভদ্রলোক। কারও দিকে তাকাচ্ছেন না। সিধে ম্যানেজারের চেম্বারে গিয়ে ঢুকে পড়লেন। ম্যানেজার মি. খন্দকার চোখ তুলে তাকালেন। ভদ্রলোক মাথা নিচু করেই এগিয়ে গিয়ে বসলেন একটা চেয়ারে। তারপর পকেট থেকে বের করলেন বারটা চেক। পঁচাত্তর হাজার টাকার কম নয় কোনটার অঙ্ক। সবচেয়ে বেশি পাঁচ লাখ টাকা। মোট বারটা চেক, বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের। বেয়ারার চেক। বারটা চেকের পিছনেই সই করলেন ভদ্রলোক। ম্যানেজার অতগুলো চেকে সই করতে দেখে একটু অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু তখনও তিনি চেকগুলোয় কত অঙ্কের টাকা লেখা আছে টের পাননি।

মাথা তোলেননি ভদ্রলোক। একটা একটা করে চেকগুলো সই করে সবক'টা বাড়িয়ে দিলেন তিনি ম্যানেজারের দিকে। তারপর পকেট থেকে কিংস্টর্কের এক প্যাকেট সিগারেট বের করে অতি মনোযোগ দিয়ে সেটা খুলতে শুরু করলেন।

ম্যানেজার মি. খন্দকার প্রথম চেকের অঙ্ক দেখে চমকে উঠলেন। অঙ্কটা আবার দেখলেন তিনি তীক্ষ্ণ চোখে। না, ভুল হয়নি তাঁর। তিন লাখ টাকার চেক। দ্বিতীয় চেক দেখার আগেই তিনি ভদ্রলোকের দিকে হতবাক হয়ে তাকালেন। ভদ্রলোক সিগারেট জ্বালাচ্ছেন। মি. খন্দকার দ্বিতীয় চেকটা দেখার জন্যে চোখ নামালেন। দ্বিতীয়বারও চমকালেন তিনি। দ্বিতীয় চেকে দু'লাখ টাকার অঙ্ক । বিস্ফারিত হয়ে গেল তাঁর চোখ জোড়া। চেয়ে রইলেন তিনি ভদ্রলোকের দিকে। ভদ্রলোক মুখ তুলে না তাকিয়েই বলে উঠলেন, 'টাকাগুলো একটু তাড়াতাড়ি দরকার আমার।'

মিঃ খন্দকার বিস্ময় চাপতে না পেরে বলে উঠলেন, 'এতো টাকা!'

ভদ্রলোক শান্ত, নিরুদ্বেগ গলায় বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, টাকা বেশি বলেই তো হেড অফিসের চেক। দয়া করে ক্যাশিয়ারকে ডেকে পাঠিয়ে টাকাগুলো দিতে বলুন। আমার তাড়া আছে। মোট তিরিশ লাখ।'

বিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন মি. খন্দকার ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে। কে এই ভদ্রলোক? বারটা অ্যাকাউন্ট থেকে বারজন এত এত করে টাকা ওকে দেবার কারণ কি? বড় অ্যাকাউন্ট যাঁদের আছে তাঁদের সকলকে চেনেন তিনি। চেকগুলো তাঁদেরই। কিন্তু বেশি অঙ্কের টাকা তোলার দরকার হলে তাঁরা নিজেরাই চলে আসেন ব্যাঙ্কে। অথচ তাঁরা নিজেরা না এসে এ কোন্ ভদ্রলোককে পাঠিয়েছেন? তাছাড়া একটা নয়, দুটো নয়, বারটা অ্যাকাউন্টের বারটা মোটা অঙ্কের চেক। জাল চেক নয় তো?

রীতিমত ঘাবড়ে গেছেন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। তাঁর চাকরি জীবনে এত টাকা একসাথে কাউকে দেননি তিনি। দুটো বা চারটের বেশি চেক কোনদিন কাউকে আনতেও দেখেননি। শোনেননিও এমন ঘটনা কখনও । রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা । ছেলেখেলা কথা নয়, তিরিশ লাখ টাকা!

মি.খন্দকার বিমূঢ়তা কাটিয়ে বলে উঠলেন, 'মাফ করবেন, অফিশিয়াল কর্তব্য অনুযায়ী আপনার চেকগুলো সম্পর্কে একটু খোঁজ করা প্রয়োজন বোধ করছি।'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। মুখ তুলে তাকালেন না এবারও। হাতের সিগারেটটা অর্ধেকও শেষ হয়নি, সেটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরালেন। ম্যানেজার চুপচাপ বসে বিস্ফারিত চোখে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন বুঝতে পেরে বলে উঠলেন, 'যা করবার তাড়াতাড়ি করুন। আর একবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি,আমার তাড়া আছে।'

চমকে উঠে ক্রেডল থেকে ফোনের রিসিভারটা তুলে ডায়াল করতে শুরু করলেন মি.খন্দকার। ভদ্রলোকের কণ্ঠে এমন একটা কাঠিন্য ছিল যা শুনে বুক শুকিয়ে গেছে তাঁর। মি.ইলিয়াস বক্সকে প্রথমে ফোন করলেন মি.খন্দকার। মি. বক্সেরও এই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে। ভদ্রলোকের বারটা চেকের মধ্যে মি. বক্সের

একটা চেক আছে চার লাখ টাকার। মি. বক্সকে তাঁর অফিসে পাওয়া গেল.ফোন ধরলেন তিনিই। ম্যানেজার মি.খন্দকার প্রশ্ন করলেন, 'এক্সকিউজ মি.মি.বক্স। একটা তিক্ত কর্তব্য পালন করতে হচ্ছে আমাকে। আপনার অ্যাকাউন্টের চেক নিয়ে, চারলাখ টাকার,একটা চেক নিয়ে এক ভদ্রলোক এসেছেন। আমরা টাকা দেব···?'

মি. খন্দকারের কথা শেষ হবার আগেই ফোনের অপরপ্রান্ত হতে মি. বক্স বলে উঠলেন, 'আরে, এখনও বসিয়ে রেখেছেন মি.সোহরাবকে! দিয়ে দিন টাকা, উনি আমার বন্ধু। বিশেষ কারণে নগদ টাকা দিতে পারিনি বলে চেক দিয়েছি। ছিঃ ছিঃ!'

মি. খন্দকার বলে উঠলেন মি, বক্সকে, 'আমি লজ্জিত, মি. বক্স । এখুনি দিয়ে দিচ্ছি আমি টাকা । আশা করি, মনে কিছু করবেন না। বোঝেনই তো, আমাদেরকে অনেক দৃষ্টিকটু সন্দেহে ভুগতে হয় কর্তব্যের খাতিরে। আচ্ছা, রাখলাম।'

বিমূঢ় ভাবটা দূর হয়ে যাচ্ছে মি.খন্দকারের চেহারা থেকে। বিস্মিত হয়ে উঠেছেন তিনি এবার। এত টাকা এতগুলো লোক এই ভদ্রলোককে কেন দিলেন? প্রশ্নটা তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। মি. বক্সের কথা শুনে অবিশ্বাস করার প্রশ্নই আর উঠতে পারে না। মি.বক্স নিজেই বললেন, তিনি চারলাখ টাকার চেক লিখে দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও খুঁতখুঁত করছে মনটা। রিসিভার নামিয়ে না রেখে আর এক কোটিপতিকে ফোন করলেন তিনি। তাঁর চেকও এনেছেন ভদ্রলোক। এবারও সেই একই উত্তর । ভদ্রলোককে চেকের অঙ্ক অনুযায়ী টাকা দিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন দ্বিতীয় কোটিপতি। তবু মনটা কেমন যেন সন্দেহের দোলায় দুলতে থাকে মি. খন্দকারের। তৃতীয় এক মিল-মালিককে ফোন করলেন তিনি। মিল-মালিক রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন মি. খন্দকারের প্রশ্ন শুনে। এখনও কেন টাকা দিয়ে দেওয়া হয়নি, জবাবদিহি চেয়ে বসলেন। ক্ষমা চেয়ে ফোন নামিয়ে রাখলেন মি. খন্দকার। সন্দেহের আর কোন কারণ নেই। তিন-তিনজন পরিচিত কোটিপতি জানিয়ে দিয়েছেন—হ্যাঁ, চেক পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁরা অত অত অঙ্কের। টাকা না দেবার প্রশ্ন আর ওঠে না। মি. খন্দকার ঢোক গিলতে গিলতে কলিংবেল টিপে ধরতে একজন পিয়ন এসে ঢুকল চেম্বারে।

'ক্যাশিয়ার আবদুর রহমানকে পাঠিয়ে দাও।'

পিয়ন চলে যাবার এক মিনিট পরই এসে পৌঁছুল ক্যাশিয়ার আবদুর রহমান মি.খন্দকার তখনও ঘামছেন, ঢোক গিলছেন, আবার সন্দেহেও ভুগছেন। ঝিমঝিম করছে তাঁর মাথা । ত্রিশ লাখ টাকা! কোন ভুল হয়ে যাচ্ছে না তো?

'টাকা দিয়ে দিতে বলুন, দেরি করিয়ে দিচ্ছেন কেন আমার?'

হঠাৎ একটু রুষ্ট কণ্ঠে বলে উঠলেন ভদ্রলোক। তেমনি মাথা নত করে বসে

আছেন তিনি। মি. খন্দকার ভদ্রলোকের মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু ছায়া পড়েছে ভদ্রলোকের মুখে। চেম্বারের জানালা-দরজা বন্ধ। বিজলী বাতি জ্বলছে ভিতরে। নিওনসাইন সব ক'টা ভদ্রলোকের পিছন দিককার দেয়ালে। মুখে আলো পড়ছে না তার ফলে। তবে মি. খন্দকার ওসব কথা ভাবছিলেন না মোটেই। তিনি আসলে কোন কথাই সুষ্ঠুভাবে ভাবতে পারছিলেন না। তাঁর শুধু মাথাটা ঝিমঝিম করছে উত্তেজনায় এবং বারবার প্রশ্ন জাগছে, কোন ভুল হয়ে যাচ্ছে না তো?

'রহমান, তিরিশ লাখ টাকা গুণে দিতে হবে এই ভদ্রলোককে। কয়েকজন মিলে গুণে দাও টাকাটা।'

মি. খন্দকারের কথা শেষ হতেই ভদ্রলোক অর্ধসমাপ্ত সিগারেট ফেলে দিয়ে বলে উঠলেন, 'সবক'টা পাঁচশো টাকার নোট হয় যেন। একটা সুটকেসে ভরে নিয়ে যেতে চাই আমি সব যদি পাঁচশো টাকা না হয়, পঞ্চাশ বা একশো টাকার নোট হলেও চলবে। সুটকেস আমি দুটোই এনেছি অবশ্য। আর হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

ক্যাশিয়ার চমকে গেছে ত্রিশ লাখ টাকার কথা শুনে। নিজের কানকে সে নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। জিজ্ঞেস করল আবার, 'কত টাকা বললেন যেন, স্যার?'

'ত্রিশ লাখ। হ্যাঁ, ত্রিশ লাখ টাকা। এই যে, বারটা চেক দিয়েছেন উনি। যোগ করে দেখ, ত্রিশ লাখ টাকাই হবে। কোন অসুবিধে নেই। ফোন করে জেনে নিয়েছি আমি।'

বারটা চেক কাঁপা হাতে তুলে নিল ক্যাশিয়ার। একটা একটা করে সব ক'টা চেক দেখল তারপর যোগ করল। অস্ফুট বিস্ময়ভরা কণ্ঠে সে শুধু উচ্চারণ করল, 'ত্রিশ লাখ টাকা!'

ম্যানেজারের ইঙ্গিতে ক্যাশিয়ার বের হয়ে গেল চেম্বার থেকে। ক্যাশিয়ার চলে যাবার পর ম্যানেজার পাথরের মূর্তির মত ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বসে রইলেন। ভদ্রলোক একমনে সিগারেট টানছেন। কোন চঞ্চলতা নেই তাঁর মধ্যে।

ম্যানেজার কথা বলে উঠলেন, 'চা, না কফি?'

ভদ্রলোক নির্বিকার কণ্ঠে বললেন, 'ফান্টা।'

পিয়ন চা আর ফান্টা নিয়ে এল। চায়ে চুমুক দিলেন মি. খন্দকার। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'ক'মিনিট হয়েছে আপনাদের ক্যাশিয়ার টাকা আনতে গেছেন?'

'পনের মিনিট হয়েছে। গোনা শেষ হতে সময় লাগছে হয়ত।'

এমন সময় চেম্বারে ঢুকল ক্যাশিয়ার। বলল, 'টাকা রেডী, নিয়ে আসব এখানে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'না, আমি কাউন্টারে যাচ্ছি। কত টাকার নোট?'

'পঞ্চাশ, একশো, পাঁচশো।'

ভদ্রলোক ফান্টা পান না করেই দুহাতে দু'টো সুটকেস নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ম্যানেজার আশ্চর্য কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কাউন্টার থেকে টাকা নেবেন কি জন্যে। আপনি আরাম করে বসুন, আমরা সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'অজস্র ধন্যবাদ। আমি কাউন্টার থেকে টাকা নেব।'

কথাটা বলে ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না। চেম্বার থেকে বের হয়ে ধীরে ধীরে কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ক্যাশিয়ারও একটু পরে কাউন্টারের অপর দিকে এসে দাঁড়াল। টাকার বাণ্ডিলগুলো একটা টেবিল থেকে তুলে কাউন্টারের উপর রাখতে শুরু করল সে। ভদ্রলোক সেগুলো ভরতে শুরু করলেন সুটকেসে।

একমনে সুটকেসে টাকার বাণ্ডিলগুলো সাজিয়ে রাখছেন মি.সোহরাব নামধারী ভদ্রলোক। ক্যাশিয়ার টেবিল থেকে সব টাকা কাউন্টারের উপর এনে দিয়েছে একটা সুটকেস ভরে গেছে। দ্বিতীয় সুটকেসটা পায়ের কাছ থেকে ঝুঁকে প… তোলার সময় জানালা দিয়ে সূর্যের যে আলো এসে পড়েছিল সেই আলোই ভদ্রলোকের মুখের উপর পড়ল। ক্যাশিয়ার আবদুর রহমানের বুক ধড়াশ করে উঠল সাথে সাথে!

ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেল পলকের মধ্যে ক্যাশিয়ারের সর্বশরীর। আতঙ্কে ঠকঠক করে কেঁপে উঠল হাঁটু দুটো। অবিশ্বাসে, অলৌকিক ভয়ে ছানাবড়া হয়ে গেল চোখ জোড়া, চোখের মণি দুটো কোটর ছেড়ে ঠিকরে বের হয়ে আসতে চাইছে ফ্যালফ্যাল করে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সে। মাথাটা ঘুরছে বনবন করে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে। টলে পড়ে যাচ্ছিল বেচারা আতঙ্কিত ক্যাশিয়ার একটা চেয়ারের হাতল ধরে তাল সামলাল কোনমতে।

রোদ ভদ্রলোকের মুখের উপর পড়তেই ক্যাশিয়ার আবদুর রহমান স্পষ্ট দেখেছে অত্যাশ্চর্য, অসম্ভব, অলৌকিক একটা জিনিস। ভদ্রলোকের মুখে রক্ত বা মাংস কিছুই নেই। কিছুটা স্বচ্ছ, কিছুটা অস্বচ্ছ, কাচের মত আবরণ ভদ্রলোকের মুখে। সেই আবরণ ভেদ করে সূর্যের আলো গিয়ে পড়েছিল ভদ্রলোকের মুখের হাড়ে, কপালের হাড়ে। ক্যাশিয়ার পরিষ্কার দেখে ফেলেছে ভদ্রলোকের মুখের কাঠামোটা—মাংসহীন, রক্তহীন কঙ্কাল একটা! মানুষ নয়! মোম বা ঐ জাতীয় কোন পদার্থের প্রলেপ দিয়ে প্লাস্টার করা মুখ। রোদ পড়াতে সেই আবরণ ভেদ করে দৃষ্টি পড়েছে শুধু হাড়ের উপর।

কোন ভুল হয়নি ক্যাশিয়ারের। পরিষ্কার সব দেখেছে সে। মানুষ নয়, জলজ্যান্ত একটা কঙ্কালের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। থরথর করে কাঁপছে ক্যাশিয়ারের শরীর। দ্বিতীয় সুটকেসে টাকার বাণ্ডিল ভরছে কঙ্কাল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ক্যাশিয়ার। হঠাৎ মানুষ-বেশী কঙ্কালের কোটের আস্তিন সরে যেতে কব্জির উপরটা দেখা গেল। রোদ পড়ল সেখানটায়। তীক্ষ্ণ একটা আর্তধ্বনি

বেরুল ক্যাশিয়ারের গলা থেকে। হাত নয়, শুধু হাড় দেখতে পেয়েছে সে কঙ্কালের এবারও। চিৎকার করতে করতেই টলে পড়ে গেল সে। পড়েই জ্ঞান হারাল।

কঙ্কাল যন্ত্রচালিতের মত টাকা-ভরা দ্বিতীয় সুটকেসটা বন্ধ করল। ক্যাশিয়ারের চিৎকার যেন তার কানেই ঢোকেনি। একবারও মুখ তুলে না তাকিয়ে সুটকেস দুটো দু'হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। ব্যাঙ্কের অন্যান্য কর্মচারীরা হৈ চৈ শুরু করে ছুটে এসেছে জ্ঞানহীন ক্যাশিয়ারের কাছে। ম্যানেজারও 'কি হল, কি হল' বলতে বলতে পড়ি-মরি করে ছুটে আসছেন।

কোনদিকে খেয়াল না দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে চলেছে মানুষের মত বেশধারী কঙ্কাল। কেউ তাকে বাধা দেবার আগেই দরজা দিয়ে বের হয়ে এল সে। ব্যাঙ্কের পাঠান দারোয়ান ভিতরের গোলমাল শুনে দুই পথিকের মারামারির বিচার ত্যাগ করে ছুটে আসছিল। মানুষরূপী কঙ্কালের মুখোমুখি পড়ে গেল সে।

মানুষ-বেশী কঙ্কাল এদিক-ওদিক না তাকিয়ে সিধে এগিয়ে যাচ্ছে রাস্তার উপর দাঁড়ান মরিস গাড়িটার দিকে। পাঠান দারোয়ানকে পাশ কাটিয়ে গেল সে। দারোয়ানের হাত থেকে খসে পড়ে গেল রাইফেলটা। পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে সে-ও কোট-প্যান্ট, হ্যাট-চশমা পরিহিত লোকটার মুখের হাড়। রক্ত-মাংস নেই এতটুকু। অশরীরী আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সেখানেই পাথরের তৈরি মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল সে।

মানুষরূপী কঙ্কাল যন্ত্রচালিতের মত সুটকেস দুটো রাখল ব্যাক-সিটে। চড়ে বসল কালো গাড়িটাতে। তারপর স্টার্ট দিল গাড়ি। দারোয়ানের আতঙ্কিত, বিস্ফারিত চোখের সামনে চলতে শুরু করল গাড়িটা। ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সেটা। পাঠান দারোয়ান বিকট এক অব্যক্ত শব্দ করে ভয়-তাড়িত হরিণের মত লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ল ব্যাঙ্কের ভিতরে।

এদিকে যে দু'জন লোক মারামারি শুরু করেছিল তারা হঠাৎ পরস্পরকে মাফ করে দিয়ে কোলাকুলি করে ভিড় ঠেলে পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটা শুরু করল। খানিকটা দূরে এসে একটা চলন্ত বেবী-ট্যাক্সি থামিয়ে চড়ে বসল তাতে। তামাসা দেখার জন্যে যারা ভিড় জমিয়েছিল তারা ওদের এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করল। জবর তামাসা দেখিয়ে গেল বটে, লোক দু'জন!

এদিকে ব্যাঙ্কের ভিতরে জ্ঞানহীন ক্যাশিয়ারকে নিয়ে মহা গোলমাল শুরু হয়েছে। ডাক্তারকে ফোন করেছেন মি. খন্দকার। এর মাঝে পাঠান দারোয়ান উন্মাদের মত চেঁচাতে চেঁচাতে ঢুকল ব্যাঙ্কের ভিতরে। থামানো যাচ্ছে না তাকে। কেবল 'ভূত ভূত' বলে চোখ বন্ধ করে চিৎকার করছে আর কাঁপছে ঠকঠক করে। কেউই বুঝতে পারছে না কিছু। সকলেরই চোখে-মুখে একটা আতঙ্কের ছায়া ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

ভলিউম-

ডাক্তার আসার আগেই ক্যাশিয়ারের জ্ঞান ফিরে এল। ম্যানেজার মি. খন্দকার ঝুঁকে পড়ে উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, কি হয়েছিল, রহমান? বলুন...!'

'ভূত! না না, মানুষ নয়—কঙ্কাল...কঙ্কাল, ত্রিশ লাখ টাকা...!'

তীক্ষ্ণ একটা আর্ত চিৎকার করে আবার জ্ঞান হারাল সে।

ডাক্তার এসে পড়ল একটু পরেই। ক্যাশিয়ারকে ভিতরের একটা রুমে নিয়ে যাওয়া হল। দারোয়ানকেও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ভিতরের একটা রুমের মেঝেতে চোখ বন্ধ করে শুয়ে 'ভূত ভূত' করে সে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত বকে চলেছে।

পরিস্থিতি একটু একটু করে যখন স্বাভাবিকের দিকে এগোচ্ছে, ঠিক তখনই ব্যাঙ্কের সামনে কোটিপতি ইলিয়াস বক্সের প্রাইভেট কার এসে থামল। গাড়ি থেকে নেমে ব্যাঙ্কে প্রবেশ করলেন মি. বক্স। ম্যানেজার চেম্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন চিন্তিতভাবে। মি.বক্সকে দেখে এগিয়ে এলেন তিনি। মি.বক্স ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের ভীত, ত্রস্ত ভাবটা লক্ষ্য করলেন। ম্যানেজারকে বড় বিচলিত দেখাচ্ছে। তিনি করমর্দন করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার! আপনাদের সকলের মুখ শুকনো কেন?'

'অদ্ভুত ব্যাপার, মি.বক্স!' ম্যানেজার ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আপনি যে ভদ্রলোককে চেক দিয়েছিলেন সেই ভদ্রলোককে টাকা দেবার পরই কি যেন দেখে চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে আমাদের ক্যাশিয়ার আবদুর রহমান। দারোয়ানটাও "ভূত ভূত" করে চেঁচাচ্ছে।'

মি. বক্সের চোখে বিস্ময়ভাব ফুটে উঠল। তিনি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি চেক দিয়েছি! কাকে? কবে?'

চমকে উঠলেন ম্যানেজার। তীব্র, উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তার মানে! আপনাকে খানিক আগে ফোনে জিজ্ঞেস করলাম না আমি? আপনি বললেন,হ্যাঁ, চার লাখ টাকার চেক দিয়েছি! ভদ্রলোক আপনার বন্ধু, বললেন না আপনি?'

'মানে চারলাখ টাকার চেক! আপনি আমাকে ফোনে জিজ্ঞেস করেছিলেন! টাকা দিতে বলেছি আমি! এসব কি পাগলের মত বকছেন, মি. খন্দকার! কক্ষনও ফোন করে আমাকে পাননি আপনি। ফোন আমার আজ সকাল থেকেই খারাপ হয়ে রয়েছে!'

'অ্যাঁ!'

উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠলেন মি.খন্দকার। মাথায় যেন বাজ পড়েছে তাঁর। একমুহূর্ত তিনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন মি.বক্সের দিকে। কঠিন দেখাচ্ছে মি.বক্সকে। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'ব্যাপার কি! আপনার মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে?'

'কিন্তু আমি ফোন করে কানেকশন পেয়েছি, মি.বক্স! আপনি কথাও বলেছেন আমার সাথে!'

'মুখ সামলে কথা বলুন, ম্যানেজার! আমি কি মিথ্যে কথা বলছি আপনার সাথে?'

ম্যানেজারের জ্ঞান হারাবার দশা হল। ছুটে নিজের চেম্বারে ঢুকলেন তিনি। নিজের চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ে দু'হাতে মাথার চুল শক্ত করে ধরে টানতে শুরু করলেন; রাগে, দুঃখে, ভয়ে।

মি.বক্সও ঢুকলেন চেম্বারে। ধীরে ধীরে বসলেন তিনি একটা চেয়ারে। হতবাক হয়ে গেছেন তিনি ম্যানেজারের পাগলামি দেখে। তাঁর এই অদ্ভুত আচরণকে পাগলামি ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না তাঁর।

মুখ তুলে টেবিলের ড্রয়ার থেকে বারটা চেক বের করলেন মি.খন্দকার। বেছে বেছে মি.বক্সের অ্যাকাউন্টের চার লাখ টাকার বেয়ারার-চেকটা বের করে বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'এই দেখুন, আপনার সই রয়েছে চেকে।'

ভুরু কুচকে চেকটা নিয়ে দেখতে লাগলেন মি. বক্স। দেখতে দেখতে বিকৃত হয়ে উঠল তাঁর মুখাবয়ব। খানিক পরে মুখ তুলে বললেন, 'জাল করা হয়েছে আমার সই! হায় হায়, চারলাখ টাকা…!'

ম্যানেজার ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'লোকটা তাহলে কি বারটা চেকের সই-ই জাল করেছে!'

'বারটা!'

ম্যানেজার কাঁদোকাঁদো গলায় বলে উঠলেন, 'বারটা বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের চেক নিয়ে এসেছিল লোকটা তাতেই তো সন্দেহ হয় আমার। প্রথমে ফোন করি আপনাকেই। আপনি টাকা দিয়ে দিতে বললেন।'

'আমি বলিনি, আপনার ফোন পাবার প্রশ্নই ওঠে না…!'

'যাই হোক, ফোনের কানেকশন কেটে কেউ ষড়যন্ত্র করেছে বোঝা যাচ্ছে। আপনার কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে কথার উত্তর দিয়েছে কেউ আমাকে। আমার সন্দেহ হয়নি যে আপনি কথা বলছেন না। তবু মনটা কেমন যেন খুঁত খুঁত করতে লাগল। তাই আবার ফোন করলাম আরও দুই ভদ্রলোককে।'

'কাকে কাঁকে ফোন করেছিলেন?'

ম্যানেজার বললেন, 'আপনার বন্ধুই তাঁরা। মিল-মালিক মি. আগরওয়ালা বেচারাম এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট মি.খায়ের মাহমুদকে। ওঁরাও বললেন টাকা দিয়ে দিতে চেকের অঙ্ক অনুযায়ী।'

'কি আশ্চর্য! এতগুলো অ্যাকাউন্টের চেক জাল করে টাকা তুলে নিয়ে গেল! আর আপনি…!'

ম্যানেজার রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করতে শুরু করলেন। কিন্তু এগারটা ফোনের কোনটারই কানেকশন পাওয়া গেল না। কাঁপা হাতে আবার ডায়াল করতে শুরু করলেন মি. খন্দকার । পুলিসে ফোন করা দরকার এখুনি।

দুই

ব্রেকফাস্ট সেরে ড্রইংরুমে এসে একটা সোফায় বসল প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান। টেবিলের উপর আজকের দৈনিক কাগজগুলো রাখা রয়েছে। সেই সাথে আজ সকালের ডাক। দৈনিকগুলোয় চোখ বুলিয়ে টেবিলেই ফেলে রাখল শহীদ। নতুন একটা চেস্টারফিল্ড ধরিয়ে চিঠি-পত্রগুলো টেনে নিল। কয়েকটা চিঠি পেড়ে রেখে দিল ও, খাম খুলল না। খামের উপরের লেখা দেখেই বুঝতে পারে ও, কোনগুলো আবেগ-প্রবণ যুবকদের প্রশংসা বাক্যে ভরাট। তিনটে চিঠি কোলের উপর তুলে নিল শহীদ। চতুর্থটার দিকে মনোযোগী চোখ রেখে ঠিকানা এবং খামটা দেখল। বড়সড় একটা খাম। ভিতরে অনেক কাগজ-পত্র। আর্জেন্ট চিঠি। সুদূর ইংল্যাণ্ডের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে পাঠানো হয়েছে শহীদের নামে। খামটা খুলল শহীদ ধীরে ধীরে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে চিঠি-পত্র ওর কাছে আসে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে আসে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ অফিসাররা কোন রহস্যের কিনারা করতে না পারলে সাহায্য চেয়ে চিঠি লেখেন, যেমন ও-ও লেখে।

খামটা খুলে একগাদা কাগজ-পত্র বের করল শহীদ। পাতার পর পাতা লেখা। পাসপোর্ট সাইজের তিনটা ফটো তিনজন লোকের। দু'জন ইউরোপীয়ান, একজন বাঙালী। ফটোগুলো ভাল করে দেখে রেখে দিল শহীদ। এবার লেখা পত্রগুলো মেলে ধরল পড়ার জন্যে।

প্রায় আধঘন্টা লাগল চিঠিটা পড়া শেষ করতে। গম্ভীর হয়েছে শহীদের মুখাবয়ব। কি যেন চিন্তা করছে ও। খানিক পর ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করল। অপরপ্রান্ত থেকে কামাল বলল, 'হ্যালো, কামাল আহমেদ বলছি।'

'আমি শহীদ। কামাল, মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তুই একবার এখানে চলে আয়। খুবই দরকার।'

কামাল কৌতূহলী গলায় জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার, এমন জরুরী তলব?'

'আয় আগে, সব বলব। রাখছি।'

রিসিভার রেখে দিয়ে শহীদ মৃদুস্বরে গফুরের নাম ধরে ডাকল। গফুর ডাকের অপেক্ষাতেই কাছে কোথাও ওত পেতে দাঁড়িয়ে ছিল, ডাক শুনেই ছুটে এল। শহীদ একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বলল, 'তোর দিদিমণিকে ডেকে দে দেখি?'

গফুর চলে গেল। একটু পরেই এল মহুয়া। এইমাত্র স্নান সেরে কাপড় পরেছে ও। শহীদ অপলক চোখে মহুয়াকে দেখল। লাল হয়ে উঠল মহুয়ার গাল। বলল, 'ডাকছিলে কেন?'

শহীদ হাসতে হাসতে বলল, 'তোমাকে দেখার জন্যে।'

মহুয়া কৃত্রিম কোপে বলল, 'পাঁয়তারা কষা বাদ দাও না, বললেই হয় যে, চা

দরকার আবার।

শহীদ হেসে বলল, 'চা যে দরকার তা তুমিও জান। কিন্তু আমি বলছি নাস্তাও দরকার। তাতেই তো তোমাকে ডাকলাম।'

মহুয়া বলল, 'সে কি, তুমি তো নাস্তা করেছ!'

শহীদ হাসি চেপে বলল, 'অসম্পূর্ণ হয়েছে সেটা, তোমার সৌন্দর্য পান করা বাকি আছে।'

লজ্জায় ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল মহুয়া। শহীদের দিকে পিছন ফিরে চলে যেতে যেতে হেসে ফেলল নিঃশব্দে। শহীদ পিছন থেকে বলল, 'যাও, তোমাকে ক্ষমা করে দিলুম আজকের মত, আজ আমি অভুক্তই না হয় থাকব। কিন্তু চা-নাস্তা সত্যি পাঠাও তাড়াতাড়ি। কামাল আসছে দু'মিনিটের মধ্যেই।'

কথাগুলো শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মহুয়া দরজার কাছে। যাবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে বলে গেল, 'সে আমি আগেই বুঝেছি।'

খানিক পরই মহুয়া গফুরের হাতে নাস্তার ট্রে পাঠিয়ে দিল। গফুর যেতেই মহুয়া এসে বসল ড্রইংরুমে। সকালের ব্রেকফাস্ট এখনও করা হয়নি ওর। কামাল যখন আসছেই দু'জন একই সাথে সারবে কাজটা।

শহীদ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে পাওয়া চিঠির মধ্যে নতুন করে মনোনিবেশ করেছে আবার। মহুয়ার দিকে কোন খেয়াল নেই ওর। একমনে সিগারেট টানতে টানতে পড়ছে চিঠিখানা। দেখতে দেখতে মিনিট পাঁচ-সাত কেটে গেল। এমন সময় শোনা গেল কামালের কণ্ঠস্বর, দরজার দিক থেকে, 'তলবের কারণটা কি এই সাতসক্কাল বেলা? নিশ্চয় খাবার-দাবার ব্যাপার?'

শহীদ মুখ তুলে কামালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না। তবে তোর পেট না ভরলে আর জিভের জল না শুকালে কোন কথাই ঢুকবে না কানে, তাই নাস্তাটা সেরে নে তাড়াতাড়ি। জরুরী আলাপ আছে।'

মহুয়া খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকতে বাধ্য হয়েছিল বলে রেগেছে, বোঝা গেল তার কণ্ঠস্বরে। কামালের উদ্দেশ্যে বলে উঠল ও, 'জরুরী আলাপ না ছাই, নিশ্চয় কেউ জানের ভয় দেখিয়ে চিঠি দিয়েছে, তাই কেমন গুম মেরে গেছে। তোমাকে দেখেই শখ লেগেছে জরুরী আলাপের। এস, ভাই, আমি তোমার অপেক্ষাতেই নাস্তা সামনে নিয়ে বসে আছি।'

'কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য!'

আনন্দে আত্মহারা হয়ে বসে পড়ল কামাল ভাবীর পাশে। দু'জন গল্প করতে করতে নাস্তা শুরু করল। শহীদের খেয়াল নেই ওদের দিকে। কাগজ-পত্রে আবার মনোযোগ দিয়েছে ও।

মিনিট পনের পর নাস্তা শেষ করে উঠে গেল মহুয়া কামালের একটা

রসিকতায় হাসতে হাসতে। একটু পরেই গফুর এল দু'কাপ চা নিয়ে। কামাল নিল একটা কাপ। শহীদ ওর কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখতে বলল গফুরকে। গফুর কাপ নামিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। একটু পর প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল শহীদ ওর দিকে। গফুর গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছে শহীদের দিকে। বিরক্ত হয়েই শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'কি রে, ভূতের মত করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

অভিমান-ভরা গলায় গফুর বলে উঠল, 'ভূতের মত বুঝি আমি দাঁড়িয়ে আছি, দাদামণি!'

'তাই তো দেখছি।'

গফুর গম্ভীর গলায় বলল, 'ভূতের মত তো দাঁড়িয়ে আছে ডি. কস্টা,আমি কেন!'

শহীদ বলল, 'ডি. কস্টা দাঁড়িয়ে আছে! কোথায়?'

গফুরের আগ্রহ দেখা দিল, অবাকভাবে সে বলল, 'সেকি, দাদামণি! তোমার কিচ্ছু মনে থাকে না, ক'দিন থেকেই বলছি তোমাকে, কস্টাটা রোজ ভোরবেলা থেকে আমাদের বাড়ির কাছে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে!'

শহীদ বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ডি.কস্টা ক'দিন থেকে একটা কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে বটে। অন্ধকার থাকতে রোজ আমি একটু বেড়াতে বেরুই । ডি. কস্টা বহুদূর থেকে আমাকে অনুসরণ করে। আমি বাড়ি ফিরে এলে কস্টাও বাড়ির কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করতে থাকে। তারপর একসময় চলে যায় ও। তা তুই সে ব্যাপারে কি বলতে চাস?'

গফুর গম্ভীর গলায় জানতে চাইল, 'কেন ও তোমাকে অনুসরণ করছে রোজ রোজ?'

'তা তো বলতে পারব না। কোন খেয়াল বশত নিশ্চয়। হয়ত ডিটেকটিভগিরি শেখার শখ হয়েছে, তাই আমার আচার-আচরণ,ভাব-ভঙ্গি দেখে রপ্ত করবার চেষ্টা করছে।'

গফুর তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল, 'লোকটার ভাবগতিক আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না, তুমি যাই বল, দাদামণি।'

শহীদ বলে উঠল, 'বুঝেছি এবার। তোর হাত নিশপিশ করছে, তাই কাউকে সুযোগমত পেয়ে মনের সাধ পূরণ করার ইচ্ছা। ভাগ, ওসব হবে না।'

গফুর সন্তুষ্ট হল না। সে এসেছিল ডি. কস্টাকে আচ্ছা মত ধোলাই করবার জন্যে দাদমণির অনুমতি নিতে। উল্টে ধমক খেতে হল তাকে। দুপদাপ পায়ের শব্দ তুলে মনের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বের হয়ে গেল সে রুম থেকে।

গফুর বের হয়ে যেতেই কামাল বলল, 'গফুরের তেমন দোষ নেই। মারধোর খাবার বা দেবার অভ্যাস ওর । বেশ কিছুদিন ধরে ওসব আদান-প্রদান হচ্ছে না যে!'

শহীদ বলল, 'বাদ দে ওর কথা।।'

কথাটা বলে কি যেন চিন্তা করতে লাগল শহীদ। শহীদের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কামাল, 'জরুরী আলাপটা কিসের রে?'

শহীদ সাথে সাথে কোন কথা বলল না। এক-মুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আচ্ছা, কামাল, দু'জন ভদ্রলোকের কথা তোর মনে আছে? বছরখানেক আগে আমাদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছিলেন? মি. সারওয়ার এবং মি.ওসমান গনি? ওঁরা দু'জনেই এরফান মল্লিককে খুঁজে বের করার জন্যে আমাদের সাহায্য চেয়েছিলেন। স্মরণ করতে পারিস?'

কামাল বলল, 'মনে পড়ছে বটে। দুই ভদ্রলোকই ছায়াছবির নাম করা প্রযোজক ছিলেন। পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন ওঁরা। বছরখানেক আগে পূর্ব-বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে এসেছিলেন। আসার মাসখানেক পরই ওঁরা আমাদের কাছে আসেন। মি.সারওয়ার এবং মি.ওসমান গনির অল্প দিনের বন্ধু ছিলেন এরফান মল্লিক। এরফান মল্লিকের বিরুদ্ধে ওঁদের অভিযোগ ছিল নাকি গুরুত্বপূর্ণ। ওঁদের পাঁচ লাখ টাকা মেরে দিয়েছিলেন নাকি এরফান মল্লিক। মেরে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। ওঁদের দু'জনার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পশ্চিম-বঙ্গ থেকে ভেগে পূর্ব-বাংলায় আত্মগোপন করে আছে এরফান মল্লিক। আমাদেরকে অনুরোধ করেছিলেন ওঁরা, এরফান মল্লিককে খুঁজে বের করে দেবার জন্যে। তুই নিজে কাজটা না নিয়ে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলি।'

শহীদ জানতে চাইল, 'কেসটার পরিণতি কি হয়েছিল শেষ পর্যন্ত?'

'চার-পাঁচ মাস ভয়ানক জ্বালাতন করে বেড়িয়েছিলেন ওঁরা। দিনের মধ্যে দশ-বারো বার ফোন করতেন, সশরীরে হাজির হতেন দু'বার তিনবার করে। সেই একই প্রশ্ন, কোন সন্ধান পাওয়া গেল এরফান মল্লিকের? চার-পাঁচ মাস ধরে নানা কৌশলে এরফান মল্লিকের সন্ধান বের করার চেষ্টা করলাম আমি। কোন হদিসই করতে পারলাম না। অন্তত আড়াইশো এরফান মল্লিক নামধারী ভদ্রলোককে সন্দেহ করেছিলাম পয়লা। পরে বুঝলাম, অপরাধী এরফান মল্লিক নিশ্চয় নাম বদলে ফেলেছে। যাই হোক, কোন সূত্র ধরেই এরফান মল্লিকের কোন সন্ধান করতে পারছিলাম না আমি। এমন সময় হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম মি.সারওয়ার এবং মি.ওসমান গনি আমার কাছে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আমি। আমার ধারণা হয়েছিল, এরফান মল্লিক ঢাকায় থাকতে পারে না সুতরাং প্রতিটি জেলা চষে বেড়ানো দরকার তাঁকে খুঁজে বের করতে হলে কিন্তু মি. সারওয়ার এবং মি. ওসমান গনি ইতিমধ্যে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন বোধহয় একদিন দেখা করে নিজের ব্যর্থতার কথা জানালাম। ওঁদেরকে কিন্তু তেমন হতাশ বলে মনে হল না। এরফান মল্লিক সম্পর্কে কোন আলোচনাই করলেন না ওঁরা যেচে পড়ে। আমি চলে এলাম। সেই শেষ। আর দেখা-সাক্ষাৎ নেই ওদের সাথে।

কিন্তু সে প্রসঙ্গ হঠাৎ আজ নতুন করে তুলছিস কি কারণে?'

শহীদ এবার মূল বক্তব্য প্রকাশ করল, 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে আজ জরুরী চিঠি পেয়েছি একটা। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। বছর দেড়েক ধরে ওরা তিনজন লোককে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই যে, তিনজনের ফটো পাঠিয়েছে ওরা।'

ফটোগুলো কামালের দিকে বাড়িয়ে দিল শহীদ। কামাল ফটোগুলো হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'আরে, এদের মধ্যে একজন বাঙালীও যে রয়েছে!'

শহীদ বলে উঠল, 'শুধু বাঙালী নয়। শিক্ষিত এবং ধনী। বাঙালী মুসলমান। ভদ্রলোকের প্রকৃত নাম সোলায়মান চৌধুরী। জমিদার ছিলেন। বাকি দু জন তো দেখতেই পাচ্ছিস, ইউরোপীয়ান। কুখ্যাত মাফিয়া দলের দুর্ধর্ষ খুনী ওরা। ওদের আড্ডা ছিল ইংল্যাণ্ডে। ওদের নাম হেস্টিংস আর বব।'

কামাল জানতে চাইল, 'অপরাধটা কি ওদের?'

শহীদ বলল, 'হেস্টিংস আর ববের ব্যাকগ্রাউণ্ড অন্যান্য মাফিয়ানোদের মতই। কিন্তু জমিদার সোলায়মান চৌধুরীর পূর্ব-ইতিহাস ইন্টারেস্টিং। পশ্চিম-বঙ্গের হুগলি জেলার জমিদার ছিলেন একসময়। আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউই ছিল না। সোলায়মান চৌধুরী পড়াশোনা করতেন লণ্ডনে। জমিদারী দেখাশোনা করত নায়েব। নায়েবের নাম কি হতে পারে বল তো?'

কামাল বলল, 'সোলায়মান চৌধুরীর নায়েবের নাম আমি কিভাবে জানব?'

'সোলায়মান চৌধুরীর নায়েবের নাম ছিল এরফান মল্লিক।'

আশ্চর্য হয়ে কামাল বলল, 'তাই নাকি!'

শহীদ বলতে শুরু করল, 'হ্যাঁ, এই নায়েব এরফান মল্লিকই মি.সারওয়ার এবং মি.ওসমান গনির পাঁচ লাখ টাকা মেরে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে রয়েছেন। তা সে যাই হোক, আসল কথায় ফিরে আসা যাক এবার। সোলায়মান চৌধুরী লণ্ডনে থাকতেন বলে জমিদারী দেখাশোনা করত নায়েব এরফান মল্লিক। হঠাৎ সোলায়মান চৌধুরী লণ্ডনে এক ধনী-কন্যার প্রেমে পড়ে বিয়ে করে ফেলেন। এই বিয়েতে মেয়েটির আত্মীয়-স্বজন কেউ সন্তুষ্ট হয়নি। সোলায়মান চৌধুরী দেরি না করে স্ত্রীকে নিয়ে চলে আসেন স্বদেশে। ইংল্যাণ্ডে আর কোনদিন ফিরে যাবার ইচ্ছা ছিল না তাঁর। বছরখানেক অতিবাহিত হবার পর ওঁদের মেয়ে হয় একটা। সেই মেয়ের বয়স যখন মাত্র দেড়মাস, তখন লণ্ডন থেকে সোলায়মান চৌধুরীর শ্যালক একটা টেলিগ্রাম করে—সোলায়মান চৌধুরীর শ্বশুর মারাত্মক ভাবে অসুস্থ, এখন-তখন অবস্থা। মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে তিনি একটি বারের জন্যে মেয়েকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাই টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে শ্যালক-প্রবর। খবর শুনে সোলায়মান চৌধুরীর স্ত্রী কান্নাকাটি শুরু করে। সোলায়মান চৌধুরী অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেন, স্ত্রীকে নিয়ে মৃত্যু-পথযাত্রী শ্বশুরকে শেষ দেখা দেখার জন্যে লণ্ডনে যাবেন। এবং দেখা করেই ফিরে আসবেন। ওঁদের দেড়মাস বয়সের মেয়েটির নাম রাখা

হয়েছিল সুরাইয়া। সুরাইয়াকে নায়েব এবং নায়েবের স্ত্রীর কাছে রেখে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ওদেরও একটি সদ্যজাত কন্যা-সন্তান ছিল। তাছাড়া নাকি মেয়েটির দেখাশোনা করার জন্যে দু'জন নার্সেরও ব্যবস্থা করে যান সোলায়মান চৌধুরী।'

শহীদ একটু থেমে আবার শুরু করল, 'আসলে সোলায়মান চৌধুরীর সাথে মেয়ের বিয়ে হওয়াতে প্রচণ্ড রেগে ছিল তাঁর শ্বশুরকুল। মিথ্যা টেলিগ্রাম করেছিল ওরা। সোলায়মান চৌধুরী সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে উঠলেন। সাথে সাথেই টের পেলেন, তাদেরকে মিথ্যে খবর দিয়ে আনা হয়েছে। দু'চারদিন চুপচাপ রইলেন তিনি। তারপর একদিন স্ত্রীকে বললেন দেশে ফেরার কথা। স্ত্রী সোজাসুজি কোন উত্তর না দিয়ে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। চৌধুরী বুঝল, শ্বশুর-শাশুড়ী এবং শালা তাঁর স্ত্রীকে দলে টেনে নিয়েছে। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করার পর একদিন শ্বশুর এবং শাশুড়ীর কাছে প্রশ্নটা উত্থাপন করলেন তিনি। তারা এক কথায় নাকচ করে দিল—তাদের মেয়ে ফার ঈস্টের কোন জংলী দেশে ফিরে যেতে চাইছে না। জামাইকে তারা উপদেশ দিল—লণ্ডনেই স্থায়ীভাবে থেকে যাবার জন্যে। সোলায়মান চৌধুরী রাজি হলেন না। তর্ক-বিতর্ক শুরু হল। কথা কাটাকাটির মধ্যে আবির্ভাব ঘটল চৌধুরীর শালার। সে এসেই শাসিয়ে উঠল। 'ব্ল্যাক ডগ' বলে সম্বোধন করল সে চৌধুরীকে। চৌধুরী লজ্জায়, অপমানে দিশেহারা। অবশেষে তিনি বললেন, ঠিক আছে। আমার স্ত্রীকে ডেকে দাও, তার নিজের মুখে শুনব আমি। সে যদি থাকতে চায় তবে আমিও থেকে যাব লণ্ডনে। শ্বশুর মহাশয় তাঁর মেয়েকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে এল সিটিংরুমে। মেয়ে বাবার শেখানো কথামত বলল, পশ্চিম-বাংলায় ফিরে যেতে চায় না সে।'

শহীদ একটু থেমে শুরু করল আবার, 'সোলায়মান চৌধুরী অপমানিত হয়ে ফিরে এলেন এক হোটেলে। স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় চরম আঘাত পেয়েছিলেন তিনি। স্থির করলেন, এই অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। পরদিনই ওত পেতে দাঁড়িয়ে রইলেন শ্বশুরের বাড়ির কাছে। রাত এগারটা। শ্যালক-প্রবর এক পার্টি থেকে ফিরছিল। সোলায়মান চৌধুরী অন্ধকার থেকে লাফ মেরে শ্যালকের বুকে ছোরা বসিয়ে দিলেন আমূল। তারপর সিধে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন তিনি। দু'বছর ধরে কেস চলল। অপরাধী প্রমাণিত হলেন সোলায়মান চৌধুরী। কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল তাঁর।'

'ইন্টারেস্টিং! তারপর?'

শহীদ নতুন করে সিগারেট ধরিয়ে বলতে লাগল, 'তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। জেলের ভিতরে সোলায়মান চৌধুরী শান্তশিষ্টভাবে কাটিয়ে দিলেন দু'বছর। দু'বছর পর তাঁর পরিচয় হল হেস্টিংস আর ববের সাথে। সদ্যখুন করে জেলে ঢুকেছিল ওরা দু'জন। চৌধুরীর লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্য দেখে কৌতূহলী হয়ে পড়েছিল ওরা। যেচে পড়ে ঘনিষ্ঠতা করল ওরা তাঁর সাথে। নাড়ী-নক্ষত্র সব জেনে নিল

একদিনেই। তখন চৌধুরী দেশের ঠিকানায় নায়েবের কাছে প্রতি সপ্তাহেই চিঠি লিখতেন। উত্তরও পেতেন নিয়মিত। কিন্তু ক্রমশ নায়েবের চিঠির সংখ্যা কমতে লাগল। যা-ও দু'একটা আসত, সে-ও দায়-সারা গোছের। একসময় হঠাৎ চিঠি-পত্র লেখা একদম বন্ধ হয়ে গেল। চৌধুরী নিয়মিত চিঠি লিখে লিখে হয়রান। কিন্তু তাঁর কোন চিঠিরই উত্তর পাওয়া গেল না। হেস্টিংস আর বব চৌধুরীর অন্ধ ভক্ত হয়ে পড়েছিল ইতিমধ্যে। তারাও ব্যাপারটা জানল। দু'জনাই সন্দেহ করল নায়েব এরফান মল্লিক বিশ্বাসঘাতকতা করেছে চৌধুরীর সাথে। চৌধুরীর মেয়েটাকে হয়ত মেরে ফেলেছে, আর সব সম্পত্তি নিজের নামে করে নিয়ে ভোগ করছে অথবা বিক্রি করে দিয়ে অন্যত্র কোথাও মৌজসে জীবন কাটাচ্ছে। কয়েকদিন পাগলের মতন ছটফট করে কাটালেন মি.চৌধুরী। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল হেস্টিংস আর বব। ওরা প্রস্তাব দিল, চৌধুরী চাইলে জেল থেকে পালাবার সব বন্দোবস্ত করে দিতে পারে তারা। চৌধুরী রাজি হলেন না। তাঁর ভয়, পালানো সম্ভব নয়। জেল থেকে বের হওয়া সম্ভব হলেও ধরা পড়ে যাবেন লণ্ডনেই। জেল-কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ভারত সরকারের কাছে চিঠি লিখলেন তিনি—নায়েব এরফান মল্লিক এবং চৌধুরীর সম্পত্তির হালচাল কি, জানার জন্যে। চিঠির উত্তর এল কয়েকমাস পরে। দেশ তখন স্বাধীন হয়েছে সবে। উত্তর এল চৌধুরীর সব সম্পত্তি বিক্রি হয়ে গেছে। এরফান মল্লিকের কোন সন্ধান হিন্দুস্থান সরকারের জানা নেই। তবে তাদের ধারণা, এরফান মল্লিক পূর্ব-পাকিস্তানে চলে গেছেন সম্ভবত। দুঃসংবাদটা পেয়ে চৌধুরী গুম মেরে গেলেন। নায়েব এরফান মল্লিক যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তা আর বুঝতে বাকি রইল না তাঁর। হেস্টিংস আর বব তাঁকে পালাবার পরামর্শ দিল আবার। এবার রাজি হয়ে গেলেন চৌধুরী। দিন-ক্ষণ ঠিক হল। জেলের ভিতর থেকেই বন্দোবস্ত করে দিল হেস্টিংস আর বব। নিরাপদে জেল থেকে বের করে দিল তারা চৌধুরীকে। কিন্তু পারলেন না চৌধুরী স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে ধোঁকা দিতে। ধরা পড়ে গেলেন দু'দিন পর লণ্ডনেই। আবার যথাস্থানে ফিরে আসতে হল। হেস্টিংস আর বব চৌধুরীকে জেল থেকে বের করে দিয়ে মনে কষ্ট পেয়েছিল। চৌধুরীকে পছন্দ করত ওরা দু'জন। চৌধুরী আবার জেলে ফিরে আসাতে খুশি হল ওরা। তারপরের ইতিহাস দুঃখজনক। সোলায়মান চৌধুরী মাফিয়া দলের দুই কুখ্যাত খুনির সাথে চরম ঘনিষ্ঠতা শুরু করলেন। তিনজনের সখ্যতা গড়ে উঠল জেলের ভিতরে। জেলের ভিতরেই নানারকম ছোটখাট অপরাধ করতে শুরু করল তিনজনের দলটা। কোথা থেকে মদ পেত যেন, সেই মদ খেয়ে মাতলামি করত। সোলায়মান চৌধুরীর অধঃপতন ঘটল এভাবেই। যাই হোক, দীর্ঘ কুড়ি বছর পর চৌধুরীর মুক্তিলাভ ঘটল। জেলের বাইরে এসে অসহায়, নিঃসম্বল, একা-একা মনে হল নিজেকে। দেশের কথা মনে পড়ে না তেমন করে। মনে পড়লেও লাভ কি। খুনী বলে চিহ্নিত সে। পকেটে পয়সা নেই। বয়সও বেড়ে

গেছে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেফিরে দিন কাটতে লাগল। ছ'মাস কেটে গেল না খেয়ে রাস্তায় রাস্তায়। ছ'মাস পর জেল থেকে ছাড়া পেল হেস্টিংস আর বব। দেখা হল আবার তিনজনের। চৌধুরী তখন নিস্তেজ হয়ে গেছেন। কিন্তু ছাড়ল না হেস্টিংস আর বব। ওরা বলল, "চৌধুরী, দেশে ফিরতে হবে তোমাকে। তুমি বড়লোক মানুষ, তোমার মেয়ে আজ বেঁচে থাকলে বড় হয়েছে। তোমার সাথে এরফান মল্লিক বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে দেশে না ফিরলে চলবে কেন? প্রতিশোধ নেবার জন্যে দেশে তোমাকে ফিরতেই হবে। আমরাও যাব তোমার সাথে। তোমার উপকার না করতে পারলে আমাদের মনে শান্তি নেই।" চৌধুরী রাজি হলেন না প্রথমে। কিন্তু হেস্টিংস আর বব শুনল না কোন কথা। শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন চৌধরী, কিন্তু টাকা? হেস্টিংস আর বব বলল, টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা লুট করব আমরা।'

শহীদ আবার সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। কামাল বলল, 'তারপর?'

শহীদ বলতে লাগল, 'তারপর সত্যি সত্যি তিনটে পিস্তল নিয়ে একটা ব্যাঙ্কে চড়াও হল ওরা। কিন্তু টাকা লুট করল বটে, সহজে সারতে পারল না কাজটা। ক্যাশিয়ার বাধা দিতে এগিয়ে আসতেই হেস্টিংস আর বব গুলি করল। ব্যাঙ্কের দারোয়ান বন্দুক উঁচিয়ে ধরতেই গুলি করলেন সোলায়মান চৌধুরী। ক্যাশিয়ার আর দারোয়ান নিহত হল। প্রচুর টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল তিনজন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ভার নিল কেসের। কিন্তু কোন সন্ধানই করতে পারেনি তারা। সারা ইংল্যাণ্ড চষে বেড়িয়েছে পুলিস। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে সকল প্রচেষ্টা। গত বছর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড জানতে পারে, খুনী তিনজন হিন্দুস্থানে আছে। হিন্দুস্থান পুলিসকে অনুরোধ করা হয় সন্ধান দেবার জন্যে। হিন্দুস্থান পুলিস জানিয়েছে, ওরা তিনজন হিন্দুস্থানে নেই, পূর্ব-পাকিস্তানে চলে গেছে। সেই খবরের উপর ভিত্তি করে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে পূর্ব-পাকিস্তান পুলিসের কাছে অনুরোধ-পত্র এসেছে নিশ্চয়। ওরা আমাকেও ব্যক্তিগতভাবে একটা চিঠে দিয়েছে। সন্ধান পেলে জানাবার অনুরোধ করা হয়েছে চিঠিতে। চিঠির সাথে তথ্যও আছে।'

কথা শেষ করে নিঃশ্বাস ফেলল শহীদ। খানিকক্ষণ কামালও কোন কথা জিজ্ঞেস করল না। সিগারেটে টান দিয়ে শহীদ প্রশ্ন করল একটু পর, 'সব শুনে কি ভাবনা জাগে বল দেখি?'

কামাল চিন্তিতভাবে বলল, 'সোলায়মান চৌধুরী যদি সত্যি পূর্ব-পাকিস্তানে এসে থাকেন তাহলে নায়েব এরফান মল্লিককে বিশ্বাসঘাতকতার সাজা দেবার জন্যেই তিনি এসেছেন। তাঁর প্রথম কাজ হবে, এরফান মল্লিককে খুঁজে বের করা।'

শহীদ বলল, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, এরফান মল্লিক একটা জাত শয়তান। জমিদার সোলায়মান চৌধুরীর সর্বনাশই সে শুধু করেনি, মি. সারওয়ার এবং মি. ওসমান গনিরও টাকা মেরে আত্মগোপন করে আছে।'

শহীদ বলল, 'তা ঠিক। কিন্তু নায়েব যত বড় অপরাধই করুক, সোলায়মান চৌধুরী, হেস্টিংস ও ববের হাতে সে নিহত হোক তা আমরা কামনা করতে পারি না। ওরা তিনজন এরফান মল্লিকের সন্ধান পেলে নিশ্চই পুলিসে খবর দেবে না। স্রেফ হত্যা করবে। সুতরাং সাবধান হতে হবে আমাদেরকে। এই বছরখানেক আগে চৌধুরী,হেস্টিংস আর বব পূর্ব-পাকিস্তানে এসেছে। আমার মনে হয়,এরফান মল্লিককে ওরা এখনও খুঁজে পায়নি। পেলে খুন করত। তার খুন হলে ব্যাপারটা চাপা পড়ে থাকা সম্ভব নয়।'

কামাল একটু চিন্তা করে বলল, 'আচ্ছা, শহীদ, গত বছরখানেক ধরে যদি ওরা বাংলাদেশে থেকেই থাকে, তাহলে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে নাকি? জাত-অপরাধীরা তো তেমন হয় না?'

শহীদ বলল, 'তোর কথাটা খাঁটি। তবে আমার মনে হয়, ওরা এখনও একটিমাত্র উদ্দেশ্য সামনে রেখে দিন কাটাচ্ছে। সেটা হল, এরফান মল্লিককে হত্যা করা। এরফান মল্লিককে হত্যা না করে ওরা কোন ঝুঁকি নিয়ে নিজেদেরকে চিহ্নিত করতে চায় না।'

কামাল বলল, 'তাও বটে।'

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, এরফান মল্লিক চিত্র-প্রযোজক মি.সারওয়ার এবং মি.ওসমান গনির টাকা কিভাবে মেরে দিয়েছিল?'

কামাল বলল, 'ব্যবসা করার জন্যে এরফান মল্লিক এবং ওঁরা দু'জন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রত্যেকে আড়াই লাখ করে টাকা যোগ করে আমব্রেলা ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ওঁরা দুজন ওঁদের ভাগের মোট পাঁচ লাখ টাকা এরফান মল্লিককে বিশ্বাস করে দিয়ে দেন। পরদিন সাড়ে সাত লাখ টাকা প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাঙ্কে জমা দেবার কথা। পরদিন সকাল বেলা ওঁরা দুই বন্ধু এরফান মল্লিকের বাড়ি গিয়ে দেখেন, বাড়ি খালি। এরফান মল্লিক ভেগেছে টাকা নিয়ে। এই হল ঘটনা।'

'তখন এরফান মল্লিক থাকত কোথায়? ক'বছর আগের ঘটনা এটা? এরফান মল্লিকের সংসারে তখন কে কে ছিল? আর একটা প্রশ্ন, এরফান মল্লিকের সাথে কোথায়, কবে ওদের দু'জনার পরিচয় হয়?'

কামাল উত্তর দিল, 'থাকত কোলকাতায়। ওঁদের সাথে পরিচয়ও ওখানেই। পরিচয়ের সঠিক তারিখ ওঁরা আমাকে জানাতে পারেননি, তবে বলেছেন উনিশশো ষাট সালে পরিচয় হয়। বাষট্টি সালে টাকা মেরে দিয়ে অদৃশ্য হয় এরফান মল্লিক। তার সন্ধানেই গতবছর ওঁরা ঢাকায় আসেন, এবং কিছুদিনের মধ্যেই যোগাযোগ করেন আমাদের সাথে। ঢাকায় এসে দু'জনাই চিত্র-প্রযোজনাকে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেন। যাকগে, তোর বাকি প্রশ্নটার উত্তর হল—এরফান মল্লিকের সাথে ওঁদের পরিচয় হবার পর ওঁরা দেখেছেন, একমাত্র মেয়ে ছাড়া সংসারে আর কেউ

ছিল না তার। স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। মেয়েটি কলেজে পড়াশোনা করত।'

শহীদ বলল, 'সোলায়মান চৌধুরী নিজের দেড় মাস বয়স্কা কন্যা সন্তানকে এরফান মল্লিকের হেফাজতে রেখে সস্ত্রীক যখন লণ্ডনে চলে যান তখন এরফান মল্লিকেরও একটি মেয়ে সবেমাত্র জন্ম গ্রহণ করেছিল। ওঁরা যে মেয়েটিকে দেখেছেন সেটা এরফান মল্লিকের নিজের মেয়ে নিঃসন্দেহে। কিন্তু সোলায়মান চৌধুরীর মেয়ের খবর কি? আচ্ছা এরফান মল্লিকের মেয়ের নাম কি?'

কামাল বলল, 'এরফান মল্লিকের মেয়ের নাম বলতে পারেননি ওঁরা।'

শহীদ বলল, 'মি.সারওয়ার এবং মি.ওসমান গনি এরফান মল্লিকের খুঁজে বের করার ইচ্ছেটা হঠাৎ কেন যে দূর করে দিলেন সেটা একটা রহস্য বলে সন্দেহ হচ্ছে আমার। ওঁরা কি এরফান মল্লিকের সন্ধান নিজেরাই পেয়ে গেছেন?'

কামাল বলল, 'তাহলেও তো বলতেন আমাদেরকে। তবে গোপনীয় কোন উদ্দেশ্য থাকলে অবশ্য আমাকে না জানাবারই কথা।'

শহীদ বলল, 'গোপন উদ্দেশ্য বলতে কি বোঝাতে চাস? ব্ল্যাকমেইল? না. হত্যা?'

কামাল চিন্তিতভাবে বলল, 'ব্ল্যাকমেইল হতে পারে, কেবল পাঁচ লাখ টাকা ওদেরকে ফিরিয়ে দেবার পরও যদি এরফান মল্লিকের প্রচুর টাকা থাকে। আর হত্যা? নির্দিষ্ট করে বলা যায় না কিছু। মি. সারওয়ার বা মি. ওসমান গনি খুব সহজ-সরল-নিরীহ নন বলেই ধারণা আমার। তবে জোর করে কোন কিছু বলা যায় না।'

শহীদ বলল, 'যাই হোক, তোর সাথে ওদের ব্যবহারটা খানিকটা রহস্যময়। তুই এখুনি একবার গিয়ে দু'জনার সাথেই দেখা করে আয়। সবরকম চেষ্টা করবি জানার জন্যে, কেন এরফান মল্লিকের সন্ধান লাভের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন ওঁরা।'

কামাল সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি এখুনি যাচ্ছি, পরে তোকে সব জানাব।'

কামাল চলে যেতেই একটা সিগারেট জ্বালিয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে পাওয়া চিঠিটা ড্রইং-রুমের আলমারিতে তালাবদ্ধ করে রেখে দিল শহীদ। সোফার দিকে পা বাড়াচ্ছে আবার বসবার জন্যে,এমন সময় ককিয়ে উঠল ফোনটা।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে শহীদ বলল, 'শহীদ স্পিকিং…হ্যালো…?'

পলকের মধ্যে শহীদের সারা মুখে অবিশ্বাসের, বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল। ওকে বলতে শোনা গেল, 'এসব কি বলছেন আপনি, মি. সিম্পসন! ব্যাঙ্ক ডাকাতি…আচ্ছা। অ্যাঁ, কি বললেন?…ত্রিশলাখ টাকা! একটা…একটা কি? মানে…কঙ্কাল…কঙ্কাল মানে? আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন…সত্যিই তাই

নাকি? আচ্ছা, দারোয়ান আর ক্যাশিয়ার দেখেছে? কঙ্কাল? দিনে দুপুরে! ঠিক আছে, এখুনি আসছি আমি…।'

রিসিভার রেখে এক মুহূর্তের জন্যে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শহীদ ফোনের দিকে। তারপর গফুরকে ডাকল ও। গফুর রুমে এসে ঢুকতেই দরজার দিকে পা বাড়িয়ে শহীদ বলল, 'মি. সিম্পসনের কাছে যাচ্ছি আমি। কামাল ফিরে এলে ইস্টার্ন ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে যেতে বলে দিবি। তোর দিদিমণিকেও আমার যাবার কথা বলে দিস।'

'বলব, দাদামণি।'

শহীদকে উত্তেজিত এবং ব্যস্ত দেখে গফুর আন্দাজ করল, নিশ্চয় আবার মারামারি কাটাকাটির কোন খবর পেয়েছে দাদামণি।

তিন

কয়েকদিন পরের ঘটনা। কুয়াশার বাড়ি। ভোর চারটে।

শীতের রাত। চারদিকে নিস্তব্ধতা। খুট করে একটা শব্দ হল হঠাৎ। ঘুমের মধ্যেও সজাগ থাকে কলিম। শব্দটা শুনে ঘুম ভেঙে গেল ওর। লেপটা নিঃশব্দে মুখ থেকে সরিয়ে চোখ মেলল ও। ধক্ করে উঠল বুকের ভিতরটা সাথে সাথে। গাঢ় অন্ধকারে ভরে গেছে সারাটা ঘর। অথচ পরিষ্কার মনে আছে ওর, শোবার সময় জিরো পাওয়ারের বালব্ জ্বেলে দিয়েছিল। কান পেতে রইল কলিম। একটু পরেই আবার শব্দ হল। মনে হল, ঘরের ভিতরই শব্দটার উৎস। ধীরে ধীরে বালিশের তলা থেকে একহাতি লোহার ডাণ্ডাটা হাতে নিল কলিম। ঘরের ভিতরে অন্য একটা চৌকিতে শুয়ে আছে শ্যানন ডি. কস্টা। কলিম ভাবল, ডি. কস্টাকে জাগাবার একটা উপায় করতে পারলে হত। কিন্তু চৌকিটা ঘরের আর এক প্রান্তে। আবার শব্দ হল একটা। এবারের শব্দ শুনে মনে হল, কেউ যেন কাপড়-চোপড় নাড়ছে। খসখসে শব্দটা দ্বিতীয়বারও হল। চোর নাকি? নাকি…

সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল কলিমের। কঙ্কালের কথা মনে পড়ে গেছে ওর। শহরময় ক'দিন থেকে ভীষণ একটা আতঙ্ক বিরাজ করছে। মানুষের মত বেশ-বাস করে, সারা গায়ে এক ধরনের স্বচ্ছ মোম লাগিয়ে একদল কঙ্কাল ভয়ঙ্কর উপদ্রব শুরু করে দিয়েছে। প্রথম যে ঘটনাটা ঘটে সেটা সবচেয়ে বিস্ময়কর। দেশের চারটে ব্যাঙ্কে একই সময়ে, একই কৌশলে চারটে মানুষ-বেশী কঙ্কাল মোটা টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। তারপর এক বোম্বাই-ওয়ালার পঞ্চাশ লক্ষ টাকার গহনা নিয়ে গেছে। তৃতীয় ঘটনাটা ঘটে সমুদ্রে। সমুদ্রপথে বিদেশ থেকে সরকারী সোনা আসছিল তের মণ। কঙ্কালদল অদ্ভুত উপায়ে সেই তের মণ সোনা নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে। আবার একটা শব্দ হতে সারা গা শিউরে উঠল কলিমের। শব্দটা এবার

অতি কাছাকাছি কোথাও থেকে হয়েছে। কান পেতে রইল কলিম। আর ঠিক সেই সময় কলিমের মুখের উপর কেউ যেন নিঃশ্বাস ফেলল। সাথে একটা শক্ত হাত ওর গায়ের উপর আলতোভাবে এসে পড়ল। প্রচণ্ড বেগে লাফিয়ে উঠেই অন্ধকারে আন্দাজ করে একটা দেহকে জাপটে ধরল কলিম!

চিৎকার করা উচিত ছিল কলিমেরই। কিন্তু কলিম নয়, যাকে ও ধরেছে সে-ই বিকট স্বরে রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে আর্তচিৎকার করে উঠল। ঘাবড়ে গেল কলিম। যাকে সে ধরেছে সে ছাড়াবার চেষ্টা করছে না মোটেই নিজেকে। শুধু তীক্ষ্ণ স্বরে একটানা চেঁচাচ্ছে—ই-ই-ই-ই-করে!

বিলম্বিত চিৎকারটা শেষ হয়ে আসছে। কলিম আরও জোরে জাপটে ধরল লোকটাকে। চিৎকারটা শেষ করেই লোকটা আর্তকণ্ঠে কাঁদোকাঁদো হয়ে বলে উঠল, 'ছেড়ে ডে, শ্লা! ছেড়ে ডে, টা না হলে টোর বারটা বাজা দেগা! হাড়-টাড় গুড়িয়ে ডেবার ফণ্ডি, হামি কমপ্লেন করেগা টোমার নামে বসের কাছে!

আতঙ্ক উবে গিয়ে রাগে সারা শরীর জ্বালা করে উঠল কলিমের। ডি.কস্টাকে ছেড়ে দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে সুইচ-বোর্ড খুঁজে আলো জ্বালল সে। ডি.কস্টা তখনও গজরাচ্ছে, 'হাড়-গোড় গুড়িয়ে ডেবার ফণ্ডি, হামি কমপ্লেন করেগা টোমার নামে বসের কাছে।'

কলিম দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল, 'আবার ব্যাটা চেঁচায়, তুই কমপ্লেন করবি কেমন করে, অ্যাঁ? এই ভোর রাতে কি কাণ্ড করার মতলব শুনি?'

ডি.কস্টা কোমরে হাত দিয়ে রক্ত চক্ষু মেলে শাসিয়ে উঠল, 'ডেখো, কলিম মিয়া, ভুলে যেয়ো না যে, টুমি রাজার জাটের সাঠে কঠা বলিটেছ। খবরডার, টুই-টোকারি করলে টোমার জিভ টেনে বের করে লেগা!'

কলিম এক লাফ দিয়ে ধরে ফেলল ডি. কস্টার ঘাড়। বলল, 'আজ ব্যাটা তোর একদিন কি আমার একদিন। বল্, বাতি নিভিয়ে দিয়ে আমার গায়ে হাত দিচ্ছিলি কেন? বল্?'

ডি.কস্টা মহা ফাঁপরে পড়ল। আত্মসম্মান বলে আর কিছু রইল না নেটিভটার কাছে, গায়ে হাত তুলতেও কসুর করল না। এই অপরাধের সমুচিত শাস্তি দিতেই হবে তাকে। কিন্তু মনে মনে ভেবে দেখল, কলিম আজ খেপে গেছে। খ্যাপা মানুষ খুনীর সমান। তেড়িবেরি করলে হয়ত খুনই করে ফেলবে তাকে। আত্মসম্মানের চেয়ে প্রাণ বাঁচানো আগে। শান্ত, নরম, পরাজিত গলায় বলে উঠল সে, 'ছেড়ে ডে আমাকে, ব্রাদার। টোর ডু'টো পায়ে ঢরি—থুককু, পায়ে ঢরব না, গিভ মি এ চান্স। রিকয়েস্ট করছি।'

কলিম ছেড়ে দিয়ে বলল, 'কিছু চুরি করার মতলব করছিলি বুঝি?'

'নো। হামি চোর না। হাম ডিটেকটিভ হোবে।

ডি.কস্টার কথা শুনে চোখ জোড়া ছানাবড়া হয়ে গেল কলিমের। অবাক গলায়

সে বলে উঠল, 'কি? ডিটেকটিভ হবি!'

'টুই-টোকারি করবে না, বলে ডিচ্ছি!'

হঠাৎ রুখে দাঁড়াল ডি.কস্টা। কলিম বলল, 'আচ্ছা, এবার বলুন তো কস্টা সাহেব, ডিটেকটিভ হবার দুরাশা কেন হয়েছে আপনার?'

ডি.কস্টাকে গম্ভীর হতে দেখা গেল। সে বলতে লাগল, 'টোমাডের বস, আই মীন, আমার ফ্রেণ্ড কুয়াশার ঢারণা, শহীড খান এ-ডেশের বহুট বড়া প্রাইভেট ডিটেকটিভ। ড্যাট ম্যান ইজ ভেরি বুড্ডিমান। মাগার, হামিও টো কম বুড্ডিমান নয়। হামিও শহীড খানের মটো ডিটেকটিভ হোবে। টাই...।'

কলিম ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, 'ও,ঘোড়া রোগ হয়েছে। তা এই ঠাণ্ডায় যাওয়া হচ্ছিল কোথায় শুনি?'

ডি.কস্টা বলল, 'ও কঠা আউট করা যাবে না, আই অ্যাম সরি।'

কলিম আবার ডি. কস্টার দিকে এগিয়ে এল। বেচারা তাড়াতাড়ি বলল, 'ঠিক হায়, টোমাকে বলটে পারি, মাগার টুমি কাউকে বলটে পারবে না প্রমিজ?'

'বলব না কাউকে, বলুন এবার দয়া করে।'

ডি.কস্টা গম্ভীর ভাবে বলল, 'শহীড খানকে ফলো করটে যাই হামি হর রোজ। ডিটেকটিভ হটে হলে শহীড খানের হাঁটা-চলা, কঠা বলা, চিন্টাঢারা, হাসা সব কিছু কপি করা ডরকার টো। টা না হলে ডিটেকটিভ হোবে হামি কেমন করে, টুমিই বল।'

কলিম বলল, 'তা তো বটেই। আজও বুঝি শহীদ খানকে ফলো করতে যাচ্ছিলেন? কিন্তু আমার গায়ে হাত দেবার কারণটা কি, কস্টা সাহেব?'

ডি.কস্টা বলল, 'ঠাণ্ডা কিনা, টোমার মাফলারটা খুঁজে ডেকছিলাম।'

'সেকি কথা, আমি কি আপনার মত শীত-কাতরে! মাফলার কেউ বিছানায় নিয়ে শোয় নাকি? তাছাড়া ডিটেকটিভ হতে হলে শীতকে ভয় পেলে তো চলবে না, কস্টা সাহেব?'

রেগে গেল ডি.কস্টা। বলল, 'টুমি আমাকে শীটের ভয় ডেখাচ্ছ! জান, ডার্জিলিংয়ে হামি দু'বছর শুটু প্যান্ট পরে কাটিয়েছি?'

কলিম বলল, 'আমিও ছিলাম দার্জিলিংয়ে। তখন ভীষণ শীত পড়েছিল। তখন তুমি সেখানে থাকলে স্রেফ বরফ হয়ে গলে পানি হয়ে যেতে। সে সময়টায় এমন বেশি শীত পড়েছিল যে, জ্বলন্ত মোমবাতিগুলো পর্যন্ত জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। আমরা সেগুলো ফুঁ দিয়ে নেভাতে পারতাম না।'

ডি. কস্টা তারচেয়ে বড় গুল ছেড়ে বলে উঠল, 'ও আর কি শীট? হামি যখন ডার্জিলিংয়ে ছিলাম টখন এটো শীট পড়েছিল যে, কঠা বললে আমাদের কঠাগুলো বরফের চাঁই হয়ে আসটো। সেই বরফের চাঁইগুলোকে গলিয়ে ডেখটে হটো যে, আমরা কি কঠা-বার্তা বলাবলি করটেছিলাম।'

কথাগুলো বলতে বলতে চঞ্চলভাবে তাকাচ্ছিল ডি.কস্টা এদিক-ওদিক। কথা শেষ করেই লাফ দিল সে দরজার দিকে। কলিম কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘরের দরজা খুলে ভোঁ দৌড় দিল ডি.কস্টা । কলিম ওকে যেতে দেবে না সব কথা শোনার পর, এই ভয়ে কায়দা করে ভেগে গেল সে।

শহীদ খানকে অতিরিক্ত চিন্তিত দেখল ডি. কস্টা। রোজকার মত অন্ধকার থাকতেই প্রাতঃভ্রমণে বের হয়েছে বটে ও, কিন্তু কদিন থেকেই ওকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। ডি. কস্টাও দূর থেকে শহীদের মত দু'হাত পিছনে রেখে মাথা নিচু করে হাঁটছে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখে নিচ্ছে সে শহীদের ভঙ্গিটুকু। শহীদ সিগারেট ধরালে ডি. কস্টাও সিগারেট ধরায়। শহীদ দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভিয়ে দিয়ে রাস্তার পাশের ড্রেনে যেভাবে ছুঁড়ে ফেলে, ডি.কস্টাও সেভাবে অনুকরণ করে হুবহু। আজ বেশিক্ষণ হাঁটল না শহীদ। বাড়ি ফিরে এল সে সূর্য ওঠার আগেই। ডি.কস্টাও দূর থেকে দেখল সব। আজ সে আর শহীদের বাড়ির আশপাশে ঘুরঘুর না করে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। শহীদ খানের চিন্তিত ভাবটা ভাবিয়ে তুলেছে ডি.কস্টাকে। নিশ্চয় মানুষ-বেশী কঙ্কালের রহস্য মীমাংসা করার কথাই অমন মগ্ন হয়ে ভাবে শহীদ খান ক'দিন থেকে, অনুমান করল ডি.কস্টা। হঠাৎ চমকে উঠল সে। একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে তার! সে যে ডিটেকটিভ হবার জন্যে সাধনা করছে একথা শুনলে সবাই হাসাহাসি করবে! তারচে' সকলের তাচ্ছিল্যের দাঁত-ভাঙা জবাব দিতে পারলে একটা কাজের মত কাজ হয়। শহীদ খান তো কঙ্কাল-রহস্য ভেদ করার কথা ভাবছে এখনও। সে যদি আজ থেকেই কাজ শুরু করে দেয় কঙ্কালকে হাতে-নাতে ধরার জন্যে, তাহলে শহীদ খানের চেয়ে এগিয়ে থাকবে সে। আর একটা কঙ্কালও যদি সে ধরতে পারে—ওহ্, দেশময় হৈ-চৈ পড়ে যাবে। সকলেই তখন পাকা ডিটেকটিভ বলে তারিফ করবে তার। শহীদ খান তখন আর 'তুমি' বলবে না তাকে, মিস্টার শ্যানন ডি.কস্টা বলে হ্যাণ্ডশেক করার জন্যে ছুটে আসবে। সবচেয়ে বড় কথা, তার বস্ গর্ব অনুভব করবে তাকে নিয়ে। বস্ কুয়াশাকে খুশি করতে জানও কবুল করে দিতে পারে শ্যানন ডি.কস্টা।

কিন্তু তথ্য কোথায়? কিসের উপর নির্ভর করে কঙ্কাল ধরার জন্যে কাজ শুরু করবে সে? ডি.কস্টা পথ চলতে চলতে চিন্তা করতে লাগল। তথ্যের অভাব কি? মনে মনে ভাবল সে—কঙ্কাল যেখানেই হানা দিয়েছে সেখানেই দেখা গেছে কারও মোটর গাড়ি নিয়ে গেছে। এটাই তো সবচেয়ে বড় তথ্য। ঢাকা শহরের প্রতিটি কালো গাড়িকে সন্দেহ করতে শুরু করবে সে এখন থেকে। কালো গাড়ি দেখলেই গাড়ির ড্রাইভারকে লক্ষ্য করতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে কমলাপুর স্টেশনের কাছে চলে এল ডি.কস্টা। তখন সবেমাত্র সূর্য উঠেছে। রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়নি তখনও। ডি.কস্টা দেখল, একটা

কালো রঙয়ের গাড়ি এগিয়ে আসছে রাস্তা ধরে। ধড়াস করে উঠল বুকটা তার। যীশুর নাম স্মরণ করে ক্রস আঁকল তাড়াতাড়ি। গাড়িটা এসে পড়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। তড়াক করে লাফ দিল ডি.কস্টা। সর্বশরীরে প্রচণ্ড উত্তেজনা বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ল। রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল ডি. কস্টা, দু'হাত উদারভাবে দু'দিকে মেলে দিল। শরীরের লোম খাড়া হয়ে গেছে তার। হাজার হোক, কঙ্কাল মানুষ নয়; ভয় তো একটু-আধটু জাগবেই মনে।

ডি.কস্টা রাস্তার মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়াতেই গাড়ির ড্রাইভার ব্রেক কষে দাঁড় করাল গাড়ি। ডি. কস্টা সন্তুষ্ট হল। প্রাথমিক সাফল্যলাভ ঘটেছে তার, গাড়ি থামাতে বাধ্য হয়েছে অন্তত। এখন চালককে পরীক্ষা করতে হবে।

'কি ব্যাপার, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এভাবে বাধা দেয়ার কারণ কি, সাহেব?' গলা বাড়িয়ে বিরক্তির সঙ্গে জবাবদিহি চাইলেন গাড়ির মালিক।

সতর্ক ভঙ্গিতে দু'হাত আক্রমণ করার কায়দায় সামনে বাড়িয়ে দিয়ে পা পা করে এগিয়ে গেল ডি. কস্টা। কাছাকছি গিয়ে তীব্র চোখে দেখতে লাগল সে ভদ্রলোককে। একটু অপ্রতিভ বোধ করলেন ভদ্রলোক। ডি.কস্টা কঠিন কণ্ঠে হুকুম করল, সূর্যের ডিকে ফেস্ করে ঠাকুন, মিস্টার।'

ভদ্রলোক হতবাক হয়ে গেছেন। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে সূর্যের দিকে মুখ ফেরালেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খানিকক্ষণ দেখল ডি.কস্টা। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল, 'ডুট্টোরি ছাই, মিসটেক হয়ে গেল। ও-কে। আপ চলা যাইয়ে, মিস্টার।'

'মানে! এসবের মানে কি?'

ভদ্রলোক এবার রেগে গেলেন। ডি.কস্টা দেখল মহাবিপদ। গম্ভীর ভাব ফুটিয়ে তুলল সে হঠাৎ। বলে উঠল, 'সাবঢানের মার নেহি হ্যায়, মিস্টার। হামি কঙ্কাল ঢরার চেষ্টা করটেছি।'

কঙ্কাল শব্দটার উচ্চারণ শুনেই শুকিয়ে গেল ভদ্রলোকের মুখ। গাড়িটা একটু চালিয়ে রাস্তার একপাশে পার্ক করে রাখলেন তিনি। ডি. কস্টাকে বললেন, 'চা খাবেন?'

ডি.কস্টা এ কথায় রাজি হয়ে গেল। ভদ্রলোক স্টেশনের দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'আপনি বুঝি ছদ্মবেশী সি. আই. ডি.?'

ডি. কস্টা গম্ভীরভাবে বলল, 'সিক্রেট ব্যাপারে নাক গলানো উচিট নয়, মিস্টার।'

প্লাটফর্মে ঢুকে ভদ্রলোক বললেন, 'আমি উল্কায় আজ চিটাগাং যাব। টিকিট অ্যাডভান্স করতে এসেছি। আমার ট্রেন ক'টায় বলতে পারেন?'

হাঃ হাঃ করে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল হঠাৎ ডি. কস্টা। বলল, 'আপনার ট্রেন! ট্রেন আপনার হটে পারে না, মিস্টার। ট্রেন টো গভর্নমেন্টের!'

'না, ঠাট্টা নয়। কখন ট্রেন ধরার জন্যে আসতে হবে আমাকে, জানেন আপনি?'

ডি.কস্টা বলে উঠল, 'ঢরবেন কি করে, মিস্টার? ট্রেনটা যে খুব জোরে চলে!'

ভদ্রলোক থমকে গেলেন ডি.কস্টার ইয়ার্কি মারার স্পর্ধা দেখে। রক্তচক্ষু মেলে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বলে উঠলেন তিনি, 'এ যে বদ্ধ-পাগল দেখছি!'

কথাটা বলে ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না। ডি.কস্টাকে একা রেখেই দ্রুতপায়ে চলে গেলেন কাউন্টারের দিকে। ডি. কস্টা নিজের অপরাধ বুঝতে না পেরে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর গম্ভীর মুখ করে প্লাটফর্ম থেকে বের হয়ে রাস্তায় এসে হাঁটতে শুরু করল সে। অনেকক্ষণ ধরে কালো রঙের গাড়ির খোঁজে হন্যে হয়ে শহরের বড় বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটল ডি.কস্টা। কিন্তু কালো রঙের গাড়ি আর একটাও চোখে পড়ল না তার। রীতিমত খেপে গেছে সে। তার ধারণা, কঙ্কাল ব্যাটারা টের পেয়ে গেছে যে, শ্যানন ডি. কস্টা কঙ্কাল ধরার জন্যে প্রতিজ্ঞা করেছে। সেই ভয়েই রাস্তায় বের হচ্ছে না ওরা। হাঁটতে হাঁটতে একটা ডাক্তারখানা দেখতে পেল ডি. কস্টা। ডাক্তারখানায় বসা ডাক্তারকে দেখেই তার ডান পায়ের ব্যথাটার কথা মনে পড়ে গেল। কিছুদিন থেকেই ডান পা'টায় ব্যথা বোধ হচ্ছে। এর একটা চিকিৎসা দরকার। কঙ্কালকে ধরতে হলে দৌড়াদৌড়ি কম করতে হবে না। এই সুযোগে পা'টার ব্যারাম সারিয়ে নেয়া দরকার। ডাক্তারখানায় ঢুকে ডাক্তারকে পা দেখাল ডি. কস্টা। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে দেখলেন। কিন্তু কোন কারণই তিনি বুঝতে পারলেন না ব্যথার। অবশেষে মুখ তুলে মন্তব্য করলেন, 'আপনার ডান পায়ে আপনি যে ব্যথাটা অনুভব করছেন সেটা হয়েছে বয়সের দরুন, বার্ধক্যের জন্যে।'

ডি.কস্টা ভুরু কুঁচকে বলে উঠল, 'বয়সের ডরুন! কিয়া আজগুবি বাৎ বোল্‌তা হ্যায় ডাক্তার টোম? টুমি কিচ্ছু জান না। আমার ডান পায়ের বয়স বাঁ পায়েরই সমান মাগার, কই. বাঁ পায়ে তো কোন ব্যথা নেহি হ্যায়!'

মুখ-ভঙ্গির মাধ্যমে অনাস্থা প্রকাশ করে ডাক্তারকে বিমূঢ় করে দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল ডি. কস্টা। তার ধারণা হল, দুনিয়ায় সব মানুষ পাগল হয়ে যাচ্ছে।

বেলা এগারটা পর্যন্ত একটা দেশী মদের দোকানে কাটাল ডি. কস্টা। চারটে মাত্র টাকা ছিল পকেটে। দু'প্যাট বাংলা গিলেই সব টাকা শেষ। আধ-খিঁচড়ানো মন নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরছে ডি.কস্টা। একটু নেশার আমেজ অবশ্য রয়েছে এখনও। বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখল সে গাড়িটা। রাস্তা দিয়ে তীব্র গতিতে এগিয়ে আসছে গাড়িটা। কালো, চকচকে কালো গাড়ি!

কালো গাড়ি দেখেই চমকে উঠল ডি. কস্টা। কি করবে না করবে বোঝার আগেই গাড়িটা এসে পড়ল। তীব্র বেগে পাশ কাটিয়ে চলে গেল গাড়িটা। চালকের আসনে হ্যাট পরিহিত লোকটার মুখ দেখেই শিউরে উঠল তার সর্বশরীর।

কঙ্কাল! পরিষ্কার দেখেছে সে! লোকটার মুখের উপর রোদ পড়েছিল। মুখের হাড় সে পরিষ্কার দেখেছে। কাল-বিলম্ব না করে প্রাণপণে ছুটল সে গাড়ির দিকে। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে তার চোখজোড়া। কঙ্কাল দেখেছে সে! গাড়ির সামনেই! বস্‌কে জানানো দরকার!

চার

শহীদ ও কামাল বসে আছে গম্ভীরভাবে।

ওদের দু'জনকেই চিন্তিত দেখাচ্ছে।

চিন্তিত হবার কারণ অবশ্য ঘটেছে একটা। গতরাতে রহস্যজনক একটা চুরি সংঘটিত হয়েছে শহীদের ড্রইংরুমে। ড্রইংরুমের দরজা বন্ধই ছিল। জানালা গলে রুমে ঢুকেছিল চোর। টাকা-পয়সা, গহনা-গাটি কিছুই খোয়া যায়নি। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে যে চিঠিটা এসেছিল, সেটা ড্রইংরুমের আলমারিতে তালাবদ্ধ করে রেখেছিল শহীদ। আলমারির তালা ভেঙে চোর চুরি করে নিয়ে গেছে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে প্রাপ্ত চিঠির খামটা। চিন্তিত হয়ে পড়েছে শহীদ।

এদিকে সেদিন কামাল শহীদের নির্দেশ অনুযায়ী দেখা করতে গিয়েছিল চিত্র-প্রযোজক মি. সারওয়ার এবং মি. ওসমান গনির সাথে। ওঁরা দু'জনেই রহস্যময় ব্যবহার করেছেন কামালের সাথে। প্রথমে দেখাই করতে চাননি কেউ। কামাল নাছোড়বান্দা। অবশেষে ড্রইংরুমে বসবার অনুমতি পেয়েছিল ও। প্রথমে ও দেখা করতে গিয়েছিল মি. সারওয়ারের সাথে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখার পর ড্রইংরুমে এলেন মি. সারওয়ার। তিনি কামালকে ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু এমন ভাব দেখালেন যে, তিনি কামালকে চিনতেই পারেননি। কামাল স্মরণ করিয়ে দিল, উনি এবং মি. ওসমান গনি এরফান মল্লিককে খুঁজে বের করে দেবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কামালের কথা শুনে কথাটা অস্বীকার করতে পারলেন না মি. সারওয়ার। যাই হোক, কথা-বার্তার বেশিক্ষণ সময় দেননি মি.সারওয়ার। কামাল প্রশ্ন করেছিল, 'এরফান মল্লিকের কোন সন্ধান আপনারা পেয়েছেন?'

মি.সারওয়ার উত্তর দিলেন, 'না, আমরা আশা ছেড়ে দিয়েছি। শয়তানটাকে আর পাওয়া যাবে না বলেই বিশ্বাস আমাদের।'

কামাল বলেছিল, 'খোঁজ করলে পাওয়া যাবে না, তা নয়। আপনারা যদি এরফান মল্লিক সম্পর্কে আরও কিছু বিশদ তথ্য দিতে পারেন তাহলে আমরা নতুন করে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

মি.সারওয়ার বলেছিল, 'তথ্য দিয়ে আর কি হবে? তাকে পাওয়া যাবে না বলেই বিশ্বাস আমাদের। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ আপনারা ব্যাপারটা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন কেন, জানতে পারি কি?'

কামাল তখন শহীদের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে পাওয়া চিঠিটার কথা প্রকাশ করেছিল। ও বলেছিল, 'এরফান মল্লিককে নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি করছেন সোলায়মান চৌধুরী প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে। যাতে কোন হত্যাকাণ্ড ঘটতে না পারে সেজন্যে সাবধান হতে চাই আমরা।'

মি সারওয়ার উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'সে তো খুব ভাল কথা। এরফান মল্লিককে খুঁজে বের করতে পারলে তো ভালই কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, সে পাকিস্তানে হয়ত নেই-ই। আচ্ছা, আমি একটু ব্যস্ত আজ, আপনাদের অনুসন্ধান কাজ কতটুকু এগোল জানালে খুশি হব।'

কামাল বের হয়ে এসেছিল মি. সারওয়ারের বাড়ি থেকে। রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল ও। তারপর ও মি. ওসমান গনির বাড়িতে যায়। সেখানেও ঐ একই ব্যবহার। শহীদকে এসব কথা জানাতে আশ্চর্য হয়েছিল শহীদও। চিন্তিত হয়ে পড়েছিল দু'জনেই। পরিষ্কার বুঝতে পারছিল ওরা, যে ভদ্রলোকদ্বয়ের অস্বাভাবিক ব্যবহারের পিছনে রহস্যময় কোন একটা কারণ আছেই। কিন্তু কি সেই রহস্যময় কারণটা?

ধীরে ধীরে মুখ তুলে শহীদ বলল, 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে আমি যে একখানা চিঠি পেয়েছি, তা তুই আর আমি ছাড়া আর কেউ জানত না। আমি কাউকে বলিনি, তবে মি. সিম্পসনও ঐরকম একটা চিঠি পেয়েছেন সরকারীভাবে। কিন্তু তিনিও জানেন না যে, আমার কাছেও চিঠি এসেছে! তুই কেবল মি. সারওয়ার এবং মি. ওসমান গনিকে জানিয়েছিস। আর কাউকে জানিয়েছিলি কিনা মনে করে দেখ দেখি, কামাল?'

কামাল বলে উঠল, 'ওদেরকে ছাড়া আর কাউকেই চিঠির কথা বলিনি আমি। তুই যাই বলিস শহীদ, আমার সন্দেহ, চিঠিটা চুরি করেছেন ওঁরাই। নিজেরা না করে থাকলেও লোক দিয়ে করিয়েছেন।'

শহীদ বলল, 'কিন্তু কোন যুক্তিতে একথা বলছিস তুই? চিঠিটা কি কাজে আসবে ওদের, বল? একমাত্র সোলায়মান চৌধুরী বা তাঁর সঙ্গী দু'জন ছাড়া ঐ চিঠির ব্যাপারে আর কারও মাথা-ব্যথা থাকার কথা নয়। তুই তো সোলায়মান চৌধুরীর ফটো দেখেছিস, ওঁদের দু'জনার মধ্যে কেউই সোলায়মান চৌধুরী হতে পারেন না!'

কামাল শহীদের কথা মেনে নিতে পারল না। বলল, 'তাই বা জোর করে বলিস কি করে? হয়ত ওঁদের মধ্যেরই কোন একজন সোলায়মান চৌধুরী। আজকাল প্লাস্টিক সার্জারির ফলে মানুষের সম্পূর্ণ চেহারা বদলে দেয়া যাচ্ছে।'

শহীদ বলল, 'তোর কথা মেনে নিতাম যদি সোলায়মান চৌধুরী নিজে অপরাধী না হতেন। ওঁদের মধ্যে কেউ যদি সোলায়মান চৌধুরী হতেন তাহলে এরফান মল্লিককে খুঁজে দেবার জন্যে আমাদের কাছে আসতেন না।'

কামাল বলল, 'তাহলে চুরির ব্যাপারে তোর কি ধারণা?'

শহীদ চিন্তিতভাবে বলল, 'চুরির সাথে সোলায়মান চৌধুরীর পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ যোগ আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার। কিন্তু যোগাযোগটা কি ধরনের তাই বুঝে উঠছি না। তবে আমার বিশ্বাস, মি. সারওয়ার ও মি. ওসমান গনি এর সাথে জড়িত। কেননা চিঠিটার কথা ওঁরা ছাড়া আর কেউ জানত না।'

কামাল প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা শহীদ, সোলায়মান চৌধুরীর সাথে কঙ্কাল-রহস্যের কোন যোগাযোগ আছে বলে সন্দেহ হয় নাকি তোর?'

শহীদের আর উত্তর দেয়া হল না। রুমের ফোন বেজে উঠল কর্কশ স্বরে। কামাল উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল ফোনের দিকে। শহীদ মন্তব্য করল, 'দ্যাখ, রোজকার মত কঙ্কাল আবার কারও সর্বনাশ করে ভেগেছে কিনা। মি. সিম্পসনই হয়ত ফোন করেছেন।'

কামাল রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। অপরপ্রান্তের বক্তার বক্তব্য শুনতে শুনতে ছানাবড়া হয়ে গেল তার চোখজোড়া। একটু পর দ্রুত রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল ও, 'ঠিকই বলেছিস তুই, শহীদ। আবার কঙ্কাল! তবে এবারে রহস্যটা জটিল আকারে দেখা দিয়েছে। দু'জন প্রত্যক্ষদর্শী দেখেছে চিত্র-প্রযোজক আখতার চৌধুরীর বাড়িতে কঙ্কালকে প্রবেশ করতে। অথচ আখতার চৌধুরী অস্বীকার করেছেন কথাটা! মি. সিম্পসন যেতে বলে দিলেন আমাদেরকে।'

শহীদ বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'বলিস কি! যাঁর বাড়িতে কঙ্কাল ঢুকেছিল তিনিই অস্বীকার করেছেন!'

উঠে দাঁড়াল শহীদ। পোশাক পরেই ছিল ওরা। কথা বলতে বলতে দ্রুত বের হয়ে এল রুম থেকে। গ্যারেজের দিকে দ্রুত পায়ে এগোল দু'জন।

চিত্র-প্রযোজক আখতার চৌধুরীর বাড়ি মিরপুর রোডের পাশেই। বাড়িটার আশপাশের চতুর্দিকে ফাঁকা, কোন বাড়ি-ঘর কাছে-পিঠে নেই। বেশ খানিকটা দূরে দেখা যাচ্ছে অন্যান্য বাড়ি।

বাড়িটার সামনে কৌতূহলী, উত্তেজিত জনতার ভিড়। সহজেই চিনতে পারল শহীদ বাড়িটাকে ভিড় দেখে। রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল ও। কামালও নামল লাফ দিয়ে। ভিড় ঠেলে বাড়ির ভিতর ঢুকল ওরা। ভিড় যত বাইরে। বাড়ির ভিতরে পুলিস ঢুকতে দিচ্ছে না কাউকে। ইন্সপেক্টর শহীদ ও কামালকে দেখে এগিয়ে এল। কাছে এসে বিনীতভাবে জানাল, 'আসুন, স্যার, মি. সিম্পসন ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছেন আপনাদের জন্যে।'

ড্রইংরুমে প্রবেশ করল ওরা। মি. সিম্পসন ছাড়াও দু'জন হাই র‍্যাঙ্কের পুলিস অফিসার বসে আছেন দেখা গেল ড্রইং-রুমে। আর একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে

দেখল ওরা। শহীদ অনুমান করল, ইনিই আখতার চৌধুরী। লম্বা-চওড়া ফিগার ভদ্রলোকের। প্রশস্ত কপাল। উজ্জ্বল গায়ের রঙ। চোখ দুটো অদ্ভুত আকর্ষণীয়। শান্ত সুবোধ প্রকৃতির চেহারা। ভদ্রলোককে খানিকটা বিস্মিত দেখাচ্ছে।

মি.সিম্পসন শহীদকে দেখে বলে উঠলেন, 'এস, শহীদ, পরিচয় করিয়ে দিই তোমাদের সাথে মি. আখতার চৌধুরীর।'

শহীদ এগোতে এগোতে দেখল, রুমের এক দিকের টেবিলের ওপর বুক ফুলিয়ে বসে আছে ডি. কস্টা। শহীদের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছে সে।

আখতার চৌধুরীর সাথে করমর্দন করল শহীদ ও কামাল। মি. সিম্পসন আখতার চৌধুরীকে বললেন, 'শহীদ খান, প্রাইভেট ডিটেকটিভ এবং ওর সহকারী, কামাল আহমেদ।'

আখতার চৌধুরী শহীদের উদ্দেশে বলল, 'আমার সৌভাগ্য, আপনাদের মত গুণী ব্যক্তিদের সাথে পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটল। আপনারাই তো দেশের গৌরব, বহু বীরত্বের কথা শুনেছি আপনাদের। দয়া করে বসুন।'

শহীদ ও কামাল পাশাপাশি দুটো সোফায় বসল। আখতার চৌধুরী সিগারেট অফার করে বলে উঠলেন, 'একটু আগে পর্যন্ত ভাবছিলাম, দু'জন পথিকের ভুলে বাজে একটা ঝামেলায় পড়ে সময় নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এই ভিত্তিহীন ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়লে আপনাদের সাথে হয়ত পরিচয়ই হত না।'

শহীদ শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আপনি বাড়িয়ে বলছেন। আচ্ছা, ঘটনাটা কি আসলে, বলুন দেখি?'

আখতার চৌধুরীর সারা মুখে ফুটে উঠল রেখা। যার ফলে গম্ভীর দেখাল ভদ্রলোককে। তিনি শহীদের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন, 'ঘটনা আসলে কিছুই ঘটেনি, মি. শহীদ। আমি আজ বাড়িতেই ছুটি কাটাচ্ছি, বসে ছিলাম এই ড্রইংরুমেই। হঠাৎ শুনি, কে যেন আর্তনাদ করছে। বের হয়ে দেখি, ঐ লোকটা "কঙ্কাল কঙ্কাল" করে পাড়া মাত করছে শুধু শুধু।'

আখতার চৌধুরী হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর বসে-থাকা ডি. কস্টাকে দেখালেন। তারপর শুরু করলেন আবার, 'কাছে গিয়ে থামাবার চেষ্টা করলাম ওকে। কিন্তু কোনমতেই থামানো গেল না। ওর সাথে আরও একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, সে হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল বাড়ির সামনে। হাসপাতালে ফোন করতে চেয়েছিলাম আমি, কিন্তু একটু পরই জ্ঞান ফিরে এল লোকটার। ওরা দু'জন যা বলল তার সারমর্ম হচ্ছে, আমার বাড়ি থেকে একটা মানুষ-বেশী কঙ্কাল বের হয়ে একটা কালো গাড়িতে চড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অথচ এ সম্পর্কে বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানা নেই আমার। সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানেন, টেবিলের ওপর বসা ওই পাগলটার ধারণা, কঙ্কাল-রহস্যের হোতা নাকি আমিই। কঙ্কাল তৈরি করে আমিই

নাকি টাকা লুট করার ফন্দি এঁটেছি। পাগলটার কথায় আবার সায় দিচ্ছে অনেকে। এখন বুঝুন মজা। অনুরোধ করছি, এসব ঝামেলা থেকে মুক্ত করুন আপনারা আমাকে।'

আখতার চৌধুরীর কথা শেষ হতেই টেবিল উল্টে পড়ার ভীষণ একটা শব্দ হল। দেখা গেল, মেঝেতে ডিগবাজি খেয়ে ডি. কস্টা ঠিক আখতার চৌধুরীর সামনে উঠে দাঁড়িয়েছে। হাতে তার একটা ছুরি। ছুরি বাড়িয়ে সে আখতার চৌধুরীকে আক্রমণ করার জন্যে পজিশন নিতে নিতে বলে উঠল উত্তেজিত কণ্ঠে, 'টুমি ঢোঁকা ডেবার জায়গা নেহি পায়া? তুমি বেটা মার্ডারার! কঙ্কাল টোমার বাড়ি ঠেকে বের হয়ে ভেগে পড়ল আর টুমি কিনা···হামি নিজের চোখে ডেখলাম···!'

শহীদ উঠে দাঁড়িয়ে ডি. কস্টাকে ধরে টেনে আনল হিড়হিড় করে নিজের কাছে। জিজ্ঞেস করল, 'এই, আস্তে কথা বল। কি দেখেছ তুমি নিজের চোখে?'

ডি.কস্টা সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল শহীদের দিকে। তারপর বলল, 'আমার ফ্রেণ্ড কুয়াশা আমাকে সাভারে যেটে বলেছিল। টাই যাচ্ছিলাম হামি বাই সাইকেলে রাস্টা ডিয়ে। এই বাড়িটার সামনে এসে ডেখি, একটা ব্ল্যাক কার ডাঁড়িয়ে আছে। সন্দেহ হল আমার। কঙ্কালকে ঢরার জন্যে প্রটিজ্ঞা করেছি হামি। ভাবলাম,কঙ্কাল এই ব্ল্যাক কারে করে আসটে পারে। একটা গাছের আড়ালে পজিশন নিয়ে ডাঁড়িয়ে ঠাকলাম হামি। এর পরেই ডেখি, হ্যাট মাঠায় ডিয়ে কঙ্কাল বেরিয়ে আসছে ব্ল্যাক কারের ডিকে। হামার কঠামটো এই আখটার চৌটুরীকে অ্যারেস্ট না করলে ভুল করবে টুমি। কঙ্কাল এই কালপ্রিটেরই পোষা। এই কঙ্কালকে আজ সকালে হামি আর একবার ডেকেছিলাম। আমার ফ্রেণ্ডকে বললাম, ফ্রেণ্ড কঠাটা হেসে উড়িয়ে ডিলেন। উল্টো হামাকে আডেশ ডিলেন সাভারে যেটে। টাই যাচ্ছিলাম, হাজার হোক ফ্রেণ্ড টো।'

শহীদ বলল, 'তোমার সাথে আর কে ছিল যেন?'

ডি.কস্টা বলল, 'হামার সাথে আর কেউ ছিল না। টবে একজন পাবলিক ছিল রাস্তার উপর ডাঁড়িয়ে। সে টো ভয়েই সেন্স্‌লেস হয়ে গেল।'

শহীদ মি.সিম্পসনের দিকে চেয়ে বললেন, 'সে লোকটা কোথায়?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'সে বাড়ি চলে গেছে। তার জবানবন্দি লিখে নিয়েছি আমি। তার কথা হুবহু ডি. কস্টার মতই।'

শহীদ আখতার চৌধুরীর দিকে ফিরে বলল, 'এ ব্যাপারে নতুন করে আর কিছুই কি বলবার নেই আপনার?'

'আর কি বলবার থাকবে? এসব পাগলদের প্রলাপ শুনে বিরক্ত বোধ করছি আমি, মি. শহীদ!'

আখতার চৌধুরীর চেহারা থেকে নিরানন্দ ভাব দূর হয়ে ক্রোধ দেখা দিল। শহীদ জানতে চাইল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবেন না। আপনি

তো চিত্র-প্রযোজক মি. সারওয়ার এবং ওসমান গনিকে নিশ্চয় চেনেন?'

'নিশ্চয় চিনি! কেন বলুন তো?'

শহীদ বলল, 'না, এমনি। আচ্ছা, আপনার বাড়ির টাকা-পয়সা সব ঠিক আছে কিনা দেখেছেন? চুরি যায়নি তো কিছু?'

আখতার চৌধুরী বললেন, 'বাড়িতে আমার টাকা পয়সা তেমন থাকার কথাই নয়, চুরি হবে কোথা থেকে? হলেও দু'-দশ টাকা হতে পারে। কিন্তু কঙ্কাল সামান্য দু'-দশ টাকার জন্যে নিশ্চয় আসছে না।'

শহীদ বলল, 'তা ঠিক। আচ্ছা মি. আখতার, বাড়িতে আপনার আর কে কে আছেন?'

আখতার চৌধুরী বললেন, 'আমার বৃদ্ধ আম্মা আছেন, হসপিটালে। স্ত্রী কোলকাতায় ছেলেটার সাথে রয়ে গেছে। আমি এখানে আম্মার সাথে থাকি। আমার একমাত্র ছেলে, সে হিন্দুস্থান সরকারের প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টের বড় অফিসার। চাকরি ছেড়ে ওর পক্ষে ঢাকায় চলে আসা সম্ভব নয় বলে মাফ নিয়ে রয়ে গেছে ও।'

'আপনার চাকর-বাকর ক'জন?'

'তিন জন।'

মি.সিম্পসন বললেন, 'ওদের প্রত্যেকের জবানবন্দি নিয়েছি আমি। কেউ কিছু দেখেনি, বলেছে। কালো গাড়িও নয়, কঙ্কাল তো নয়-ই।'

শহীদ বলল, 'ওদেরকে একটু ডেকে দেবেন, দয়া করে আর একবার?'

আখতার চৌধুরী বললেন, 'আবার জেরা করার কি কোন দরকার আছে? আচ্ছা ডাকছি, আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে যান।'

শহীদ বলল, 'কর্তব্য পালন করছি আমরা, মি. আখতার।'

'নিশ্চয়, একশো বার। এই সলিমউদ্দিন। সলিমউদ্দিন··!'

আখতার চৌধুরী জোর গলায় ডাকলেন। প্রায় সাথে সাথেই ড্রইংরুমে ঢুকল একজন আধাবয়সী লোক লুঙ্গি পরে। শহীদ বলল, 'তোমার নাম সলিম?'

'জ্বি, হ্যাঁ।'

লোকটা রীতিমত ঘাবড়ে গেছে মনে হচ্ছে। একটু ভয়ও পেয়েছে যেন। শহীদ হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, 'বল তো সলিম, তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন?'

সলিমউদ্দিন ঢোক গিলে তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, না হুজুর, ভয় পাব কেন!'

ধমক দিয়ে উঠল শহীদ, 'মিথ্যা কথা বলছ। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, ভয় পেয়েছ তুমি! বল, কি দেখে ভয় পেয়েছ?'

সলিমউদ্দিন দিশেহারার মত হয়ে মনিব আখতার চৌধুরীর দিকে তাকাল। আখতার চৌধুরী অভয় দিয়ে বললেন, 'বল্, যা জিজ্ঞেস করছেন, উত্তর দে।'

সলিমউদ্দিন ভীত গলায় বলল, 'কঙ্কালের কথায় ভয় পেয়েছি আমি, হুজুর।'

শহীদ বলল, 'তাহলে কঙ্কাল তুমি দেখেছ?'

প্রবলভাবে আপত্তি প্রকাশ করে বলল, 'না! দেখিনি হুজুর, খোদার কসম বলছি! লোকে কঙ্কালের কথা বলছে শুনে ভয় পেয়েছি আমি।'

'কঙ্কাল তোমাদের বাড়িতে এল, আর তুমি দেখলে না! কোথায় ছিলে তুমি তখন?'

সলিম ঢোক গিলে উত্তর দিল, 'আমি, আমি তখন রান্নাঘরে ঝাড়ু দিচ্ছিলাম, হুজুর।'

শহীদ তীক্ষ্ণ চোখে সলিমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি যাও। আরও দু'জন লোক আছে, ওদেরকে ডেকে দাও।'

কিন্তু অন্য দু'জনকে কি একটা কারণে ভয়ানক ভীত দেখালেও কেউই সেই ভয়ের কারণটা প্রকাশ করল না। নানারকমভাবে জেরা করল শহীদ। কিন্তু কেউই স্বীকার করল না কঙ্কালের কথা। অগত্যা খুচরো কিছু আলাপ করে বিদায় নিল শহীদ, কামাল ও সহকারীসহ মি. সিম্পসন। ডি. কস্টাকে বাধ্য করা হল বিদায় নিতে। জনতাকে হটিয়ে দিল পুলিস।

শহীদ বাড়ি ফেরার পথে একটা কথাও বলল না। অসম্ভব গম্ভীর দেখাচ্ছে ওকে। কামাল শুধু জিজ্ঞেস করল চুপ থাকতে না পেরে, 'কি মনে হল তোর সব দেখে?'

শহীদ ওর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আনমনে প্রশ্ন করল, 'ডি. কস্টা সাইকেলে চড়েই মিরপুর রোড দিয়ে যাচ্ছিল সাভারে, কেন বল তো?'

'নিশ্চয়ই কুয়াশার কোন কাজে। আমার প্রশ্নের উত্তর দে, আখতার চৌধুরীকে কেমন মনে হল তোর? কঙ্কালের সাথে কোন সম্পর্ক ওর আছে বলে মনে হয়?'

শহীদ গাড়ি চালাতে চালাতে কামালের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল একবার। তারপর চিন্তিতভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পরে বলল, 'অত সহজ নয়, কামাল। কঙ্কাল-রহস্য সত্যি রহস্যময়, তার সাথে যোগ হয়েছে অন্যান্য জটিলতা। তার সামনে আরও পেঁচালো রহস্যের সৃষ্টি হতে পারে। মনে রাখিস, বুদ্ধি খাটিয়ে সব রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করতে হবে।'

কামাল বলল, 'এসব হেঁয়ালি কথার মানে কি তোর?'

শহীদ বলল, 'হেঁয়ালি! আমার মন বলছে কিছু একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। আমাদেরকে সাবধান হতে হবে কামাল।'

পাঁচ

সেই দিনই একটা ঘটনা ঘটল। শহীদ বাড়ি ফিরছিল বাইরে থেকে। বাড়ির ভিতরে গাড়ি ঢোকবার সময় ও দেখল, একজন লোক লুঙ্গি পরে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে। গাড়ি দাঁড় করিয়ে লোকটার আপাদ-মস্তক পরখ

করল শহীদ। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল ও। লোকটার মধ্যে কোনরকম ভাবান্তর দেখা গেল না। বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল সে শহীদের দিকে তাকিয়ে।

'কি চাই?' জিজ্ঞেস করতে হল শহীদকে।

লোকটা গ্রাম থেকে এসেছে, অনুমান করল ও। হাঁটুর কাছে লুঙ্গি, ময়লা পাঞ্জাবী পরনে, মাথায় কাপড়ের টুপি। লোকটা সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে নিচু গলায় বলল, 'সাব, গফুর নামে কেউ কাম করে এই বাড়িৎ?'

'হ্যাঁ, করে। কি দরকার তোমার?'

লোকটা জবাব দিল, 'হে আমারে কামের কতা কইছিল। আমি কাম-টাম করবার চাই। আমারে আইবার কইছিল গফুর মিয়া, আইজই।'

শহীদ একটু অবাক হল। কাজের মানুষের জন্যে গফুর আসতে বলেছিল নাকি? হবেও বা, ভাবল শহীদ, মহুয়া হয়ত গফুরকে কাজের লোকের কথা বলেছে। লোকটার দিকে তাকিয়ে শহীদ বলল, 'ঠিক আছে, তুমি এখানেই দাঁড়াও, গফুরকে ডেকে দিচ্ছি আমি।'

গাড়ি গ্যারেজে রেখে বাড়িতে ঢুকল শহীদ। ড্রইংরুমে মহুয়া কামাল বসে ছিল। শহীদকে দেখেই জিজ্ঞেস করল কামাল, 'কোথায় গিয়েছিলি তুই? কঙ্কাল ধরতে?'

শহীদ উত্তর না দিয়ে মহুয়াকে বলল, 'গফুরকে পাঠিয়ে দাও তো মহুয়া, কে যেন ডাকছে ওকে।'

মহুয়া চলে গেল। শহীদ কামালকে বলল, 'বেরিয়েছিলাম আজ এক কাজে। ঢাকা শহরের প্রায় সব গুণ্ডা-সর্দারের সাথে আলাপ করে এলাম। হেস্টিংস ও ববকে তারা চেনে না বলল। ঢাকা শহরে ইংরেজ গুণ্ডা মাত্র পাঁচজন। তাদের সকলকেই দেখলাম। কিন্তু হেস্টিংস আর ববের সন্ধান পাওয়া গেল না।'

কামাল বলল, 'তোর আগের কথাই ঠিক। সোলায়মান চৌধুরী অতি সাবধানী লোক। হেস্টিংস ও ববকে সবরকম ভাবে লোক-চক্ষুর আড়ালে রেখেছেন। তাঁর নিজের উদ্দেশ্য সাধিত না হওয়া পর্যন্ত কোনরকম রিস্ক নিতে রাজি নন তিনি।'

শহীদ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু গফুর রুমে ঢুকতেই মুখ তুলে তাকাল ও। গফুরের হাতে একটা খাম। শহীদ খামটা দেখে অবাক হয়ে বলল, 'তোর হাতে খাম এল কোত্থেকে? কাকে যেন কাজের জন্যে আসতে বলে দিয়েছিলি, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম, দেখা করেছিস?'

গফুর রীতিমত অবাক হয়ে তাকাল শহীদের দিকে। বিস্মিত ভাবটা দূর করে বলে উঠল সে, 'আমি তো কাউকে কাজের জন্যে আসতে বলিনি, দাদামণি! দিদিমণি আমাকে বলল, তোকে একজন লোক ডাকছে। আমি গিয়ে দেখলাম, একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে গেটের সামনে। আমি যেতেই এই খামটা দিয়ে

বলল—তোমার সাহেবকে এই খামটা দিয়ে দাও গিয়ে। আমি রংপুরের এক মসজিদের চাঁদা নিতে এসেছি। এই খামের ভিতরে চিঠি লিখে দিয়েছেন আমাদের ইমাম সাহেব, তোমার সাহেব সেটা পড়ে যা হোক কিছু দান করবেন।'

গফুরের কথা শেষ হওয়ামাত্র তড়াক করে লাফ দিয়ে বের হয়ে গেল কামাল রুম থেকে। শহীদ গফুরের হাত থেকে খামটা দ্রুত হাতে নিয়ে খুলে ফেলল । খামের ভিতরে একটা চিঠি। চিঠিটা বাংলা টাইপরাইটারে লেখা। শহীদের নামেই লেখা। বিস্মিত হয়ে পড়তে শুরু করল শহীদ চিঠিটাঃ

শখের ডিটেকটিভ শহীদ খান,

তুমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে একটা চিঠি পেয়েছ তা আমরা জেনেছি। চিঠিটায় সোলায়মান চৌধুরী, হেস্টিংস এবং ববের সন্ধান করার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে তোমাকে। এই চিঠির আর একটা কপি পৌঁছেছে স্পেশাল ব্যাঞ্চের পুলিস অফিসার মি সিম্পসনের কাছে। কিন্তু মি. সিম্পসনের ব্যাপারে কোন দুশ্চিন্তা আমরা করছি না। দুশ্চিন্তা আমরা কারও সম্পর্কেই করতে চাই না। তোমার মত শখের ডিটেকটিভ সম্পর্কে তো নয়ই। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে তোমাকে অনুরোধ করা হয়েছে তুমি সে অনুরোধ রক্ষা না করলেও পারবে। কিন্তু আমরা তোমাকে কোন অনুরোধ করব না। আমরা তোমাকে আদেশ করব! সেই আদেশ পালন না করলে রক্ষা পাবে না। তুমি সোলায়মান চৌধুরী, হেস্টিংস আর ববকে খোঁজার জন্যে কোনরকম সক্রিয়তা দেখাতে পারবে না, এই আমাদের আদেশ। আমাদেরকে খোঁজার কোনরকম চেষ্টা করলে তোমার এবং তোমার পরিবারের সর্বনাশ করব। আমাদের কথার গুরুত্ব দিয়ো, এটা আমাদের উপদেশ। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করবই। তাতে কারও মাথা ঘামাবার দরকার নেই। কেউ যদি মাথা ঘামায়, তাহলে তার মাথা গলা থেকে আলাদা করে দেব আমরা।

আশা করি, তুমি আমাদের উপদেশ গ্রহণ করবে। মনে রেখ, আমরা মার্ডারার। দু'-দশটা খুন করা আমাদের কাছে দু'-দশটা পিঁপড়েকে টিপে মারার মতই। সুতরাং শখের গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে তোমার এবং তোমার পরিবারের সর্বনাশ ডেকে এন না। তোমাকে একবার সাবধান করে দেয়া উচিত বলে মনে করেই লিখছি এই চিঠিটা।

ইতি—

সোলায়মান চৌধুরী।

কামাল কখন যেন রুমে এসে ঢুকেছে আবার। শহীদ মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতে

ও বলে উঠল, 'বাড়ির আশপাশে কাউকে দেখতে পেলাম না, শহীদ।'

শহীদ বলল, 'না পাবারই কথা। চিঠিটা পড়ে দেখ, সব বুঝতে পারবি।'

চিঠিটা নিয়ে পড়তে শুরু করল কামাল। দেখতে দেখতে থমথমে হয়ে উঠল ওর মুখের চেহারাঃ চিঠিটা পড়ে ফেরত দিল ও শহীদকে। উত্তেজিত গলায় বলল, 'হুম! তা কি করতে চাস তুই এব্যাপারে?'

শহীদ কি যেন এক গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল। কামালের প্রশ্ন শুনে বলল, 'কি যেন বললি?'

কামাল পুনরাবৃত্তি করল ওর প্রশ্নটা। শহীদ বলল, 'শয়তানটা শুধু আমার সর্বনাশ করবে না, আমার পরিবারেরও সর্বনাশ করবে বলেছে। ভাবছি আব্বা, মহুয়া, লীনা আর গফুরের কথা। আমার কারণে ওদের কারও কোন ক্ষতি হলে…।'

কামাল বলে উঠল, 'ঠিক বলেছিস তুই, শহীদ। এত বড় রিস্ক না নেয়াই ভাল।'

শহীদ একটু হেসে বলে উঠল, 'নারে, পিছপা হবার কথা ভাবছি না আমি। বাড়ির সকলকে সাবধান করে দিতে হবে। আমি সত্যানুসন্ধানকে শখ হিসেবে গ্রহণ করেছি বটে, কিন্তু নীতি-পালন বা নীতি-রক্ষাটা আমার কাছে শখের ব্যাপার ছিল না কোনদিনই। আমি বসে থাকব না। আজ থেকেই পুরোদমে কাজ শুরু করে দিতে হবে, যদিও কোন তথ্যই নেই আমাদের সামনে। সন্দেহ করার মত কাউকেই দেখছি না।'

কামাল, 'কিন্তু…।'

'কোন কিন্তু নেই। একটা কথা ভুলে যাসনে কামাল, সোলায়মান চৌধুরী এরফান মল্লিককে হত্যা করবেন বলেই এদেশে এসেছেন। হতে পারে এরফান মল্লিক অপরাধী। কিন্তু তাকে সাজা দেবার ভার সোলায়মান চৌধুরীর ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। আইন আইনই। তার প্রয়োগও হতে হবে আইনানুগভাবে।'

কামাল বলল, 'চিঠিটায় কিন্তু কঙ্কালের কোন উল্লেখ নেই।'

'কিন্তু আশ্চর্য হইনি আমি। কেননা কঙ্কাল-রহস্যের সাথে সোলায়মান চৌধুরী জড়িত আছেন, একথা প্রকাশ পেলে আমরা তার সাবধান বাণী অগ্রাহ্য করে দেশ তোলপাড় করে দিতে পারি। আবার তিনি যদি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকেন তাহলেও তো কঙ্কালের নাম উল্লেখ না করারই কথা। দু'দিক দিয়েই উল্লেখ না করার কারণ আছে।'

কামাল জিজ্ঞেস করল, 'তোর কি ধারণা?'

'এখুনি কোন ধারণা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কঙ্কালের মাধ্যমে যে প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ধন-সম্পদ লুট করছে, তাঁকে হয়ত চেষ্টা করলে চিনে নিতে পারব আমরা। আবার বলা যায় না, হয়ত কোন দিনই চিনতে পারব না। মোট কথা, কঙ্কাল-রহস্য ভেদ করা যেমন পানির মত সহজ তেমনি সাধনা করে অমরত্ব

লাভের মতই কঠিন।

ছয়

পরদিন মি. সিম্পসনের সাথে আলাপ সেরে বেলা দশটায় তাঁর অফিস থেকে বের হয়ে এল শহীদ ও কামাল। মি. সিম্পসনের সাথে সোলায়মান চৌধুরী, হেস্টিংস এবং বব সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। চিঠি চুরির কথাও জানিয়েছে শহীদ। কঙ্কাল-রহস্য নিয়েই পাগল নিরাপত্তা বিভাগ। তার উপর এ আবার কি ভয়ানক দুশ্চিন্তা? অনেক ভেবে-চিন্তে মি. সিম্পসন শহীদকে উপদেশ দিয়েছেন, ও যেন সোলায়মান চৌধুরীর সন্ধান করার চেষ্টা না করে। তা না হলে সমূহ বিপদ ঘটবে। কিন্তু শহীদ রাজি হয়নি। মি. সিম্পসনও জানেন, শহীদ যা একবার করবে ভেবেছে তা না করে ছাড়বে না। রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন তিনি। শহীদের বাড়িতে পুলিস-প্রহরার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেছিলেন। শহীদ বলেছে, দরকার নেই।

মি. সিম্পসনের অফিস থেকে বের হয়ে গাড়িতে চড়ে বসল শহীদ ও কামাল। গাড়ি ছুটল। জিন্নাহ্ অ্যাভিনিউ ধরে এগোচ্ছে, গাড়ি এবার মোড় নেবে জি. পি. ও.-র দিকে। হঠাৎ চমকে উঠল শহীদ। আউটার স্টেডিয়ামের ভিতর থেকে একটা কালো মরিস দ্রুতবেগে বের হয়ে সোজা ছুটে চলল। ড্রাইভিং সিটে হ্যাট পরিহিত এবং রঙিন সান-গ্লাস চোখে একজন মানুষ। গাড়িতে আর কেউ নেই।

কামালও লক্ষ্য করেছিল গাড়িটাকে। মোড় নিতে নিতে গাড়িটার বেগ হঠাৎ বাড়িয়ে দিল শহীদ। কামাল উত্তেজিত কণ্ঠে মন্তব্য করল, 'সন্দেহজনক।'

সোজা হাই কোর্টের দিকে ছুটে যাচ্ছে কালো মরিস। নিজেদের গাড়ির বেগ পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ, চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশে বাড়িয়ে দিল শহীদ। অথচ দুটো গাড়ির মধ্যে শ'খানেক গজের দূরত্ব রয়েই গেল। কামাল মন্তব্য করল, 'মরিসের স্পীডও বাড়ছে, শহীদ! নিশ্চয় কঙ্কাল!'

দেখতে দেখতে হাইকোর্ট ছাড়িয়ে রেসকোর্সের দিকে মোড় নিল মরিস। পিছু ছাড়ল না শহীদ। গতি বাড়িয়ে পঞ্চাশ করল ও। শহরের ভিতরে এই স্পীডে গাড়ি চালানো বিপজ্জনক। কিন্তু তবু দূরত্ব কমছে না। মরিসের চালক নির্বিকারভাবে বসে রয়েছে ড্রাইভিং সিটে। ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাচ্ছে না সে পিছন দিকে একবারও। কোন নড়াচড়াও নেই।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে রিভলভারটা বের করল শহীদ। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে সম্মুখবর্তী মরিসটার দিকে। মাঝে মাঝে স্পীড-মিটারের কাঁটার দিকে তাকাচ্ছে ও।

শাহবাগ ছাড়িয়ে ফার্মগেটের দিকে পালাচ্ছে মরিসটা। লাল সিগন্যাল

দু'জায়গায় অগ্রাহ্য করেছে ইতিমধ্যে। শহীদও পিছু ছাড়েনি। মাঝে মাঝেই হর্ন বাজাচ্ছে ও। রাস্তার অন্যান্য যানবাহনকে সাবধান করে দিতে হচ্ছে। যে-কোন মুহূর্তে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে।

ফার্মগেটে পৌঁছে মিরপুর রোডের দিকে মোড় নিল মরিসটা। দূরত্ব এখনও সমানই। শহীদের ফোক্সওয়াগেনের স্পীড পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। বিকট শব্দে মোড় নিয়ে মিরপুর রোডে পৌঁছে গেল কালো মরিস। কয়েক সেকেণ্ড পর মোড় নেবার পালা ফোক্সওয়াগেনের। হর্নের বোতাম টিপে ধরেছিল শহীদ আগেই। রাস্তার দু'ধারের যানবাহন দাঁড়িয়ে পড়েছিল বিপদ বুঝতে পেরে। কিন্তু একটা বেবী-ট্যাক্সির ড্রাইভার ব্যাপারটা খেয়াল করতে পারেনি যথাসময়ে। ফোক্সওয়াগেনের প্রায় সামনে পড়ে গেল ট্যাক্সিটা। মোড় নিচ্ছে শহীদ তখন। প্রাণপণে দুর্ঘটনা এড়াবার চেষ্টা করল ও। কিন্তু আংশিক দুর্ঘটনা ঘটলই। বেবীর সামনের চাকার সাথে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল ফোক্সওয়াগেনের চাকার। বেবীর চাকাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ছিটকে পড়ল তীরবেগে। ট্যাক্সিটার বাকি অংশও উল্টে পড়ল। মোড় নিয়ে ব্রেক কষল না শহীদ। গতি বাড়িয়ে দিল আরও। কালো মরিসটা দেড়শো গজ দূরত্ব বজায় রেখে আগে আগে ছুটছে সাভারের দিকে। কামাল পিছন দিকে তাকাল। বলে উঠল, 'বেবীতে ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ ছিল না। সামান্য আহত হয়েছে।'

মিরপুর লোহার পুল ছাড়িয়ে সাভার রোডে পৌঁছুল ওরা। নির্জন রাস্তা পাওয়া গেল এতক্ষণে। মাঝে মধ্যে দু'একটা বাস বা লরি সামনে থেকে আসছে। হর্ন বাজিয়ে সাবধান করে দিচ্ছে শহীদ। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে পড়ছে সেগুলো। ফোক্সওয়াগেনের স্পীড এখন ষাটেরও উপরে।

দূরত্ব কমছে এবার।

শহীদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যাচ্ছে। প্রচণ্ড বাতাসের শব্দে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে না, অথচ উত্তেজনায় জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে ওরা। গাড়িটা এখন আর ছুটছে না যেন, রাস্তার উপর থেকে উঠে তীব্র বেগে উড়ে চলেছে যেন। রাস্তার দু'পাশে নিচু জলাভূমি। মাঝে মাঝেই পুল অতিক্রম করছে ওরা। একটু এদিক-ওদিক হলেই গাড়ি নিয়ে গড়িয়ে পড়বে ওরা। পড়লেই নিশ্চিত মৃত্যু।

দুটো গাড়ির দূরত্ব এখন আরও কমে গেছে। পনের-বিশ গজের বেশি হবে না দূরত্বটা। রিভলভারটা তুলে নিল এবার শহীদ কোলের উপর থেকে। জানালার বাইরে রিভলভার ধরা হাতটা বের করে দিল ও। কামাল বলে উঠল চিৎকার করে, 'গুলি করলে জীবিত ধরা যাবে না লোকটাকে, শহীদ!'

উত্তর দিল না শহীদ। ট্রিগার টিপল ও রিভলভারের। মরিসের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। ভয় দেখাবার জন্যে ইচ্ছা করেই ফাঁকা আওয়াজ

করেছে শহীদ।

সামনে একটা পুল দেখা যাচ্ছে। বড় পুল। পুলের ওপারে রাস্তার দু'পাশের জমি সমতল। পুলটা অতিক্রম করার সময় এই প্রথমবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কালো মরিসের ড্রাইভার। সূর্যের আলো লোকটার গালে পড়াতে চমকে উঠল শহীদ ও কামাল। পরিষ্কার দেখা গেল লোকটার গালে স্বচ্ছ মোমের আড়ালে হাড়। মোমাবৃত কঙ্কাল!

পুলটা অতিক্রম করল কালো মরিস। মোমাবৃত কঙ্কাল আবার পিছন ফিরে তাকাল। ফোক্সওয়াগেন অতিক্রম করল পুল। ঢালু রাস্তা দিয়ে বিদ্যুৎবেগে নেমে যাচ্ছে শহীদের গাড়ি। আবার পিছন ফিরে তাকাল কালো মরিসের মোমাবৃত কঙ্কাল। শহীদ ও কামাল দু'জনেই সজাগ হয়ে উঠেছে। বারবার তাকাচ্ছে কেন কঙ্কালটা? কি উদ্দেশ্য ওর মনে? শিউরে উঠল ওরা দু'জনই। অজানা আশঙ্কায় দুলতে লাগল বুক।

ঠিক এমন সময়ই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা ঘটল!

কালো মরিসের মোমাবৃত কঙ্কালের ডান হাতটা নড়ে উঠল একটু। দৃষ্টি এড়াল না শহীদের। পলকের মধ্যে কল্পনাতীত বিপদের সম্মুখীন হল ওরা। আচমকা কালো মরিসের নিচে থেকে হাজার হাজার ক্ষুদ্রাকৃতি আয়রন-বল ছড়িয়ে পড়ল রাস্তার উপর। ছেলেপেলেদের গোল গোল মারবেলের মত আয়রন-বল হাজার হাজার পড়তে লাগল মরিসের নিচ থেকে। ভয়ঙ্করভাবে নেচে উঠল শহীদের ফোক্সওয়াগেন। পলকের মধ্যে রাস্তার একপাশে চলে গেল গাড়ি, পরক্ষণে শহীদের প্রাণপণ চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে মাঝ রাস্তার উপর দিয়ে রাস্তার অপর ধারের দিকে গোঁয়ারের মত লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গেল। প্রাণপণ চেষ্টায় গাড়ি সামলাবার চেষ্টা করছে শহীদ। কিন্তু গাড়ির নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ওর সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। রাস্তা থেকে মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়ল গাড়ি তীব্র বেগে। সামনেই একটা পাড়হীন পুকুর। চিৎকার করে উঠল শহীদ ও কামাল।

কামালকে সতর্ক করে দিয়েই দরজা খুলে ঝাঁপ দিল শহীদ ছুটন্ত গাড়ি থেকে।

মোমাবৃত কঙ্কাল ইতিমধ্যে কালো মরিস নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে কে জানে!

সাত

পরদিনের ঘটনা।

অন্ধকার থাকতেই রোজকার মত শালটা গায়ে জড়িয়ে প্রাতঃভ্রমণে বের হয়ে পড়ল শহীদ।

প্রতিদিন বড় রাস্তা ধরে লেক পর্যন্ত যায় শহীদ। লেকের পাড় ধরে আধঘন্টার

মত বেড়িয়ে আবার বড় রাস্তা ধরে বাড়ির দিকে ফিরতি হাঁটা ধরে। তখনও লোক চলাচল শুরু হয় না রাস্তায়। এক-আধটা যানবাহনের দেখাও পওয়া যায় না।

লেকের পাড়ে বসে খানিক হাওয়া খেল শহীদ আজ। গভীর চিন্তায় ডুবে রইল লেকের স্বচ্ছ পানির দিকে তাকিয়ে। নির্দিষ্ট আধঘন্টার আগেই ও আজ উঠে পড়ল। বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল ও ধীর পদক্ষেপে। রাস্তায় লোক নেই একজনও। সবেমাত্র দিনের আলোর আভাস দেখা দিচ্ছে। শীতের প্রভাত। হালকা কুয়াশা দূর হয়নি এখনও। সূর্য উঠতে এখনও দেরি অনেক। নিত্য যারা ভোরের হাওয়া খেতে বের হয় তারা এখনও বিছানা ছাড়েনি। শহীদই একমাত্র মুক্ত-বায়ুসেবী, সে সকলের আগে বের হয় এবং সকলের আগে ফেরে।

একমনে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে এগোচ্ছিল শহীদ। চিন্তিত দেখাচ্ছিল ওকে। হঠাৎ কি যেন হল ওর মনের ভেতর। ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল। এলোমেলোভাবে আরও কয়েক পা হেঁটে কি মনে করে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। ঘাড় ফিরিয়ে বিস্মিতভাবে তাকাল পিছন দিকে। নির্জন শিশির-ভেজা, বহুদূর প্রসারিত কংক্রিটের রাস্তা দেখা যাচ্ছে। কেউ নেই কোথাও। রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলো কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি বাড়িকেই মনে হচ্ছে ভূতুড়ে-বাড়ি। সাড়া নেই, শব্দ নেই।

থমকে দাঁড়িয়েই রইল শহীদ। কেন যেন বিচলিত হয়ে উঠেছে ও। ওর মনে হচ্ছে, কোথাও কিছু যেন একটা ঘটছে। কান পেতে রইল ও। বিচলিত ভাবটা বেড়ে গেল ওর। বহুদূর লম্বিত রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েই রইল ও। সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে মনে। আশঙ্কায় ভরে উঠছে বুক। বহুদূরে কে যেন আর্তনাদ করছে। ভাল করে শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু ক্রমশই অতি অস্পষ্ট আর্ত-চিৎকারটা জোরালো হয়ে উঠছে।

এক মুহূর্ত পরই শহীদের সন্দেহ সত্য বলে প্রমাণিত হল। কুয়াশার ধোঁয়াটে অস্পষ্টতা ভেদ করে একজন লুঙ্গি আর শার্ট পরিহিত লোককে প্রাণপণে ছুটে আসতে দেখল শহীদ। লোকটা বড় রাস্তার মাঝখান দিয়ে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে আসছে। বহুদূরে বলে শহীদ শুনতে পেল না লোকটা চিৎকার করে কি বোঝাতে চাইছে।

পরমুহূর্তে চমকে উঠল শহীদ। কুয়াশা ভেদ করে আরও একজন লোক বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসছে। দ্বিতীয় লোকটার পরনে প্যান্ট এবং লাল শার্ট। লোকটার গায়ের চামড়া অস্বাভাবিক ফর্সা। লোকটা সম্ভবত ইংরেজ। সাথে সাথে শহীদের মনে পড়ে গেল হেস্টিংস আর ববের কথা।

কিন্তু দেশী লোকটাকে তাড়া করে আসছে কেন লাল শার্ট পরিহিত বিদেশীটা? এই মুহূর্তে শহীদের করণীয় কিছু নেই। বহুদূরে ওরা। শহীদ ছুটে গেলে কি ঘটে যায় কে জানে। তাছাড়া কি কারণে একজনকে তাড়া করে ছুটছে অন্যজন কে জানে। পাগল-টাগলও হতে পারে।

কিন্তু পাগল নয়। পর মুহূর্তে নিজের ভুল বুঝতে পারল শহীদ। ইংরেজ লোকটা পিছন থেকেই লুঙ্গি পরিহিত লোকটার পিঠ লক্ষ্য করে কি যেন ছুড়ে মারল বিদ্যুৎগতিতে। বিকট আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ল লোকটা রাস্তার উপর। খানিকটা গড়িয়ে গেল লোকটার আহত দেহটা। চোখের পলকে ঘটে গেল আশ্চর্যজনক ঘটনা।

ইংরেজটা ঘুরে দাঁড়িয়েই প্রাণপণে দৌড়ে পালাতে শুরু করেছে। শহীদ গায়ের শালটা রাস্তার উপর ফেলে দিয়ে ছুটল আহত লোকটার দিকে।

পরমুহূর্তে শহীদ দেখল, রাস্তার পার্শ্ববর্তী আড়াল থেকে হঠাৎ একজন রোগা লোক ছুটে এসে আহত লোকটার সামনে বসে পড়ল। আহত লোকটাকে দেখল সে ঝুঁকে পড়ে। তারপর ঝট্ করে মুখ তুলে শহীদকে দেখে নিল। শহীদ তখনও বেশ অনেক দূরে। রোগা লোকটা আহত লোকটার পকেট হাতড়াতে শুরু করল। পকেট থেকে কি যেন একটা বের করল সে। জিনিসটা একবার দেখেই মুঠোর ভিতরে পুরে তড়াক করে লাফ দিয়ে ছুটতে শুরু করল। সরু বাঁশের মত দুটো পা নিয়ে রোগা লোকটা এঁকেবেঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল একটা গলির ভিতরে। ডি. কস্টাকে চিনতে পারল শহীদ।

শহীদ আহত লোকটার কাছে এসে দাঁড়াল হাঁপাতে হাঁপাতে। নিঃসাড় হয়ে গেছে লোকটার দেহ। পিঠে বিদ্ধ একটা ছোরা। কয়েক ইঞ্চি ঢুকে গেছে মাংসের ভিতরে। ঝুঁকে পড়ল শহীদ। না, লোকটা এখনও মারা যায়নি। রক্তে ভেসে যাচ্ছে রাস্তা! রুমাল বের করে ক্ষতস্থান চেপে রক্ত বন্ধ করার ব্যর্থ প্রয়াস পেল শহীদ। বিচলিত অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকাল ও সাহায্যের জন্যে। জ্ঞান হারিয়েছে লোকটা। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এখুনি।

অনেকক্ষণ ধরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে শহীদ হাসপাতালের করিডরে। আহত লোকটাকে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তারেরা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন লোকটার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্যে। শহীদকে অপারেশন রুমে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তবে জ্ঞান ফেরা মাত্রই ওকে জানানো হবে, সেই দুরাশা বুকে নিয়েই অস্থিরভাবে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে ও।

রাস্তা থেকে জ্ঞানহীন লোকটাকে হাসপাতালে নিয়ে আসতে ঝামেলার চূড়ান্ত ভোগ করতে হয়েছে শহীদকে। শীতের দিন, ভোর হতে তখনও অনেকটা দেরি ছিল। আশপাশের কোন বাড়ির দরজাই খোলেনি। সাহায্যের জন্যে কয়েকটা বাড়ির দ্বারস্থ হয়েছিল ও। একটিমাত্র বাড়ির মালিক চোখে ঘুমের রেশ নিয়ে দরজা খুলেছিল। শহীদের অনুরোধ এড়াতে পারেনি ভদ্রলোক। নিজের গাড়িতে করে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেছে। ভদ্রলোককে বারবার ধন্যবাদ জানিয়েছে শহীদ।

আহত লোকটাকে ডাক্তারের হাতে ছেড়ে দিয়েই মি. সিম্পসনকে ফোন করেছে ও। মি. সিম্পসন আসবেন বলেছেন। অথচ আধঘন্টা হয়ে গেল এখনও তাঁর দেখা নেই।

কিন্তু মি. সিম্পসনের কথা ভাবছিল না শহীদ। আহত লোকটার পরিচয় জানার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে ও। একটিবার যদি জ্ঞান ফিরে আসে তাহলে অনেক কথা জানা যাবে। কেন এই শেষরাতে অমন করে তাড়া করে আসছিল লাল শার্ট পরা ইংরেজটা? কেন?

অপারেশন রূমের দিকে এগিয়ে গেল আবার শহীদ। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সেটা খুলে গেল। হতাশ মুখে নার্স এবং পিছনে ডাক্তার বের হয়ে এলেন। শহীদের দিকে চেয়ে ডাক্তার বলে উঠলেন, 'আমি খুবই দুঃখিত, মি. শহীদ। লোকটা মারা গেছে।'

'কি খবর, শহীদ?'

'মি. সিম্পসনের গলা শোনা গেল করিডরে। শহীদের কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি ব্যস্তসমস্তভাবে। শহীদ সংক্ষেপে সব ঘটনা বলল মি. সিম্পসনকে। মনোযোগ দিয়ে শুনলেন তিনি। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকটার পরিচয় জানা যায়নি তাহলে? তোমার কি মনে হয়, আততায়ী ইংরেজটা সোলায়মান চৌধুরীর সঙ্গী হেস্টিংস বা ববের মধ্যে কোন একজন?'

শহীদ মি. সিম্পসনের কথার উত্তর না দিয়ে নার্সের দিকে ফিরে বলল, 'লাশ অপারেশন টেবিলেই আছে না?'

নার্স মাথা নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ।'

শহীদ ও মি. সিম্পসন অপারেশন রূমে ঢুকলেন। মি. সিম্পসন নিহত লোকটার উপর ঝুঁকে পড়ে চেহারাটা দেখতে লাগলেন ভাল করে। শহীদ নিহত লোকটার গা থেকে খুলে রাখা শার্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে ইতিমধ্যে। মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'লোকটাকে নিরীহ গোছেরই তো মনে হচ্ছে!'

শহীদের খেয়াল তখন অন্যত্র। নিহত লোকটার শার্টের পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা চিরকুট বের করে পড়ছে ও। পড়তে পড়তে ওর কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। মি. সিম্পসন লক্ষ্য করছেন সব।

'কি ব্যাপার, শহীদ?'

'শহীদ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল দরজার দিকে। মি. সিম্পসনের উদ্দেশ্যে বলে উঠল এগোতে এগোতে, 'তাড়াতাড়ি আসুন, মি. সিম্পসন! সর্বনাশ বোধহয় হয়েই গেছে!'

শহীদের কথা বুঝতে না পারলেও মি. সিম্পসন অনুমান করলেন কোথাও কোন বিপদের গন্ধ পেয়ে ব্যস্ত হয়েছে শহীদ। দ্রুত অনুসরণ করলেন তিনি শহীদকে।

বেলা হয়েছে ইতিমধ্যে। দশটা বেজে দশ। শহীদ মি. সিম্পসনের জীপের ড্রাইভিং সিটে চেপে বসল লাফ দিয়ে। মি. সিম্পসন বসলেন পাশে। জীপ ছেড়ে দিল শহীদ দ্রুতবেগে। মি. সিম্পসন জিজ্ঞেস করলেন এতক্ষণে, 'কি ব্যাপার, বল তো শহীদ?'

শহীদ পকেট থেকে ভাঁজ করা চিরকুটটা বের করে দিয়ে বলল, 'নিহত লোকটার পকেটে পাওয়া গেল এটা। লোকটা আমার কাছেই আসছিল। অদ্ভুত যোগাযোগ। পড়ে দেখুন।'

মি. সিম্পসন চিরকুটটা পড়তে শুরু করলেন—

'পরোপকারী মি. শহীদ খান,

আমাকে আপনার বোন হিসেবে জানবেন।

আমি বিপদগ্রস্তা। কতক্ষণ বেঁচে আছি, জানি না। বি/৪৪৫, নাখাল পাড়া, অভিনেত্রী সুরাইয়ার বাড়িতে বন্দিনী আমি। আমাকে বাঁচান। পুলিস নিয়ে আসবেন, যত তাড়াতাড়ি পারেন।

ইতি—

সাহায্য প্রত্যাশিনী,

মিস সুরাইয়া বেগম।'

চিঠিটা পড়ে হতবাক হয়ে শহীদের দিকে তাকালেন মি. সিম্পসন। শহীদ বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালাতে চালাতে বলে উঠল, 'মিস সুরাইয়া এখনও বেঁচে আছে বলে বিশ্বাস হয় না আমার। তবু দেখা যাক। রিভলভার, মি. সিম্পসন?'

'এনেছি। কিন্তু শহীদ, ব্যাপারটা তুমি কিছু আন্দাজ করতে পারছ কি?'

শহীদ বলল, 'আমার ধারণা, আজ থেকে খুন-জখম, আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ, রহস্য এবং সমস্যার জটিল এক আবর্তের সৃষ্টি হতে চলেছে, মি. সিম্পসন।'

বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলেছে জীপ। মুহূর্ত মাত্র দেরি হয়ে গেলে মিস সুরাইয়াকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া নাও যেতে পারে, বুঝতে পারছিলেন মি. সিম্পসন। তা সত্ত্বেও শহীদের গাড়ি চালানো দেখে শঙ্কিতবোধ করছিলেন তিনি। যে-কোন সামান্য একটু ভুলে মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যেতে পারে।

গন্তব্য এলাকায় এসে পড়েছে জীপ। চারদিক নিঝুম। জীপের যান্ত্রিক শব্দ ব্যতীত কোথাও আর কোন শব্দ নেই। এলাকাটা এমন নির্জন, লোক বসতি-হীন তা জানত না শহীদ। এদিকে ও কয়েক বছর হল আসেনি।

ঝরা-পাতা বিছিয়ে আছে রাস্তার উপর। সামনেই একটা মোড়। রাস্তায় কোন লোকজন দেখা যাচ্ছে না। এমন সময় একটা যান্ত্রিক শব্দ শোনা গেল! একটা গাড়ির শব্দ। শব্দটা ক্রমশ বাড়ছে। দ্রুত এগিয়ে আসছে শব্দটা। কিন্তু গাড়িটাকে দেখা যাচ্ছে না।

সাবধানে মোড় নিল শহীদ। মোড় নেবার সময় গাড়িটাকে দেখা গেল। বেপরোয়া বেগে একটা সিডান ছুটে আসছে সোজা।

'সাবধান, মি. সিম্পসন!'

শহীদের কথা শেষ হতেই পকেট থেকে রিভলভার বের করলেন মি. সিম্পসন। সিডানটা তখন মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। ছুটে আসছে তীব্র গতিতে। দু'জন লোক সামনের সিটে। একজনের গায়ে লাল শার্ট। পলকের মধ্যে চেহারাটা দেখা গেল। লাল শার্ট-পরা লোকটা ইংরেজ।

পঁচিশ গজ দূরত্বে আসতেই সিডানটা পাশের রাস্তা ছেড়ে মাঝ রাস্তায় চলে এল। সোজা যমের মত ছুটে আসছে জীপের দিকে। শহীদ ইতিমধ্যেই জীপের গতি তিরিশে নামিয়েছে। ধাক্কা লাগলে সর্বনাশ ঘটবে। সিডানের গতি অনেক বেশি।

কিন্তু ধাক্কা মারার জন্যে বদ্ধপরিকর সিডানটা। পলকের মধ্যে রিভলভারটা তুলে ফায়ার করলেন মি. সিম্পসন। একই সাথে দুটো রিভলভারের শব্দ শোনা গেল। সিডান থেকেও ফায়ার করা হয়েছে। শহীদ রং-সাইডে চলে এল পলকের মধ্যে।

মাঝ রাস্তা দিয়ে তীরবেগে চলে গেল সিডানটা। রিভলভারের শব্দ শোনা গেল। মি. সিম্পসন গুলি করার সুযোগ পাননি। সিডান থেকেই পরপর গুলি চালানো হয়েছে। গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল শহীদ। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল, মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে সবুজ রংয়ের সিডানটা। শহীদ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল, 'সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে বলেই মনে হচ্ছে মি. সিম্পসন। মিস সুরাইয়া সম্ভবত নিহত হয়েছে।

জীপের গতি কমিয়ে দিল শহীদ। সামনের রাস্তার দু'দিকে বেশ কয়েকটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বড় বড় আধুনিক ধাঁচের বাড়ি। ধীর গতিতে জীপ চালাতে চালাতে বাড়িগুলোর নেম-প্লেট পড়তে পড়তে এগোচ্ছে শহীদ। মি. সিম্পসন রাস্তার অপর দিকের বাড়িগুলোর নাম্বার এবং নেম-প্লেট পড়ছেন। ছাড়াছাড়াভাবে সবক'টি, অর্থাৎ গোটাদশেক বাড়ি ছাড়িয়ে এল জীপ। সামনে আবার রাস্তার দু'পাশে জংলী গাছ-পালার প্রাচীর দেখা যাচ্ছে। গতি বাড়াল শহীদ।

মিনিট দুয়েক এগিয়ে একটা প্রকাণ্ড মাঠ দেখতে পেল ওরা। মাঠের পর আবার জঙ্গল। দু'পাশে জঙ্গল রেখে আরও খানিকটা এগিয়ে থামাল শহীদ জীপ। লাফিয়ে নেমে পড়ল ও। মি. সিম্পসনও নামলেন তড়াক করে লাফ দিয়ে।

রাস্তা থেকে প্রায় একশো গজ দূরে তিনতলা একটা নতুন বাড়ি। ঝকঝক করছে বাড়িটার চেহারা। বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে তিনতলার দেয়ালের গায়ে 'সুরাইয়া ভিলা'।

বাইরে থেকে বাড়িটার চাকচিক্য দেখা যাচ্ছে খুবই। কিন্তু বাড়িটার কোথাও

কোন জন-মানবের সাড়া নেই। নিষ্প্রাণ, নির্জীব। কেমন যেন একটা ছমছমে পরিবেশ। কোথাও যেন কি একটা ঘটে গেছে। অস্বস্তিকর নীরবতা জমাট হয়ে আছে। প্রাণহীন শোক যেন ঘিরে রেখেছে প্রকাণ্ড বাড়িটাকে। গেটটা দেখা যাচ্ছে হাঁ করে খোলা। উপর তলার জানালাগুলো বন্ধ। অটুট নিস্তব্ধতা চারদিকে।

শহীদ থমকে দাঁড়িয়ে রইল গেটের কাছে মুহূর্তের জন্যে। তারপর গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল ও। বিরাট উঠান। উঠানের বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে নানারকম ফল গাছের বাগান। বাগানের মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে শহীদ দেখল, একদিকে বাগানের বেড়া ভাঙা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। বেড়াটা যেন সদ্য ভেঙেছে কেউ। মি. সিম্পসনও দাঁড়িয়ে পড়লেন শহীদের পাশে।

বাগানের ভিতরে নিবিষ্ট মনে কি যেন দেখছে শহীদ। বড় বড় কয়েকটা গোলাপ গাছের আড়ালে সবুজ রঙের কাপড় দেখা যাচ্ছে। ভাঙা বেড়া টপকে বাগানে ঢুকল শহীদ। গোলাপ গাছগুলোর অপর দিকে এসে ও দেখল, একজন লোক চিত হয়ে পড়ে আছে। বুকের কাছে সাদা হাফ-শার্ট লাল রক্তে একাকার হয়ে গেছে। মুখ হাঁ হয়ে আছে নিহত লোকটার। লোকটার পরনে সবুজ লুঙ্গি। পাশেই একটা রিভলভার।

শহীদের পিছনে মি. সিম্পসন এসে দাঁড়ালেন। শহীদ তখন লাশটা দেখা শেষ করে রুমালে পেঁচিয়ে পড়ে থাকা রিভলভারটা প্যান্টের পকেটে ভরছে। মি. সিম্পসন বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালে শহীদ পা বাড়িয়ে বলে উঠল, 'লোকটা সম্ভবত এ বাড়ির চাকর-বাকর ছিল।'

বাগান থেকে বেরিয়ে বারান্দার দিকে এগোল ওরা। বারান্দা ধরে এগোতে এগোতে সিঁড়ির নিচে আর একবার থামতে হল ওদেরকে। শক্ত হয়ে উঠল সিম্পসনের দু'দিকের চোয়াল। এতটা যেন তিনি আশঙ্কা করেননি।

সিঁড়ির ঠিক নিচেই আর একটা মৃতদেহ। বুকে গুলি মেরে হত্যা করা হয়েছে একেও। বেশি বয়স নয়, কিশোরই বলা চলে। সিমেন্ট করা বারান্দায় জমে গেছে রক্তের ধারা।

লাশটা দেখল ওরা মিনিট দু'য়েক ধরে। সিঁড়ির আরও সামনে একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। সেই দরজার দিকে পা বাড়াল শহীদ। খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই শিউরে উঠে কয়েক পা পিছিয়ে এল ও। বীভৎস, কুৎসিত, নিষ্ঠুর এক দৃশ্য! শহীদের পাশ থেকে উঁকি মারলেন মি. সিম্পসন। পিছিয়ে এসে মুখ বাঁকালেন তিনি। শহীদের উদ্দেশ্যে কি যেন বলতে চাইলেন। কিন্তু শহীদ ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে পা বাড়িয়ে দিয়েছে খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতরে।

ঘরটা ভাঁড়ার ঘর। চাল-ডালের বস্তা, রান্নাঘরের যাবতীয় জিনিস সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়েছে। মেঝে খুব সামান্যই অবশিষ্ট আছে ঘরটার। সেই সামান্য

মেঝের উপরই আটাশ-উনত্রিশ বৎসর বয়স্ক এক যুবতী চিত হয়ে পড়ে আছে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থা যুবতীর। শরীরের বিভিন্ন স্থানে কামড়ের, আঁচড়ের ক্ষতচিহ্ন। রক্তের দাগ সর্বত্র। যুবতীর বুকের দু'দিকে দুটো ছিদ্র। ওই দুটো ছিদ্র দিয়েই বুলেট হয়ত যুবতীর প্রাণ-বায়ু বের হবার পথ করে দিয়েছে। তার আগে বর্বরের নির্যাতন করা হয়েছে, পরিষ্কার বোঝা যায়। বুলেট-বেঁধা ছিদ্র দেখে শহীদ শুধু বলে উঠল, 'একই রিভলভার দিয়ে গুলি করা হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। এবং পাকা হাতের কাজ।'

যুবতীর লাশের পাশেই শাড়ি-ব্লাউজ পড়ে রয়েছে। শহীদ আবার বলে উঠল, 'এ বাড়ির চাকরানী সম্ভবত।'

মি. সিম্পসন অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন শহীদ থামতেই, 'একি ভয়ঙ্কর কাণ্ড, শহীদ!'

শহীদ কোন কথা না বলে ঘর ছেড়ে বের হয়ে বারান্দায় এল। সিঁড়ির কাছে এসে কিশোর চাকরটার লাশ টপকে দোতলায় উঠতে শুরু করল ও। মি. সিম্পসন শহীদের পিছন পিছন উঠে এলেন। এই শীতের সকালেও তাঁর কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। থমথম করছে মুখের চেহারা।

দোতলার সব ক'টা ঘর দেখল শহীদ। কোন জনমানবের চিহ্ন নেই। সে রকম কিছু আশাও করেনি ও। দোতলা থেকে তিন তলায় উঠল শহীদ। দোতলার সব ক'টা ঘর খালি। এমনকি, আসবাব-পত্রাদিও নেই। শূন্য ঘর পড়ে আছে শুধু। তিনতলায় উঠে পরপর আরও দুটো ঘর সম্পূর্ণ শূন্য দেখল ওরা। তৃতীয় ঘরটার ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে পা রাখতেই চমকে উঠল শহীদ।

বিরাট বড় ঘর। কিন্তু ছোট্ট একটা চৌকি দেখা যাচ্ছে ভিতরে, খাট নয়। বিসদৃশ ঠেকল শহীদের চোখে ব্যাপারটা। তাছাড়া ঘরের ভিতরে একটা আলমারি, দুটো হাতলবিহীন সাধারণ চেয়ার ছাড়া আর কিছু না থাকাটাও চোখে পড়বার মত।

চৌকির উপর উপুর হয়ে পড়ে আছে এক যুবতী। যুবতীর পরনে সালোয়ার-কামিজ ছিল, বোঝা যায়। সেগুলো বর্বর খুনেরা নির্যাতন চালাবার জন্য খুলে ফেলেছিল। নিঃসাড় শরীরের উপর সেগুলো বিছিয়ে দেয়া রয়েছে। মুখটা বালিশের উপর থেকে পড়ে গেছে চাদরের উপর। যুবতীর ফর্সা ধবধবে গায়ের রঙ এবং দেহ সৌষ্ঠব দেখে অপূর্ব সুন্দরী বলে মনে না হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু তা হলেও, মুখটা যুবতীর দেখতে কেমন ছিল তা বোঝার কোন উপায়ই নেই। সারামুখ ক্ষত-বিক্ষত। ফলে চেনা যাচ্ছে না যুবতীকে।

যুবতীর ক্ষত-বিক্ষত মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে কি একটা গভীর চিন্তায় যেন ডুবে গেছে শহীদ। মি. সিম্পসন বিচলিত কণ্ঠে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'কেন এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড! কার বা কাদের কী লাভ এতে!'

শহীদ ওর চিন্তার রাজ্য থেকে ফিরে এল। মি. সিম্পসনের উদ্দেশ্যে বলল, 'আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি, মি. সিম্পসন। বাড়িতে মিস সুরাইয়ার কাপড়-চোপড় বলতে কিছুই নেই। এর মানে কি বুঝতে পারছেন?'

একটু থেমে শহীদ আবার বলে উঠল, 'এর মানে, মিস সুরাইয়া বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্যে সব আসবাব-পত্র এবং কাপড়-চোপড় সরিয়ে নিয়েছিল কোথাও। তা যদি না হয়, তাহলে খুনীদলই সব জিনিস-পত্র সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কারণটা কি? খুনীরা নিশ্চয়ই আসবাব-পত্র বা কাপড়-চোপড় চুরি করতে আসেনি। চুরি করার জন্যে চারজন মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়াটা অসম্ভব।'

'তাহলে?'

'একটা ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, চারজনকেই হত্যা করা হয়েছে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে। মিস সুরাইয়ার সারা মুখে ধারাল অস্ত্রের দাগ, যার ফলে চেনবার উপায় নেই মুখটা কার, এ-ও গভীর একটা চাল।

মি. সিম্পসন ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারলেন না শহীদের কথাগুলো। শহীদ আবার বলে উঠল, 'আপনার কাজ শুরু করে দিন, মি. সিম্পসন। আমাদের অনেক ছুটোছুটি করতে হবে সারাটা দিন।'

মি. সিম্পসন দ্রুত ঘর ছেড়ে বের হয়ে যেতে যেতে বললেন, 'অনেক নিষ্ঠুরতা দেখেছি সারাজীবনে, কিন্তু···! শয়তানগুলোকে এমন কল্পনাতীত শিক্ষা দেব যে!'

মৃতা মিস সুরাইয়ার হাত পা, পিঠ, গলা, ঘাড় ইত্যাদি মনোযোগ দিয়ে দেখল শহীদ। লাশটার কাছ থেকে সরে এসে ঘরের চারদিকে তাকাল সে। একটা আলমারি ছাড়া দেখার মত কিছুই নেই। আলমারিটা খুলল শহীদ। পুরানো খবরের কাগজ পেল ও একটা। 'দৈনিক বাংলা'। দৈনিকটা খুলে ধরতেই একটা অদ্ভুত বিজ্ঞাপনের উপর দৃষ্টি পড়ল শহীদের। নিম্নে দেওয়া হল হুবহু বিজ্ঞাপনটাঃ

হুগলী জেলার ললনাগণের উদ্দেশে বিশেষ ঘোষণাঃ

> পশ্চিম-বঙ্গের হুগলী জেলার মিসেস মনোয়ারা বেগমের অভিলাশ অনুযায়ী ঢাকায় একটি নারী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গরীব, ধনী, বিবাহিতা, অবিবাহিতা সকল যুবতী এই সংস্থার সদস্য হইতে পারিবেন। গরীবদের জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে নিরক্ষরাকে অক্ষরজ্ঞান দান করা এই সংস্থার প্রধান কর্মসূচী।
>
> শর্ত সাপেক্ষে এই সংস্থার সদস্য হওয়া যাইবে। প্রথম শর্ত, মা-বাবা হারা অথবা মা-বাবার সন্নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছেন এমন যুবতী হইতে হইবে। দ্বিতীয় শর্ত, হুগলী জেলায় যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কেবল তাঁহারাই যোগ্য বিবেচিত হইবেন। অবশ্য মৌখিক

বক্তব্যই যথেষ্ট, প্রমাণ দাখিল করার প্রয়োজন নাই। সত্বর যোগাযোগ করুন।

এল. ১০১/১০, নয়া পল্টন, ঢাকা।

বিজ্ঞাপনটা পড়ার পর শহীদের মনে পড়ে গেল, সোলায়মান চৌধুরীর বাড়ি হুগলী জেলাতেই ছিল। দৈনিকটা ছ'মাসের পুরানো। সাথে সাথেই ওর মনে প্রশ্ন জাগল একটা। এই বিজ্ঞাপনটা মিস সুরাইয়া বেগম যত্ন করে আলমারিতে রেখে দিয়েছিল কেন? সে সোলায়মান চৌধুরীর মেয়ে, না এরফান মল্লিকের? সোলায়মান চৌধুরীর মেয়ে হলে এরফান মল্লিক একে হত্যা করতে সাহস পাবে বলে মনে হয় না। সোলায়মান চৌধুরী অবশ্য এরফান মল্লিকের মেয়েকে হত্যা করতে পারেন প্রতিশোধ নিতে, সেটাই সম্ভব। কিন্তু এরফান মল্লিকের মেয়ে যদি অভিনেত্রী মিস সুরাইয়াই হয়, তাহলে এরফান মল্লিক কোথায়?

দৈনিক কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল শহীদ। আলমারির ভিতরে আজে-বাজে কাগজপত্র পাওয়া গেল বহু। নিচের একটা তাকে ইলেকট্রিক বিল, ক্যাশ-মেমো, বাড়ি ভাড়ার রসিদ, ব্যাঙ্কের রিমাইণ্ডার, ওষুধের খালি বাক্স, হরলিক্সের টিন ইত্যাদি হাজার-রকম জিনিস গাদা করে রাখা। দরকারী কিছু পাবে বলে আশা করেনি শহীদ। কিন্তু তবু জঞ্জালগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল ও। দেখতে দেখতে পেয়ে গেল একটা ডায়েরী। ডায়েরীর উপরের ধুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করল ও। তারপর একটা একটা করে উল্টাতে লাগল পাতা। 'মিস সুরাইয়া বেগম।' ইংরেজিতে লেখা নাম ঠিকানা।

পরপর কয়েকটা পাতা উল্টাল শহীদ। একটা পাতায় লেখা লম্বা তিনটে লাইন। শহীদ চোখ বুলিয়ে দেখল— 'আজ মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে আমার, কেন জানি না। বাবার কথা, মায়ের কথা বারবার স্মরণ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু কিছুই মনে করতে পারছি না আমি। মাঝে মাঝে এমন নিঃসঙ্গ মনে হয়, এমন দুর্ভাগিনী মনে হয় যে...।'

লেখা শেষ না করেই ডায়েরীর পাতাটায় দাঁড়ি টেনে দিয়েছে। কিন্তু শহীদ এমন কিছু দেখেছে লেখাগুলোর দিকে চেয়ে থেকে, যার ফলে অবিশ্বাসে চোখ জোড়া তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে ওর। নিবিষ্ট মনে লেখাগুলো দেখল ও। সুন্দর, ঝরঝরে হাতের লেখা। কিন্তু এই হাতের লেখা যদি মিস সুরাইয়া বেগমের হয় তাহলে শহীদের বুকপকেটে যে চিঠিটা রয়েছে সেটা কার? দুটো হাতের লেখা এক বলে তো মনে হয় না!

পকেট থেকে চিঠিটা বের করে মেলে ধরল শহীদ। বিস্ময়ে চঞ্চল হয়ে উঠল ও। চিরকুটটা শহীদ পেয়েছিল রাস্তায় আহত লোকটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর। লোকটা মারা যাবার পর তার পকেট থেকে চিরকুটটা উদ্ধার করে শহীদ।

চিরকুটের নিচে নাম লেখা ছিল 'মিস সুরাইয়া বেগম'। কিন্তু ডায়েরীর মিস সুরাইয়া বেগমের হাতের লেখার সাথে তো চিরকুটের লেখিকা মিস সুরাইয়া বেগমের হাতের লেখা মিলছে না! একি রহস্য!

পরপর কয়েকটা পাতায় আর কিছু লেখা নেই। পঞ্চম পাতায় লেখা—'রহমান যদি আমার জীবনে দেখা না দিত তাহলে কি যে ছিল আমার কপালে তা ভাবতেও ভয় পাই আমি। রহমান আমার জীবন, আমার সহায়, আমার একমাত্র সম্বল, একমাত্র আপনার জন। রহমান ছাড়া আমার জীবনের অস্তিত্ব নেই। আমার জীবনধারণ থেকে শুরু করে সব খ্যাতি, প্রতিপত্তি একমাত্র রহমানের শুভ ইচ্ছার পরিণতি। আমার জীবন দিয়েও ওর ঋণ শোধ করতে পারব না!'

শহীদ দেখল, এরপর তিনমাস কিছুই লেখেনি মিস সুরাইয়া বেগম ডায়েরীর পাতায়। পাতার পর পাতা উল্টে শহীদ একটা লেখা-পাতা দেখল। লেখাটা পড়ে চমকে উঠল শহীদ। মিস সুরাইয়া বেগম লিখেছে—'অদ্ভুত একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল গতকাল "দৈনিক বাংলায়"। কেমন যেন মনটা আনমনা হয়ে গিয়েছিল আমার। মিশনারীদের কাছে শুনেছিলাম, আমার জন্মভূমি ছিল হুগলী জেলা। বিজ্ঞাপনটা হুগলী জেলার যুবতীদেরকে নিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান গঠন করার ব্যাপারে। এমন ধারা বিজ্ঞাপন আমি কখনও দেখিনি। বিজ্ঞাপনটা দেখে কেমন যেন ঔৎসুক্য জেগেছিল আমার মনে। কেন যেন মনে হচ্ছিল, ঠিকানা অনুযায়ী ওই প্রতিষ্ঠানে গেলে আমি আমার জন্ম পরিচয় জানতে পারব। তাই গিয়েছিলাম আজ, কিন্তু আমি ঘুণাক্ষরেও জানিনি যে, বিজ্ঞাপনটা সুকৌশলে ছাপা হয়েছিল আমার জন্যেই। বিজ্ঞাপনটার জন্যে দায়ী আমার বাবা। আমার বাবা আমাকে খুঁজে পাবার জন্যেই বিজ্ঞাপনটা কাগজে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাবার সাথে কথা বলার পর থেকে কেমন যেন গা ছমছম করছে আমার। অনেক অনেক প্রশ্ন করার পর তিনি নিজের পরিচয় দিলেন আমাকে। বললেন, আমি তাঁর মেয়ে। এরকম অদ্ভুত বিজ্ঞাপন কেন দিয়েছিলেন, একথা জিজ্ঞেস করাতে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখলাম বাবাকে। আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "সব প্রশ্নের উত্তর দেব সময়মত। সময় যতদিন না হচ্ছে ততদিন তুমি আমার নাম জানতে পারবে না। আমি তোমার বাবা, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি কোথায় ছিলাম এতদিন, তুমি কেন মিশনারীদের হাতে গিয়ে পড়েছিলে, তোমার দুর্দশার জন্যে কে দায়ী—এসব প্রশ্নের উত্তর আজ তোমাকে দিতে পারব না। তবে সব প্রশ্নেরই উত্তর তোমাকে আমি দেব। সময় আসুক। যতদিন না সময় আসছে ততদিন তুমি যেমন আছ তেমনি থাক। মাঝে মাঝে তোমার সাথে দেখা করতে যাব আমি, যেমন চিত্র-প্রযোজকরা তোমার সাথে ব্যবসা উপলক্ষ্যে দেখা করতে যায়। তুমি কিন্তু ভুলেও আমার বাড়িতে এস না। আমাকে তুমি ভুল বুঝ না, সুরাইয়া। আমি তোমার বাবা। আমি জানি, কিসে তোমার ভাল, কিসে তোমার মন্দ। তোমার বাবার সাক্ষাৎ তুমি পেয়েছ, একথা

ভুলেও কারও কাছে প্রকাশ কোরো না। মনে রেখ, তাতে আমার সর্বনাশই করবে তুমি। আমার একটা ছদ্মবেশী নাম আছে, সেটাও তুমি কখনও কারও কাছে প্রকাশ কোরো না।" বাবার কথা শুনে কেমন যেন ভয় লাগছে আমার। কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না আমি। উনি যে আমার বাবা, তাতে কোনই সন্দেহ নেই আমার। কিন্তু...।'

কয়েকটা পাতা ভরে লেখা হয়েছে। সবটুকু পড়ল শহীদ। পরিষ্কার হয়ে গেল কতকগুলো ব্যাপার। ডায়েরীর লেখিকা মিস সুরাইয়া বেগম হুগলী জেলার জমিদার সোলায়মান চৌধুরীরই কন্যা। আর, সোলায়মান চৌধুরী ঢাকায় জনৈক চিত্র-প্রযোজকের ছদ্মবেশে বসবাস করছেন।

গভীর চিন্তা আচ্ছন্ন করল শহীদকে। একটু পরেই ঘরে ঢুকলেন মি. সিম্পসন। শহীদকে চিন্তিত দেখে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'কিছু পেলে, শহীদ?'

শহীদ বলল, 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে যাকে খোঁজা হচ্ছে সেই সোলায়মান চৌধুরীরই মেয়ে অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া বেগম, মি. সিম্পসন।'

'তাই নাকি! কিভাবে জানলে বল তো?'

শহীদ বলল, 'অভিনেত্রী মিস সুরাইয়ার একটা ডায়েরী পাওয়া গেছে। খুব বেশি উপকৃত হওয়া যাবে না। তবে সোলায়মান চৌধুরী ঢাকাতেই আছেন, সম্ভবত চিত্র-প্রযোজকের ছদ্মবেশে। এর বেশি কিছু আর জানা যাচ্ছে না। কিন্তু অদ্ভুত একটা রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে, মি. সিম্পসন। যে মিস সুরাইয়া বেগমের চিরকুট পেয়ে আমরা ছুটে এসেছি সে অভিনেত্রী মিস সুরাইয়া বেগম নয়। একই নামে দুই যুবতী। অভিনেত্রী সুরাইয়ার ডায়েরীর হাতের লেখার সাথে চিরকুটের লেখিকা সুরাইয়ার হাতের লেখার কোন মিল নেই। দুটো হাতের লেখা দু'জনার।

হতবাক মি. সিম্পসনের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাল শহীদ চৌকির উপরকার অর্ধ-নগ্ন লাশটার দিকে। বলল, 'লাশটা যে কার, বোঝা মুশকিল। ইচ্ছাকৃতভাবেই যুবতীর মুখ ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই যুবতী কে তাহলে?'

মি. সিম্পসনকে বিস্মিত দেখাচ্ছে। তিনি বললেন, 'দু'নম্বর সুরাইয়া তাহলে কি নায়েব এরফান মল্লিকের মেয়ে?'

'ওই রকম সন্দেহ আমার হচ্ছে, মি. সিম্পসন। মোট কথা, সোলায়মান চৌধুরী এই হত্যাযজ্ঞের রহস্যে নিঃসন্দেহে জড়িত। সোলায়মান চৌধুরীকে খুঁজে বের করাই এখন আমাদের প্রথম কাজ। আমাদের আশপাশেই আছেন তিনি কিন্তু ছদ্মবেশে আছেন। প্লাস্টিক সার্জারী করে চেহারা পাল্টে ফেলেছেন, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই কোন। সুতরাং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে যে ফটো আমরা পেয়েছি তার সাথে এখন আর কোন মিল নেই সোলায়মান চৌধুরীর। নাম বদলেছেন তিনি নিশ্চয়। তাছাড়া, ভীষণ চতুরতার সাথে প্রতিশোধ গ্রহণ করার প্ল্যানও আছে তাঁর।

মি. সিম্পসন বললেন, 'মর্গের গাড়ি, ফটোগ্রাফার, পুলিস, ওরা সবাই এসে গেছে।'

শহীদ বলল, 'চলুন, এবার যাওয়া যাক। প্রথমে আমরা যাব চিত্র-প্রযোজক ওসমান গনি সাহেবের বাড়িতে।'

মি. সিম্পসন জিজ্ঞেস করলেন, 'ওসমান গনি! এই ভদ্রলোক না বেশ কিছুদিন আগে কামালকে নিযুক্ত করেছিলেন এরফান মল্লিককে খুঁজে বের করে দেবার জন্যে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু গত দু'মাস আগে হঠাৎ ভদ্রলোক এবং ভদ্রলোকের বন্ধু মি. সারওয়ারের আগ্রহ দূর হয়ে যায়। ব্যাপারটা দারুণ অস্বাভাবিক।'

মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'শহীদ, তুমি ছাড়া আমার পক্ষে একা এই জটিল কেসের সমাধান করা সম্ভব নয়। তুমি ভার নাও এই কেসের।'

শহীদ বলল, 'আপনি আমাকে না বললেও এই কেস নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হবে, মি. সিম্পসন। ধন্যবাদ।'

ভলিউম-৮

কুয়াশা

২২ ২৩ ২৪

কাজী আনোয়ার হোসেন

কুয়াশা, শহীদ ও কামাল।
দেশে-বিদেশে অন্যায় অবিচারকে দমন করে
সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করাই এদের জীবনের ব্রত।
এদের সঙ্গে পাঠকও অজানার পথে
দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারবেন,
উপভোগ করতে পারবেন
রহস্য, রোমাঞ্চ ও বিপদের স্বাদ।
শুধু ছোটরাই নয়, ছোট-বড় সবাই এ বই পড়ে
প্রচুর আনন্দ লাভ করবেন।
আজই সংগ্রহ করুন।

সেবা প্রকাশনী
সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০